ক্রৌঞ্চ-নিষাদ

অজিত দাশ

পরিবেশক :
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

crouncha-nishad
a novel by ajit das

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী প্রকাশনী
পি ৪৬, রায়পুর
কলিকাতা-৩২

প্রচ্ছদপট :
ও. সি. গাঙ্গুলী

মুদ্রক :
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬৷১ কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : প্রেস এণ্ড প্রিণ্টার্স
৫০, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ব্লক : পাইওনিয়ার ষ্টিরিও টাইপ কোঃ
কলিকাতা-১৩

বন্ধনী : সিটি বুক বাইণ্ডিং
৯৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সুধীর চক্রবর্তী

স্নেহভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

সামুদ্রিক (কাব্য)

ভাগফল (উপন্যাস)

বিন্দু-বিস্তার ,, (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশকের নিবেদন

কিছুকাল থেকে বাংলা কথা সাহিত্য সম্পর্কে মনে মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। তাব অনেক কিছুই অতৃপ্তিজনিত। বার বার মনে হচ্ছিল, এ দশকের এই যে সাহিত্য প্রবাহ তা যেন নিরবচ্ছিন্ন নয়। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যেন একটা আবর্ত, যা প্রগতির পরিচায়ক নয়। আনন্দ হয়তো জোগায় কিন্তু যেন সাড়া জাগায় না। এখানে প্রায় নেই আজকের জন-জীবনের যে সমস্যা তার প্রতি বলিষ্ঠ নির্ভীক ইঙ্গিত। অথচ এই বাংলা দেশের বুকের ওপর দিয়েই বয়ে গেল দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশ ভাগের রক্তস্রোত। এবং তারই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সমস্যাজর্জর হয়ে উঠেছে বাংলার জন-জীবন। এই দুর্দিনে জাতীয় সাহিত্যের কাছ থেকেই আমরা প্রত্যাশা করি সবচেয়ে বেশি। কারণ সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। সাহিত্য সমাজ-জীবনের কাণ্ডারী।

আমাদের এই এমনতর চিন্তা ভাবনার দিনে হাতে এসে পড়ল এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। পড়লাম। আর আমাদের এই মানসিকতা দিয়ে অনুভব করলাম, এ গ্রন্থের প্রচার একান্তভাবে প্রয়োজন। তাই যেন আপনা হতেই আমাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ল। দ্বিভাগোত্তর বাংলায় কি আমাদের গতি এবং প্রগতি তারই ছবি ফুটে উঠেছে এ কাহিনীতে। জানি না আমাদের এ অনুভূতি আধুনিকতম মূল্যায়নে কোন স্থান পাবে কি না। যাঁদের উদ্দেশে এর প্রকাশ তাঁরা যদি স্নেহ দাক্ষিণ্যে গ্রহণ করেন তবে জানব আমাদের এ প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়নি।

আমাদের এই প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণের পশ্চাতে যাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অকৃপণ সাহায্য কাজ করেছে, তাঁদের ভিতর প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রদ্ধেয়, ও সি. গাঙ্গুলী। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা ব্যতীত এ গ্রন্থের অলঙ্করণ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও ডি. সি. বোস এণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীদীনেশ চন্দ্র বসু প্রত্যক্ষভাবে নানা বিষয়ে সাহায্য এবং পরামর্শ দান করে আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছেন। তাঁদের এই সহৃদয় সাহায্য না পেলে আমাদের এই কাজে অনেক সময়েই ব্যাঘাত ঘটতে পারতো।

এ ছাড়া শ্রীসুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত ও শ্রীরথীন মিত্রের সাহচর্য ও সম্প্রীতির কথা স্বতঃই মনে পড়ছে বারবার। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে আর একজনের নামোল্লেখ না করে পারা যায় না। তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীপরিমল রায়, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ফিনিক্স এডভার্টাইজিং প্রাঃ লিঃ। তিনিই এ প্রকাশনীর পারোক্ষ প্রেরণা। তাঁর সংস্পর্শে না এলে হয়তো আমাদের এ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ কোনদিনই সম্ভব হোত না। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার এ গ্রন্থের পরিবেশন ভার গ্রহণ করে আমাদের প্রকাশনীর কতদূর সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ এখানে বাহুল্য মাত্র।

আমাদের বক্তব্য সমাপ্তির পূর্ব্বে আর একটি ক্ষুদ্র নিবেদন হচ্ছে যে, মুদ্রণ কর্ম দ্রুত চালাবার ফলে এবং সেই মত আমরা উপযুক্ত তৎপরতার সঙ্গে যথাযোগ্য সময় দিতে না পারায় কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটে গেছে। সেজন্য আমরা লজ্জিত। পাঠকবর্গের কাছে সহৃদয়তা প্রত্যাশী।

প্রকাশক

লেখকের বক্তব্য

'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ' উপন্যাস। উপন্যাস যে অর্থে সত্য একাহিনীও সেই অর্থে সত্য। একে আদালতের নথি মনে করলে এর প্রতি অবিচার করা হবে।

এই প্রসঙ্গে আমার বিনীত বক্তব্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠিকে বিদ্বেষবশতঃ কটাক্ষ করা বা অসম্মান করা কোন সাহিত্য স্রষ্টার উদ্দেশ্য নয়। এ কাহিনী রচনায় সেই বিশ্বাসকে-ই মান্য করা হয়েছে। তবু যদি কেউ এ কাহিনীর কোন চরিত্রের ভিতর নিজের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করেন, তাহলে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত কখন আপন বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন এবং আপন ক্ষমতাবলেই দেশ কাল সমাজের কোলে বিশেষ আশ্রয় অর্জন করেছেন। সাহিত্য চিরকাল দেশ কাল সমাজ ও ব্যক্তিত্ব নির্ভর।

কাহিনীর পটভূমি সমগ্র পশ্চিম বঙ্গই। তবু যেহেতু বিভক্ত বাংলায় সীমান্ত জেলা নদিয়া বহু সমস্যা জর্জরিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং আমার জন্মসূত্রে এর সঙ্গে আমি নিবিড় পরিচয়ে আবদ্ধ, তাই এ জেলাকে পটভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

খৃষ্টীয় সমাজ সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করে আমাকে কাহিনী রচনায় সাহায্য করেছেন স্নেহভাজন শ্রীসন্দীপ সরকার। তাঁকে এবং আরও যাঁরা নানাভাবে আমাকে কাহিনী রচনায় ও প্রকাশে সাহায্য করে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কাহিনীর রচনাকাল, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল।

২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর,
নদিয়া

ইতি—
অজিত দাশ

ইংরাজী উনিশ'শ পঞ্চাশ সাল।

ধুবুলিয়া থেকে একটি কনভয় বেরিয়ে এল। কনভয় কথাটি শুনলেই অবশ্য এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে একটি পরিচিত ছবি ভেসে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে ধুবুলিয়া থেকে গ্রাম উঠে গেল। গ্রামবাসীরা সরকারী নির্দেশে তাদের পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে গেল।

তারপর একদিন সেই পরিত্যক্ত গ্রাম ধুবুলিয়ায় উড়ে এল আমেরিকার জঙ্গী বিমান বহর। সেখানে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলল। সেনাবাহিনীর বিমান ওঠানামার কেন্দ্র হ'ল। আর সেই বিমান-বহর নিয়ে এল হাজার হাজার বিদেশী মানুষকে। আর তাদের জন্য এল নানা সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, বিচিত্র সব যানবাহন। দিন নেই, রাত নেই অবিরাম অবিশ্রাম তাদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। সারি সারি মোটরে, ট্রাকে, লরীতে, জীপে, দলবদ্ধভাবে তারা যাতায়াত করত। তারা তাকেই বলত কনভয়। কনভয় বলতে এ অঞ্চলবাসীর মনে এই দৃশ্যই জেগে ওঠে।

না। উনিশ'শ পঞ্চাশ সালে সে কনভয় আর নেই। কালের চাকা ঘুরে গেছে। ইতিহাসের মোড় ফিরেছে। আমেরিকার জঙ্গী-বাহিনী স্বদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তারপর একদিন ইংরেজও তার অধিকার

ত্যাগ করে ভাবতবর্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। আর তারই ফলস্বরূপ সেই শূন্য খাঁ খাঁ ধুবুলিয়ায় গড়ে উঠেছে আরেক শিবির। আরেকদল মানুষের শিবির। তারা বিদেশী নয়। আমাদেরই লোক। তবু তারা আশ্রয়চ্যুত, পলাতক, সর্বহারা। তারা সব খুইয়েছে, দেশের কোটি কোটি মানুষের মুক্তির, স্বস্তির, শান্তির বিনিময়ে। তাই ভারতবর্ষের নৈতিক দায়িত্ব এসে গেছে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার। তাই আশ্রয় প্রার্থী শিবিব গড়ে উঠেছে ধুবুলিয়ায়। তাই তাদের এখান থেকে সবিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন নগরে, গ্রামে।

ওরা পুনর্বাসন নিচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মাটিতে পূর্ব বাংলার মানুষেরা নতুন করে সংসার পাততে যাচ্ছে। তারা মোটর ট্রাক ভর্তি হয়ে চলেছে। সারি সারি ট্রাকে। সেও যেন কনভয়। নতুন যুগের আরেক কনভয়।

সেই কনভয়।

পঞ্চাশটি পরিবার তাদের র‍্যাশন আর খয়রাতি টাকা চুকিয়ে নিয়েছে। ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে মুক্তি পত্র নিয়ে নিয়েছে। তারপর তারা আটখানা ট্রাকে উঠে বসেছে। পুরুষ, নারী, শিশু, আর তাদের আসবাব, বিছানা, রান্নার কাঠখড়ি এবং তৈজসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সেই আটখানা মোটর ট্রাক। পরপর আটখানা ট্রাকের সারি। কনভয়।

সেই কনভয় অতঃপর পথে নেমে এল। পিচ মোড়া পথ। আমেরিকার সৈন্যদের প্রয়োজনেই তৈরী করা পথ। সেই পথ বেয়েই এ কনভয় ছুটে এল জলঙ্গী নদীর খেয়াঘাট অবধি। বোটে করে নদী পার হয়ে কৃষ্ণনগর শহরে প্রবেশ করল। তারপর ব্যস্ত নগরীকে সচকিত করে আবার ছুটে চলল শহরের বাইরে। পল্লীর অভিমুখে।

পল্লী। অর্থাৎ সবুজের সমারোহ। দিগন্তপ্রসারী ফসলের ক্ষেত। বাবলার বন। নিঃসঙ্গ খেজুরের উদ্ধত উন্নত শির হাওয়ায় দুলছে।

সে দৃশ্য দেখতে দেখতে ট্রাকের যাত্রীদের মনে পূর্ব-স্মৃতি জেগে উঠল। সেই ফেলে আসা গ্রাম, পূর্ব-বাংলার শ্যামল শোভা। নদীর কুলু-কুলু ধ্বনি। আপন ঘরবাড়ী, জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত পরিবেশ। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, কত জন্ম, কত মৃত্যু।

প্রথম ট্রাকের একজন যাত্রী গলাছেড়ে গান ধরে দিল,

বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা নগরে
চল যাই সখি, চল ধাই,
বঁধুয়ার রূপ না হেরি নয়নে
জীবন যৌবন রাখা দায়।
সখি, মরমে মরিয়া যাই॥

এ যে তাদের আনন্দের দিন। ওরা পুনর্বাসন নিতে চলেছে। আবার জমি পাবে, গৃহ পাবে, সংসার পাতবে। ওদের জন্যে, ওদের উত্তর পুরুষের জন্যে।

চওড়া পথ ছেড়ে, সরু পায় চলা পথ ধরল কনভয়। দুধারে কাঁটার বেড়াঘেরা আম কাঁঠালের বাগান। তারপরেই গ্রামের চিহ্ন। দূরে দূরে সব চালা ঘর।

প্রথম ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসেছিলেন পুনর্বাসন বিভাগের দুজন কর্মচারী। অফিসার। একজন প্রধান কলোনী অফিসার। অন্যজন তাঁর সহকারী।

প্রধান অফিসার বলে উঠলেন, ওই গ্রাম। বন্দীপুর। ওখানেই কলোনী হবে। উদ্বাস্তুরা উল্লাসে ধ্বনি দিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম। জয়হিন্দ।

সামনেই একটি বিল। সেতু দিয়ে তার দুপার সংযোজিত। সেটা পার হলেই ঘন সবুজ প্রান্তর। সমতল অঞ্চল।

প্রধান কলোনী অফিসার বললেন। এই মাঠে কলোনী হবে। এই বিলের ধারে ধারে। আরোহীরা এবার ধ্বনি দিল, বাস্তহারা—জিন্দাবাদ।

বন্দীপুর গ্রামের ভিতর প্রবেশের পর সে ধ্বনির আর বিরতি নেই।

সেই সঙ্গে কনভয়ের একটানা শব্দ শুনে, সারা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন ছুটতে আরম্ভ করল অনেকে। তাদের চোখেচোখে কৌতূহল আর কৌতুকের ছায়া।

খড়ের-চালের পাশ দিয়ে, বাঁশ ঝাড়ের কোল ঘেঁসে, জেলাবোর্ডের ইঁদারা পেরিয়ে জমিদার বাবুদের ঠাকুরবাড়ীর সামনে এসে কনভয় দাঁড়াল।

পূর্ব থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুর বাড়ীর উঠোনে একদল পুরুষ আর একদল নারী এই কনভয়েরই প্রতীক্ষায় ছিল। কনভয় পৌঁছতেই তারা জ'াকার দিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই হুলুধ্বনি করল মেয়েরা। খই ছিটিয়ে দিল।

মনোরম পরিবেশ। যে মানুষেরা আতঙ্কে, আত্মরক্ষার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছে, মানুষকে অবিশ্বাস করে পলাতক হয়েছে, তাদেরই সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আর একদল মানুষ। উদ্বাস্তুর দল ঠাকুর বাড়ীর উঠোনে নেমে এল ট্রাক থেকে। তাদের ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রধান কলোনী অফিসার ছোট একটি বক্তৃতা দিলেন। বললেন, এই হ'ল আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন-মরণের লীলাভূমি।

জমিদার বাবু। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও তিনি। তিনি অফিসারকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনারা এ অঞ্চলকে পবিত্র করে তুলুন আপনাদের ভালবাসায়।

সবাই শুনল। মুগ্ধ হয়ে। তখন মাথার ওপর দুপুরের চনচনে রোদ। মাটিতে ধুলো তেতে আগুন। পা রাখা দায় তার ওপর। তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। জমিদার বাবুর ভাষণ থামতেই উদ্বাস্তুরা ওদের একজনকে ঠেলে এগিয়ে দিল। তার গলায় তুলসী-কাঠের মালা। মাথায় লম্বা চুল। মুখে দাড়ি। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী। হাতে একতারা। তার নাম সাধুচরণ। পথে আসবার সময় ট্রাকের ওপর সে-ই গান ধরেছিল।

সে সকলের সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নাড়িয়ে ভাব-বিভোল

দৃষ্টিতে বললে, আমরা ও মাটিকে পবিত্তর করব কি করে ? আমরা সামান্য নর। মানুষ দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসে এ মাটির লোভে। এ মাটি মাথায় দিলে পুণ্য হয়। প্রেমের ঠাকুর ছিরি চৈতন্য জন্ম নিলেন এ মাটিতে। লীলা করলেন, হাসলেন, কাঁদলেন। এ মাটি এতো ধুলি নয়। ভক্তপদ রেণু।

জমজমাট আসর। মুগ্ধ সমাবেশ ঘন হয়ে উঠেছে ক্রমেই। এবার দুপুরের তপ্ত ধুলোর দিকে তাকিয়ে সবাই মিলে আবেগে বলে উঠল, প্রেমানন্দে একবার সব হরি হরি বল। বন্দীপুর গ্রামে এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

কলোনী হবে বিলের ধারে। সেখানেই এখন এই সব উদ্বাস্তুদের তাঁবুতে বাস করতে হবে। যতদিন না সরকারী ঋণ পেয়ে ঘর বাড়ী তুলতে পারে।

মোটর ট্রাকের কনভয়টি তাই জমিদার বাবুর ঠাকুর বাড়ী থেকে উদ্বাস্তুদের তুলে নিল আবার। বিলের ধারে ফাঁকা মাঠে ফিরে গেল।

সেখানে তারপর মালপত্র নামানর পালা। সেকাজ শেষ হ'ল বিকেলে। ট্রাকগুলো খালি হয়ে গেল। এবার শূন্য ট্রাকগুলো কৃষ্ণনগরে ফিরে যাবে। প্রধান কলোনী অফিসারও সেই সঙ্গে ফিরে যাবেন। তার পূর্বে তিনি জমিদারবাবুকে ডাকিয়ে জানালেন, তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে রামবাবু, আপনার এই কলোনীর চার্জে থাকবেন ইনি। সুকুমারবাবু। একেবারে ছেলে মানুষ। অনভিজ্ঞ। সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কাজেই আপনি একটু দেখবেন। যেন কোন অসুবিধা না হয়। আপনি আছেন বলেই আমাদের এতটা ভরসা।

* * *

কলোনী অফিসার কৃষ্ণনগর চলে গেলেন। রামবাবু সুকুমারকে ডেকে-এনে ঠাকুরবাড়ীতে তুললেন। নিরিবিলি নির্জন পরিবেশ। গ্রামের প্রান্তসীমা। উত্তরে উন্নতচূড়া মন্দির। সামনে ফুলবাগান। বাগানের পাশে একটি টিনের চালা। রামবাবু বললেন, এটা প্রকিওরমেণ্টের গুদাম। আমি এজেণ্ট কিনা।

উঠোনের দক্ষিণে রান্না-ঘর। পূর্বদিকে মন্দিরের পুরোহিতের বাসা। আর সামনের দুটো ঘরে এসে থাকেন প্রকিওরমেণ্টের লোকজন। রামবাবু বললেন, তার পরেরটা খালি। ওটাই আপনাকে দেব। আপাততঃ থাকুন। পরে একটা বাসা ঠিক করে দেব। স্থিতি হোক আগে। কথা শেষ করেই রামবাবু হাঁকলেন, ঠাকুর—

পুরোহিতের বাসা থেকে একটি ছেলে বার হয়ে এল, পনের ষোল বছর বয়স। রামবাবু বললেন, এই অফিসারবাবু এয়েছেন রিফিউজিদের নিয়ে। ভোগের ঘরে থাকবেন। ওঁর বিছানাটা নিয়ে আয়।

ওকি পুরোহিত? সুকুমার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

সুকুমার সসংকোচে বললে, থাক, থাক। বিছানা আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

তাতে কি? পুরোহিত এগিয়ে এসে বিছানাটা চেপে ধরল। রামবাবু হেসে বললেন, স্যার, আপনি একে ছেলেমানুষ, অফিসার হয়ে এসেছেন, সায়েবের পোষাক পরেনান, তার ওপর আবার এতো বিনয়। সাবধান স্যার! সাবধান! কথা শেষ করেই হেসে উঠলেন তিনি। ঠাকুর বিছানাটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।

সুকুমার ভোগের ঘরে গিয়ে উঠল। ছোট্টঘর। একখানা চৌকী পাতা। রামবাবু বললেন, অসুবিধা হবে হয়ত। শহরের মানুষ আপনি। বিজলী আলো নেই, চারদিকে জঙ্গল।

সুকুমার এবার সসংকোচে বললে, তাতে কি?

বাইরে উঠোনে নেমে এসে রামবাবু বললেন, আজ রাতে আর খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে হবেনা। আমার বাড়ীতেই ডাল ভাত দুটো যা হয় গ্রহণ করবেন স্যার।

এর কোন জবাব সুকুমার দিতে পারল না। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল খানিক রামবাবুর দিকে।

আচ্ছা, আপনি তাহলে এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসচি একটু পরে। একটা কাজ সেরে। রামবাবু চলে গেলেন।

সুকুমার একা। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঠাকুর বাড়ীর রূপ। অপরাহ্ণ বেলা। শান্ত পল্লীর কি নিবিড় নির্জনতা। শহর ছেড়ে এই ওর প্রথম গ্রামে আসা। ঠাকুর বাড়ীর উঠোন থেকে পথে নেমে এল। উত্তরদিকে এগিয়ে চলল। মন্দিরের নিচেই বিরাট খাদ। চলে গেছে গ্রামসীমার পাশ দিয়ে গড়খাইএর মত। বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয় নিশ্চয়ই। আগে বোধ হয় নদী কিংবা খাল ছিল। খাদের ওপারেই মাঠ। ধূ-ধূ প্রান্তর। দিনের আলো নিবে আসছে। পাখীরা ঘরে ফিরছে। বাবলার ছোট ঝোপে ঝোপে ওদের ক্লান্ত কাকলী বেজে উঠেছে। সুকুমার সে দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত এ ভালো লাগা। গ্রামে এসে তার যেন নবজন্ম হ'ল।

সুকুমার যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঠাকুর বাড়ির তখন আর এক রূপ। উঠোনের বেল গাছে পেট্রোমাক্স ঝুলছে। তার আলোর ছটায় দেখা যাচ্ছে কয়েক জন চেয়ার জুড়ে বসে আছেন। রামবাবুকে চিনতে পারল সুকুমার। চায়ের কাপে, সিগ্রেটের ধোঁয়ায় মশগুল আসর।

সুকুমার কাছে যেতেই রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আসুন স্যার। সবাই খুঁজে হয়রাণ। নোতুন লোক এসেই নিখোঁজ।

সকলে হেসে উঠল। সুকুমার লজ্জা পেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে এই প্রথম চাকরী। এই প্রথম সাবালক ভদ্রলোক হিসেবে অভিজ্ঞতা।

বসুন স্যার। বসুন। রামবাবু চেয়ার এগিয়ে দিলেন। সুকুমার গিয়ে বসতেই পরিচয়ের পালা আরম্ভ হ'ল। রামবাবুই আরম্ভ করলেন। এই যে, ইনিই সুকুমার বাবু। রিফিউজীদের এনেছেন। আর সুকুমার বাবু—এই যে বুড়ো দাদাকে দেখছেন, ইনি শ্রীরাধারমণ ঘোষ। প্রকিওরমেণ্টের এ্যাসেসর ইনস্পেক্টর। আর ইনি শ্রীতুলসী দত্ত। ইনিও ওই পদে। কথা শেষ করেই রামবাবু হাঁকলেন, অরুণ—চা—জলদি—নোতুন বাবুকে। পাঁপর ভাজা আনবি সঙ্গে।

একটু পরেই সামনের রান্নাঘর থেকে অরুণ ঘোষ চা আর পাঁপর ভাজা নিয়ে এল। সুকুমার সসংকোচে বললে, আবার পাঁপর ভাজা ?

খান স্যার। রামবাবু অনুরোধ করলেন, বিকেলে তো খুঁজেই পাওয়া গেলনা। জলখাবারও দেওয়া গেল না—খেয়ে নিন্ এখন।

চায়ে চুমুক দিয়ে তুলসী দত্ত বললেন, হ্যাঁ, বেঁচে গেছেন মশাই এখানে পোষ্টিং হওয়ায়।

সুকুমার বললে, হ্যাঁ, এই প্রথম চাকরী। আপনাদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাব।

দূর মশাই। তুলসী দত্ত হেসে উঠলেন। আপনি ছেলেমানুষ। বাঁশবনে ডোম কানা—রামবাবু থাকতে আমরা ?

পুলকিত রামবাবু বলে উঠলেন, কি যে বলেন। আমি আর কি ?

আপনিইতো সব। তুলসী দত্ত আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, আপনিইতো সব। নইলে কে এমন আশ্রয় দেবে ? কে এই ঝামেলা সহ্য করে মশাই ?

তা সত্যি। রাধারমণ ঘোষ জুড়ে দিলেন, যতরাজ্যের গিরি-গোবর্ধন মাথায় ধরে আছেন। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, থানা রিলিফ কমিটির বে-সরকারী সম্পাদক, জেলা বোর্ডের সদস্য, জজের জুরী, স্কুলবোর্ডের, সদস্য, ডাক্তারখানার সম্পাদক, আবার নিজের জমীতে উদ্বাস্তু এনে বসান। তাদের তদ্বির-তদারক করা। কে করে ? সবাই বিরোধিতা

করেছিল। আপত্তি তুলেছিল—বাঙাল ঢুকিয়ে কাজ নেই। গাঁয়ের বুকে আকাল ডেকে আনবে। কিন্তু শুধু, এই একজন শুধু।

সুকুমার অবাক হ'ল। এর আগে গ্রাম দেখেনি। গ্রামের এমন মানুষও দেখেনি। এঁরা শহরের অসংখ্য প্রলোভন আর শোষণের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচিয়ে রেখেছেন ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামকে।

রাধারমণ ঘোষের বক্তব্য তখন ফুরোয়নি। হয়তো আরও অনেক কিছু শুনতে পেতো সুকুমার। হ'ল না। রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সুকুমারকে বললেন, চলুন স্যার। বিকেলে খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েচে নিশ্চয়ই। সকাল সকাল খেয়ে নেবেন। আসুন।

রামবাবু সুকুমারকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। পুকুর পার দিয়ে আম বাগান আর বাঁশতলা পেরিয়ে, টর্চএর আলো ধরে ধরে। পুরণো জমিদার বাড়ী। রান্নাঘর, খাওয়ার দালান বেশ বড়োসড়ো। সামন্ত যুগের দিল দরিয়া মেজাজের মত। সেখানে একটা বিরাট আসনের ওপর সুকুমারকে বসতে হ'ল। রামবাবু হাঁকলেন, খুকু।

চুড়ির ঠুন্‌ঠুন আওয়াজ হ'ল ঘরের ভিতর। ঘরে সেকালের একটা বড় দেওয়ালগিরি জ্বলছে—যেন এই দিয়েই অতীতকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। সুকুমারের কেমন যেন লাগতে লাগল। যেন স্বপ্নভরা পরিবেশ। একটা মায়াবী রাত।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে খুকু বেরিয়ে এল। নিটোল তরুণী। সুকুমার একবার তাকিয়েই মাথা নিচু করল। ভাতের থালা নামিয়ে দিয়ে খুকু আবার ভিতরে চলে গেল।

রামবাবু বললেন, লজ্জা করবেন না। খিদে থাকলে আপনারই ক্ষতি হবে।

খুকু ঘর থেকে এসে সামনে দাঁড়াল এবার। রামবাবু বললেন, বুঝলি, ইনিই সুকুমার বাবু। কলোনী অফিসার। এই প্রথম চাকরী। কলেজ থেকে বেরিয়েই এই জীবনে প্রথম গ্রামে আসা।

রামবাবু হাসলেন। হাসির ঝোঁক থামলে বললেন, স্যার, এই আমার মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ। কলকাতায় থাকত আগে।

সুকুমার অমনি তাকাল খুকুর দিকে। খুকুও তাকিয়েছিল ওর দিকেই। লজ্জা পেল। সুকুমারও চোখ নামিয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। সুকুমার খাচ্ছিল। রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। আচ্ছা স্যার, আপনি খান। লজ্জা করবেন না যেন। খুকী দেখিস্। মন্দিরে সবাই বসে আছেন। আমি ওখানে গেলাম। অরুণকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে নিয়ে যাবে।

সুকুমার এরপর কিছু বলবার আগেই রামবাবু বেরিয়ে গেলেন।

দেওয়ালে পুরু চিমনী লাগান পুবনো দেওয়ালগিরি। ঘরে সুকুমার আর খুকু। কোথাও অন্য কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। শান্ত নির্জন পল্লী। অভাবনীয় পরিবেশ।

সুকুমার কলেজে অনেক মেয়ে দেখেছে। কিন্তু এমন পরিবেশের অভিজ্ঞতা তার নেই। তবু শেষ পর্যন্ত তাকেই প্রথম জড়তা কাটাতে হ'ল। মাথা নীচু করে খাচ্ছিল। চোখ তুলে দেখল, দরজার চৌকাঠ ধরে খুকু দাঁড়িয়ে আছে। আপনি ম্যাট্রিক পাশ করেছেন? সুকুমার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। কথার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে গেল খুকু।

সুকুমার আবার প্রশ্ন করল, কলকাতা থেকে পাশ করেছেন?

হ্যাঁ। এবার খুকু অনেকটা সহজ হবার চেষ্টা করল।

সুকুমার আলাপ জমাতে চেষ্টা করল এবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে নিল, খুকু হচ্ছে ডাকনাম। পোশাকী নাম রাইধনী। বিশ্রী। এর প্রথম বা শেষ কোন অংশই ডাকবার মত নয়। পুরনো। তারচেয়ে খুকু নামই ভাল। সুকুমার মনে মনে বিচার করছিল। খুকু বললে, ভাত দেব দুটো?

না।

তবু পাতে ভাত ঢেলে দিল। বললে, খেয়ে নিন্।

সুকুমার হাসল। আবার কথাবার্তা চালাতে আরম্ভ করল। এ খানে লাইব্রেরী আছে? বইটই পড়তে পাওয়া যাবেতো?

ছাই যাবে।

কেন?

লাইব্রেরী কোথায়?

তাহলেতো মুস্কিল। আমার সময় কাটবে কি করে?

খুকু হাসল। হাতের চুড়িগুলো ঠুন ঠুন করল কবার। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। অরুণ ঘোষ আসতেই সুকুমার উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে তার পিছন পিছন মন্দিরের উঠোনে চলে গেল।

সুকুমার চলে গেল। খুকু রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল। দুপুরবেলা যখন উদ্বাস্তুদের মোটরট্রাকগুলো মন্দিরের সামনে এসেছিল, উদ্বাস্তুরা মন্দিরের উঠোনে নেমে ছিল, তখন খুকু বেলতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল এই ভদ্রলোককে। সকলের মধ্যে এই একজনই ছিল নজরে-পড়বার মত। বেশ ভাল লেগেছিল। ভাল লাগার গুণেই ভালবাসা আসে। আশ্চর্য, সন্ধ্যাবেলা তিনিই এলেন এখানে? এ গ্রামে এসে তার হাতেই প্রথম অন্ন গ্রহণ করলেন? কি ছেলেমানুষ অফিসার। এঁর আগে এমন কেউ আসেননি। তাঁরা সবাই বয়স্ক। বুড়োহাবড়া।

সুকুমার চলে যেতেই খুকু তার শোবার ঘরে গেল। তার নিজস্ব কয়েকটি আলমারি আছে। বই-ভর্তি। কলকাতা থেকে এখানে এসে আনিয়েছে। এখানে মন টিকতো না, মিশবার লোক পেত না,—তাই প্রথম প্রথম এই সব বই আনিয়েছিল। এখন থাকতে থাকতে সে মন ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন কারো সঙ্গে না মিশে, কোন বই না পড়েই কাটিয়ে দিতে পারে সে দিনের পর দিন। কাজেই নোতুন বই বলতে কিছু নেই। সেই পুরনোগুলো ভ্যাপসা ধরে পড়ে আছে বন্দী হয়ে। খুকু সেগুলো দেখতে বসল। সুকুমারের যদি কাজে লাগে।

সে রাতে সুকুমারের চোখে ঘুম এলনা। এই গ্রাম, রামবাবু জমিদার—তাঁর মেয়ে খুকু। শহর থেকে এর কতো তফাৎ। শ্যামলা মেয়ের রূপের স্নিগ্ধতা আছে। খুকুর হাসিটা অপূর্ব। আর তার চুড়িব সেই ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ যেন স্তব্ধ রাত্রিতে ঝিঁঝিঁর একটানা সুরের সঙ্গে মিশে বেজে চলেছে ঘরের বাইরে, চারিদিকে।

পরদিন সকাল বেলা আলাপ করতে এলেন ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার বাবু। কালো রঙ। বেঁটে। রামবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি শ্রীহরিমোহন দাঁ। নমস্কার করে হরিমোহন দাঁ বললেন, আপনি কোন অঞ্চলের স্যার ?

অঞ্চল ? সুকুমার অবাক হোল। হরিমোহন দাঁ বললেন, মানে পাকিস্থানী না পশ্চিমবঙ্গের ? সুকুমার বললে, আদিনিবাস পূর্বদেশেই ছিল। আমরা অবশ্য কৃষ্ণনগরেই মানুষ। জন্মেছিও।

তাহোক। তবুও রক্ত ওই পূর্ববঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গে রামবাবুর মত লোক আর কজন। সব ঠ্যাঁটা। স্রেফ ঘটি। এই যেমন আমাদের ডাক্তার।

হ্যাঁ ? ওর খবরটা কি বলুনতো ? খাড়া হয়ে বসলেন রামবাবু। এক পুচকে ছোকরা, আমারই অধীনে চাকরী করে আমাকেই চোখ রাঙায় ? কি বলে ও ? ডাক্তার ?

হরিমোহন দাঁ বললেন, বলে ওই ফুড-কমিটির কথা। রামবাবুর জন্যেই ছেড়ে দিলাম।

ওকে আরও অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। রামবাবু দ্বিগুণ শক্তিতে আরম্ভ করলেন, আমার ওপর টেক্কা দিতে চায় ? আমার চেয়ে বেশি বোঝে ? আরে কতো ডাক্তার পার করলাম।

আক্রোশে ফুলতে ফুলতে সুকুমারের দিকে ঘুরে তাকালেন, শুনুন স্যার, গাঁয়ে এসেচেন, সাবধানে চলবেন। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না প্রাণ খুলে। তার ওপর আবার রিফিউজী এনেচেন। কেউ চায়না ওদের। ওরা নাকি শত্তুর।

হরিমোহন দাঁ বললেন, সে ওই ডাক্তারের কারসাজি। পশ্চিম-বঙ্গের লোকতো। ঘটি, বাঙাল বলতে ভারি রাগ।

ওকে আমি দেখে নেব। রামবাবু আবার আস্ফালন করে উঠলেন। সুকুমারের কাছে সমস্ত আলোচনাটাই অর্থহীন। সবকিছুই তার অপরিচিত। তবু আলোচনা শুনতে শুনতে প্রভাবিত হ'ল। কোন ষড়যন্ত্র, কূপমণ্ডুকতা, স্বার্থপরতার সঙ্গে নিশ্চয়ই হাত মেলাবে না সে।

মন্দিরের পুরোহিত ছোকরা তার বাসা থেকে বেরিয়ে এল। পরণে মটকার ধুতি। রামবাবু আলোচনা থামিয়ে ডাকলেন, ঠাকুর, অরুণ এখনো আসেনি। তুমিই রান্নাঘরে ঢুকে পড়। তিনকাপ চা তৈরী করে দাও।

পুরোহিত ছোকরা বললে, মন্দিরে যাচ্ছি যে।

তা হোক, চা করে গেলেই হবে। ঠাকুর দেবতার ঘুম ভাঙেনা এত সকালে।

হরিমোহন দাঁ হেসে উঠলেন। সুকুমারের কিন্তু কেমন লাগল। বসে বসে এইসব গল্প জমাতে আর চা খেতে সে আসেনি। সে এসেছে একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে। একদল উদ্বাস্তুকে সঙ্গে করে এনেছে। তাদের ভালোমন্দ, সুখদুঃখ দেখে পুনর্বাসন করিয়ে দিতে হবে। তারা বিলের ধারে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। কালকে তাদের ওই মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে কৃষ্ণনগর চলে গেছেন কলোনী অফিসার। আর সেও জমিদার রামবাবুর আশ্রয় নিয়েছে। সকালবেলাতেই একবার ওদের অবস্থা দেখে আসা দরকার।

রামবাবু বললেন, চলুন আমিও যাবো আপনার সঙ্গে। হরিমোহন দাঁও সঙ্গ নিলেন।

বিলের ধারে ফাঁকা মাঠে এসে উদ্বাস্তরা আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে ওরা আসতেই তাঁবুর পুরুষরা বেরিয়ে এল। বাবু এসেছে রে। হুজুর এসেছে।

একজন কলোনী অফিসার, একজন জমিদার, আরেকজনকে

চিনতে পারল না তারা। তবু সুকুমারদের সঙ্গে আছে বলে হরিমোহন দাঁকেও নমস্কার করতে আরম্ভ করল। রামবাবু কেতা-দুরস্ত লোক। হরিমোহন দাঁর পরিচয় ঘোষণা করলেন, ইনি, ডাক্তার-খানার কম্পাউণ্ডার বাবু। ডাক্তারই বলতে পার।

কৃতার্থ হরিমোহন দাঁ বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তারতো এখনো ছোকরা। পাশই করেছে শুধু। আমাকেই সব করতে হয়। আমারই দায়।

রামবাবু আবার বললেন, কাজেই তোমাদের দায় দৈবে এঁকেই কাজে লাগবে, নিশ্চয়। হরিমোহন দাঁ জানিয়ে দিলেন, আমার বাড়ীও পাকিস্থানে। এখানে চাকরী করি এই যা। আপনাদের কাজে লাগলে কৃতার্থ হব।

উদ্বাস্তবা কৃতার্থ। কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল চোখে চোখে। হরিমোহন দাঁ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অমনি। চলি এখন, হেঁ-হেঁ। আটটায় আবার ডিউটি।

হরিমোহন দাঁ পিছন ফিরে দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলেন। মাঠটার পাশেই ওই লালরঙের গোল একতালা বাড়ীটা ডাক্তারখানা। ওই দিকেই ছুটে চললেন উনি।

সেদিকেই তাকিয়েছিল সবাই। পিছনে ধপকরে একটা শব্দ হতেই সুকুমার ঘুরে তাকাল। একটা শুকনো ডাল মাটিতে ফেলে গৌরীশংকর এগিয়ে এল। উদ্বাস্ত যুবক ছোকরা। কাল সুকুমারের সঙ্গে এসেছে। সুকুমার প্রশ্ন-করল, কোথায় গিয়েছিলে?

এই স্তার, রান্নাতো দরকার। তাই কাঠ আনতে গিয়েছিলাম, পাশের গ্রামে। গিয়ে সে এক মজা—বেশিরভাগই মুসলমানের বাস। আমাদের বললে, কে? বললাম, রিফিউজী। কাঠ কিনতে পাওয়া যাবে না? শুনে ওরা বললে, কিনবে কেন? গাঁয়ে কি ওসব কিনে চলে? এই কাঠটা এমনিই দিয়ে দিল।

ওরা কি আর সাধে দিয়েছে? আরেকজন উদ্বাস্ত মাতব্বর শ্রীমন্ত আইচ মন্তব্য করল, ওরা ভয় পেয়েছে স্তার।

রামবাবু বলে উঠলেন, পাবে না? শালারা কি কম খচ্চর?

ওদের জন্যেইতো এই কলোনী বসান। না পোষায় পাকিস্থানে চলে যাবে।

আলোচনা হয়তো আরও চলত। সাইকেল চড়ে একজন এসে হাজির হল। শীর্ণদেহী। দাঁত উঁচু, টিকীওয়ালা। রামবাবু বলে উঠলেন, এই তো হাবুল এয়েচ। এই যে ইনিই কলোনী গড়তে এয়েচেন। সুকুমার বাবু।

ওঃ আপনি! হাবুল বললে, চিনতেই পারিনি। একেবারে বাঙলা ঢঙে আছেন। অফিসার বলে মালুমই হয় না।

সুকুমাবের নিজের অজান্তেই চোখ দুটো নিজের ধুতি সার্টের দিকে নেমে গেল। হাবুল বললে, আমি হচ্চি রামবাবুর গোমস্তা। রামবাবু বলে উঠলেন, আরও আছে। ফুড কমিটি আর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। হাবুল কর্মকাব নাম। আপনাকে এই সাহায্য করবে। ওই সব। আমিতো নামে জমিদার।

হাবুল কর্মকার আত্মপ্রশংসায় হাসল। বললে, আপনাদের তাহলে কি নাগাদ লোনেব বন্দোবস্ত হবে? সুকুমার বললে, ঠিক বলা যায় না। কাল মোটে এসেছি। এখন কৃষ্ণনগর থেকে কি খবর আসবে দেখতে হবে। নাহলে একদিন যেতে হবে অফিসে।

হ্যাঁ। তাই যাবেন। গরীব মানুষ সব। লোন তাড়াতাড়ি পেলেই উপগার। হাবুল কর্মকারের কথা শুনে উদ্বাস্তুরা পুলকিত হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। রামবাবু সেখান থেকে দূরে সরে গেলেন। বিলের কিনারের দিকে। বিলে ঘাট তৈরী হচ্ছে। মেয়েরা ওঠা নামা করছে। তাদের পদচিহ্ন নিয়ে ঘাটের সোপান শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রামবাবু আরও খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে জলের ওপর ফড়িঙ বসছে। বক বসে আছে। ফিঙে উড়ছে থেকে থেকে। খানিক পরে সেখান থেকে ফিরে তিনি সুকুমারকে বললেন, কি স্যার, যাবেন নাকি?

উদ্বাস্তুরা তখন সুকুমারকে ঘিরে ধরেছে। তাদের নানা প্রশ্ন। নানা সমস্যা। সুকুমার বললে, আপনারাই যান। আমি একটু এদের সঙ্গে কথা বলে নিই।

রামবাবু হেসে উঠলেন। হ্যাঁ, আপন জিনিশ বুঝেশুনে নিন সব। চল হাবুল আমরা যাই।

সুকুমারের জীবনে এই প্রথম কাজ। প্রথম তার নাবালকত্বের স্বীকৃতি। দায়িত্ব পালনের অধিকার প্রাপ্তি। কেরাণীগিরি নয়। শুধু হুকুম তামিল করা নয়। বিবেক, বিচার, বিবেচনার সাহায্যে এতোগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে সাহায্য করার দায়িত্ব ওর। এ তার গৌরব। যে কোন মানুষের পক্ষেই এ গৌরবের কাজ। সুকুমার সচেতন মন নিয়েই কর্তব্যকর্ম সুরু করল।

সুকুমার কাজ শেষ করে যখন মন্দিরে ফিরল তখন মাথার ওপর খাঁ খাঁ দুপুর। মন্দিরের উঠোনেও তখন কাজের হাট বসে গেছে। পথের ওপর সারি সারি গরুর গাড়ীর ভীড়। বস্তা ভর্তি গাড়ী। ধানভর্তি বস্তা। গাড়োয়ানেরা বস্তাগুলো পিঠে করে মন্দিরের উঠোনে নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে রাধারমণ ঘোষ আর তুলসী দত্ত বসে। ধান মেপে নিচ্ছেন। তুলসী দত্ত একটা বস্তায় বোমা মেরে একমুঠো ধান বার করলেন। হাতে নিয়ে বললেন, সি, তিন নম্বর। পাশেই দাঁড়িয়েছিল এক মুসলমান চাষী। আঁৎকে উঠল। তিন লম্বর কি হুজুর ?

তাই। দেখনা কতো ধুলো আর চিটে।

চিটে কুথায় ? ধুলো, হুজুর একেবারে বাদ দেবো ক্যামন করে ? মাটের কাজ। খামারেতো ছিমেণ্টো করা নেই।

তুলসী দত্তর পক্ষে এ অসহ্য। চড়া সুরে বললেন, অতো বুঝিনে। তোমার কথা শুনবার সময় নেই আমার। বললাম তিন নম্বর। বাস। সাড়ে পাঁচটাকা দর।

হুজুর। তুলসী দত্তর পায়ের কাছে চাষী হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মরে যাবো হুজুর। নাওল বিদের দাম উঠবে না।

কে ও ? রাধারমন ঘোষ মুখ তুললেন। আমি হুজুর। চাষী বললে। কে তুমি ? প্রশ্ন করলেন আবার রাধারমন ঘোষ। ওই দুর্লভপুরের— তুলসী দত্ত বলতেই রাধারমন ঘোষ বললেন, সামাদ সেখ ?

জী।

ও। তুমিই মেজাজ দেখিয়েছিলে? সামাদ সেখ ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল, না হুজুর। আমি বলেনু, অতো ধান আমার নেই। আপনারা খুঁজেও তো পাওনি। দোহাই হুজুর। তিন লম্বর লিখোনা। ছাকুন আমার ধান গুলোন আবার।

দেখেছি। তুলসী দত্তর স্থির বিচার। রাধারমন ঘোষ হেসে বললেন, মিঞা, কাজী বোঝ? কাজীর বিচার? কাজী বেশি বোঝে, না আসামী বেশি বোঝে? আমাদের ওই কাজ। ওই পড়েই হাকিম হয়েছি। উনি যা বলেছেন তাই হবে। মেজাজ চলে না। মগের মুলুক নয়। আইনের রাজ্য।

তুলসী দত্ত কর্মচারীকে বললেন, ও বস্তা নামিয়ে দাও। এখনো ঢের বাকী।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ সেরে আসার পর এ-দৃশ্য বিশ্রী লাগল সুকুমারের। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। তুলসী দত্ত ডাক দিলেন, কি স্যার, চিনতেই পারছেন না যে। আসুন, আসুন।

না। যাই। বেলা হয়ে গেছে। স্নান করিগে। সুকুমার দ্রুতপায়ে পরিবেশটা পার হয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে।

খাওয়া দাওয়ার পর সুকুমার একটু বিশ্রামের চেষ্টা করল। তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজার ওপর করাঘাতের শব্দ হল। সুকুমারের আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। বললে, কে?

আমি। অরুণ ঘোষের কণ্ঠস্বর। উঠে সুকুমার দরজা খুলে দিল। কি খবর?

আজ্ঞে—একটু বোকা হাসি হেসে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল অরুণ ঘোষ। দিদিমণি দিয়েচে।

চিঠিটা নিয়ে সুকুমার পড়ে ফেলল। কৌতূহল নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। না তেমন কিছু নয়। কাউকে উদ্দেশ্য করেও লেখা নয়। তলায় নাম সই করাও নেই। পত্রলেখিকার বক্তব্য হচ্ছে, তার একটি নিজস্ব পাঠাগার আছে। পাঠক ইচ্ছা করলে বই নিয়ে পড়তে পারেন। এর পরেই একটা পুস্তক তালিকা জুড়ে দেওয়া আছে। সুকুমারের হাসি

পেল। অরুণ ঘোষকে বললে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যাও।

অরুণ ঘোষ চলে গেল। সুকুমার ঘরে চৌকীর ওপর বসে আবার চিঠিখানা পড়তে বসল। সেই সঙ্গে ভাবতে লাগল, একি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন?

বিকেল হয়ে এল। ঠাকুর বাড়ির উঠোনের রোদ গিয়েছে পশ্চিমের বাঁশঝাড়ের মাথায়। উত্তর দিকের জানালার বাইরে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। রাখালেরা ঘরে ফেরার মুখে। ঘরের বাইরে দুটো ঘুঘু অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। সুকুমার বসে বসে খুকুর কথা ভাবছিল। রামবাবু ঘরের দরজায় এসে হাজির হলেন। কি মশাই, আছেন নাকি? সুকুমার চমকে উঠল। চিঠিখানা বাক্সের পাশে লুকিয়ে ফেলল। দরজার কাছে উঠে এল। ডাকল, আসুন।

রামবাবু উঠে এলেন। হেসে বললেন, কি ব্যাপার? ধ্যান ভাঙালাম নাকি? কার ধ্যান করছিলেন?

চরম লজ্জা পেল সুকুমার। রামবাবু বললেন, না মশাই, অত সহজে ভুলছিনে। আপনি কি কম? সকালে যা দেখেচি—

সুকুমার অবুঝের মত তাকাল। রামবাবু বললেন, আচ্ছা, ওটা কার বৌ?

বৌ? কোনটা?

ওই যে, সকালে হাবুলের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম, বিলের জলে নেমে চান করছিল।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল সুকুমার। রামবাবু দীপ্ত দৃষ্টি হেনে বললেন, রূপ আছে। আমার ত বয়স কম হলনা। তবু চমকে উঠলাম। সত্যিই চটক আছে। আর কি জানেন—ওর চঞ্চলতাও আছে। মানে যাকে বলে বার-টান। তাও আছে।

সুকুমারের চোখে ভাসল খুকুর মুখখানা। খুকুর বাবা রামবাবু। তাঁর এই উক্তি। সুকুমার এই প্রথম আঘাত খেল। রামবাবুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা টলে উঠল। বিশ্রী লাগছিল। রামবাবু আবার বললেন, সঙ্গে এনেছেন তবু দেখেন নি? দূর মশাই। কিছু হবেনা

আপনার দ্বারা। মানুষ হবেন না জীবনে। চলুন যাই পরিচয় নিয়ে আসি। আপনার ভালর জন্যেই। গাঁ জ্বলে যাবে কোন দিন। তখন কলোনী করা বেরিয়ে যাবে। চলুন।

না। সুকুমার আপত্তি করল। রামবাবু হেসে উঠলেন। সুকুমারকে হাত ধরে বেলতলায় টেনে আনলেন। সেখানে কর্মক্লান্ত রাধারমন ঘোষ আর তুলসী দত্ত চেয়ারে দেহ এলিয়ে সিগ্রেট টানছিলেন। ওরা যেতেই খাড়া হ'য়ে উঠলেন। রাধারমন ঘোষ বললেন, আসুন। আজ বড্ড খাটুনি হয়েছে। তুলসী দত্ত বললেন, আজ সেই শালা এসেছিল। সেই দুর্লভপুরের।

তাই নাকি? রামবাবু উৎসাহ প্রকাশ করলেন। সুকুমার লক্ষ্য করল রামবাবু একেবারে অন্যমানুষ হয়ে গেলেন যেন। পাকাবুদ্ধির সংসারী মানুষ। বললেন, তারপর?

তুলসী দত্ত বললে, দিয়েছি টিট করে। একেবারে সি করে দিয়েছি।

ঠিক হয়েছে। রামবাবু খুশী হলেন। দেশটাকে জ্বালিয়ে তুলেছিল। এবার আর দুই শয়তানকে দেখতে হবে।

কে?

উষাগ্রামের যতীন বিশ্বেস আর হজরত সেখ। ও দুটো আরও খচ্চর। শয়তান। সেবার আমার ভোটের সময় খুব জ্বালিয়েছে।

তুলসী দত্ত বললেন, দুটোকেই একাকার করে দেওয়া যায়। রাধারমনদা পারবেন না। আমাকে বলুন। এক ডাইরেকটিভ ইস্যু করে দিই। তারপর বলবে, নেই। অমনি বলব অমুক তারিখের মধ্যে ধান না নিয়ে এলে আমাদের ট্রাক যাবে। আর্মগার্ড যাবে। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। বুঝবে ঠেলা।

তাই করুন দিকি। রামবাবু খাড়া হয়ে বসলেন। জব্দ করুন ওদের। পুরস্কার দেব তাহলে। সে দিন রেডিও চাচ্ছিলেন তাই দেব।

আর আমাকে? রাধারমন ঘোষ তেরচা ভাবে তাকালেন। আপনাকে? রামবাবু সহজ সুরে বললেন, আপনাকেও দেব। ধান

ওজনের সময় চলতাটা আরেকটু বাড়িয়ে দেবেন। আপনারও হবে। আমারও হবে, স্যার।

যান্ত্রিক আলোচনা। প্রাণহীন। বরং বলা যায় প্রাণঘাতী। সুকুমারের তাই মনে হল। উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অরুণ ঘোষ বেলতলায় পেট্রোমাক্স জ্বেলে দিল। আর একটু পরেই হরিমোহন দাঁ এসে হাজির। সুকুমারকে নমস্কার করে বললেন, আপনাকে কলোনীর ধারে খুঁজে এলাম। আজ আর বার হননি বুঝি? গ্রামটা দেখা হয়েছে আপনার?

না। সুকুমার বললে।

তবে চলুন না, দেখিয়ে আনি।

সুকুমার বাঁচল।

হরিমোহন দাঁ সুকুমারকে নিয়ে গেলেন ভূপাল বাবুর বৈঠকখানায়। ভূপালবাবু রামবাবুর ভাগনে-জামাই। অল্প বয়সী, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। হরিমোহন দাঁ বললেন, এখানেই আমাদের তাসের আড্ডা। সুকুমার গিয়ে দেখলও তাই। তখন আড্ডা চলছিল সেখানে। খড়ের পাঁচচালা ঘর। বাইরের বাড়ি যাকে বলে। হরিমোহন দাঁ বললেন, দেখুন কাকে এনেছি।

তাসের আড্ডা ভেঙে গেল। অফিসার এসেছেন। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আসুন স্যার, ওপরে উঠে আসুন।

সুকুমার ওদের এই এত আপ্যায়ন ঠিক যেন মানিয়ে নিতে পারছে না কিছুতেই। লজ্জা পেল। বারান্দায় উঠল। ভূপাল বাবু ঘর থেকে একখানা চেয়ার এনে সুকুমারকে বসতে বললেন।

পরস্পর সৌজন্য বিনিময়ের পর এক প্রৌঢ় প্রশ্ন করলেন, স্যার, এই সব উদ্বাস্তুদের তো আনলেন। ওরা এখানে করবে কি?

কেন? সুকুমার বললে, যার যা বৃত্তি সে তাই করবে। ব্যবসায়ীর ব্যবসা। চাষীর চাষ। তারজন্যে লোন দেওয়া হবে।

প্রৌঢ় হেসে উঠলেন বললেন, এতো আমরাও শুনেছি। কিন্তু এটা

কি ব্যবসার জায়গা ? চাষ কি রকম হবে, লোন দিলেই কি সব কাজ হয়ে যাবে ? আমরা তো :ভবে পাইনে। আপনারা অফিসার, ভাল বলতে পারেন। বলুন দিকি, একেতো আমরা বেকার। আবার এতোগুলো এল। সবাই মিলে এ গাঁয়ে কি হবে ?

দুদিন হ'ল সুকুমার এখানে এসেছে। এসে অবধি উদ্বাস্তুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই ভেবেছে। কিন্তু এমন প্রশ্ন কেউ করেনি। প্রশ্ন শুনে তাই চমকে উঠল। লোন পেলেই ব্যবসায়ীর ব্যবসা জমে উঠবে না। চাষীর ফসল ঘরে উঠবে না। মাঝে অনেক বিপত্তি। এটা চিন্তার কথা। সুকুমারকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। এসম্পর্কে একটা আলোচনা হওয়া দরকার। উদ্বাস্তু আর স্থানীয়দের নিয়ে একটা সভা করতে পারলে মন্দ হয় না। রাত্রিবেলা মন্দিরে ফিরে রামবাবুকে একলা পেয়ে সে কথাটা উত্থাপন করতেই কিন্তু রামবাবু তীব্র প্রতিবাদ জানালেন—মশাই আপনি বালক। ছেলে মানুষ। ওসব চিন্তা মোটে করবেন না। লোক জানিয়ে কোন কাজ হয় না যা ভাববেন, মনে মনে। তারপর একেবারে কাজে নেমে যাবেন। নানামুনির নানা মত শুনতে গেলে পাগল হতে হয়। শেষে তিনি বললেন, কিছু ভাববেন না। আমি যখন আছি। এ অঞ্চল আমারই অধীন।

রামবাবুর কথা ঠিক মনঃপুত হল না সুকুমারের। কিন্তু কোন প্রতিবাদ জানাল না। মনে মনে ঠিক করল সে-রাতে, আর এমন করে বসে কাটাবেনা সে। কাল সকাল থেকেই কাজে নামবে। তার কাজ তাকে নিজেকেই দেখে নিতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা উঠেই তাই সুকুমার কলোনীতে চলে গেল। তখনো সূর্য ওঠেনি ভাল করে। তার পূর্বাভাসে অন্ধকার দূর হয়েছে মাত্র। ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে তাঁবুগুলোর পাশে দাঁড়াল সে। বিল থেকে স্নান করে আসছিল সাধুচরণ। গেরুয়া পরে থাকে। সেদিন আসবার পথে গান করেছিল একতারা বাজিয়ে। সে এগিয়ে এল। নমস্কার করে বললে, প্রাতঃকালেই যে কর্তাবাবু।

সুকুমার হাসল। হ্যাঁ। তোমাদের দেখতে এলাম। কেমন লাগছে এ জায়গা। সাধুচরণ মাতব্বরের মত বললে, জায়গা কি আর খারাপ হয় কর্তাবাবু। এসবই তেনার সৃষ্টি। তেনারই লীলক্ষেত্তর। কিন্তু আমরা কতোটুকু লীলা করতে পারব তেনার সঙ্গে, তাই কথা। আকাশে সূর্য প্রকাশমান। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে হেসে বললে, কর্তাবাবু, কি নাগাদ হিল্লে হবে আমাদের?

সেই কথাইতো বলতে এসেছি। সুকুমার বললে, একটু বেলা হলে সকলকে ডেকে নিয়ে যেও মন্দিরে। আমার ওখানে। আজ থেকেই চেষ্টা আরম্ভ করতে হবে।

সাধুচরণের পাশে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও শুনল। সুকুমারও তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আবার মন্দিরে ফিরে গেল।

সুকুমারের কথামত বেলা নটা নাগাদ উদ্বাস্তুরা মন্দিরে গিয়ে হাজির হল। শুধু দুজন আসেনি। নবীন আর জীবন দুভাই। অন্যান্যেরা বললে, তারা আসবে কি করে? জমিদারবাবু যে তাদের তাঁবুতে বসে আছেন। সুকুমার সন্দিগ্ধ হ'ল। জমিদারবাবু ওখানে? উদ্বাস্তুরা বললে, কাল রাতেও-তো গিয়েছিলেন উনি। আলোচনা করলেন আমাদের সঙ্গে, র‍্যাশন কার্ড করে দেবেন। চিনির পারমিট দেবেন। ব্যবসা আর চাষ সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। আর নবীনরা হচ্ছে সোনারূপোর কারবারী। অনেক পুঁজি দরকার বলে এখনো আলোচনা করছেন।

সুকুমারের মন প্রশ্নসংকুল হল। কিন্তু বাইরে ' সে নীরব থাকল। কাজ আরম্ভ করে দিল উদ্বাস্তুদের নিয়ে।

এগারটার সময় রামবাবু এসে হাজির হলেন। সামনে এসে হেসে উঠলেন। খুব কাজ করছেন স্যার? আমিও কম করলাম না। সেই ভোরে গিয়েছিলাম। আলোচনা হল। চাষীদের জন্যে ভাল জমি দেব। সোনা ফলবে। মুস্কিল ব্যবসায়ীদের নিয়ে।

সুকুমারের মনে পড়ল গতরাতের কথা। ভূপালবাবুর বৈঠকখানার

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাই আজ উনি নিজের করে বলছেন। উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে রামবাবু বললেন, চিনি নেবেতো সব? এস আমার কনট্রোলের দোকান দেখিয়ে দিই। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল সুকুমারের। উদ্বাস্তুরা রামবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অনেক কাজ হয়েছে সকালে। দুপুরে তাই খুশীমনে বিশ্রাম করতে গেল সুকুমার। আর সেই খুশীর অবকাশে মনে পড়ল খুকুকে। গতকাল খুকু বইএর তালিকা পাঠিয়েছে। তার থেকে সুকুমার একখানা বই বাছল। একটুকরো কাগজের ওপর সেটা লিখে অরুণ ঘোষকে ডাকল। অরুণ এল, কি বুলচেন?

কাগজের টুকরোটা দিয়ে সুকুমার বললে দিদিমণির কাছে যাও। অরুণ ঘোষ চলে গেল। সুকুমারও মনের কল্পনা নিয়ে উঠনে নেমে এল। ডাকল, অরুণ।

অরুণ ঘোষ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুকুমার বললে, চল, আমাকে তোমার দিদিমণির কাছে পৌঁছে দেবে।

অরুণ ঘোষ হেসে বললে; আপনি তো পথ চেনেন। সেদিন গেলেন যে রেতের বেলা।

দিনেতো যাইনি। অন্ধকারে পথ-চলায় কি পথ চেনা যায়? চল। অরুণ ঘোষ উঠোনে নেমে এল।

খুকু উঠোনেই দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সুকুমারকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা নিচু করে বললে, আসুন। নিজের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। ঘরের সামনে গিয়ে সে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সুকুমার ধীর পদেই উঠে গেল। ঘরে ঢুকে সুকুমার প্রশ্ন করল, আপনার বাবা কোথায়?

বেরিয়েছেন। খুকু বললে। আবার নীরবতা ঘরময়। সুকুমার চারিদিকে তাকাতে লাগল। একপাশে সুন্দর খাটে সুন্দর বিছানা। অন্য পাশে বইএর আলমারি। বেশ খানিক পরে খুকু বললে, বসুন। বিছানাটা দেখিয়ে দিল সে। আর কোন বসবার আসন নেই। বিছানাতেই বসল। বলল, এই আপনার লাইব্রেরী?

হ্যাঁ। নিজে নেড়ে চেড়ে দেখুন একবার। সুকুমার তাকাল খুকুর মুখের দিকে। খুকুও তাকিয়ে ছিল। খুকু সহজভাবে আবার বললে, যান, দেখুন।

কী ছেলে মানুষী! খুকুর আলমারি খুলে বই দেখতে হবে এখন। উপেক্ষা করতে পারলনা সুকুমার। উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বই দেখতে বসল। খুকু দেখতে লাগল। সুকুমার পছন্দ মত একখানা বই বার করে নিল। উঠে এসে আবার বিছানায় বসে বলল, এখানা নিলাম।

বেশ। আর কোন কথা বলতে পারল না। সুকুমারও খানিক চুপ করে বসে থেকে শেষে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই খুকু গিয়ে দাঁড়াল তার বিছানার কাছে। সুকুমার বিছানার যে অংশে বসেছিল তার ওপর গিয়ে বসল। শুয়ে পড়ল। শুয়ে থাকল অনেক—অনেকক্ষণ ধবে।

খুকুর লাইব্রেবীর সে উপন্যাস রাতেই সুকুমারের পড়া হয়ে গেল। তারপর ভাবল অনেকক্ষণ বসে। এবার আর বই আনতে যাওয়া ঠিক নয়। কলেজে-পড়া ছাত্রজীবন আর নেই। নতুন চাকরী, আর দায়িত্ব, পরিবার পরিজন পালনের দায়িত্ব এসেছে আজকাল। দায়িত্বের অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। সে সব ভেবেই সে ঠিক করল বই অরুণ ঘোষেব মারফৎই ফেরৎ পাঠাবে। সকালবেলা সেই উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বার হল সে। অরুণ ঘোষকে খুঁজতে। বেলতলা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল। রান্নাঘরের দরজায় অরুণ ঘোষ দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পরিপাটি যুবক। মিহি ধুতি পাঞ্জাবী, পামসুর পোষাক, হাতে সোনার বন্ধনী বাঁধা ঘড়ি। সুকুমার আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। অরুণ ঘোষ ডাকল, হুজুর—

সুকুমার ঘুরে দাঁড়াল। অরুণ ঘোষ যুবককে বললে, এই যে ইনিই এয়েচেন কলোনী করতে।

ও! আপনি! নমস্কার দাদা। [illegible] বললেন [illegible] ঘোষ

সুকুমারকে বললে, ইনি ছোটবাবু।

ছোটবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার নাম এল. সি. মণ্ডল। অর্থাৎ লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল। এখানে থাকিনে বিশেষ। কখনো কেশনগরে, কখনো কলকাতায় থাকি। মাঝে মাঝে ছুটে আসি এই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। আর এই অরুণটা—এর সঙ্গে দেখা না করলে, খুনস্যুটি না করলে মনটা কেমন করে। আরও এর বৌটার জন্যে দুঃখ হয়। তার সাধআহ্লাদ মেটাবে না। একটা তেল সাবান কিনে দেবে না। থিয়েটার সিনেমা দেখাতে শহরে নিয়ে যাবে না।

অরুণ ঘোষ বললে, আমাদের আবার ইস্ত্রী।

বলিস কিরে তুই। এল. সি. মণ্ডল বললেন, উনি না হয় দেখেননি। কিন্তু আমি? সুকুমারকে বললেন, জানেন মশাই—এই দেখছেন—হাতের মধ্যে জড়ান একখানা পত্রিকা খুলে ধরলেন এল. সি. মণ্ডল। তার প্রচ্ছদে একটি তরুণীর কুৎসিত যৌন অভি-ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে বললেন, দেখেছেন। ঠিক এই রকম। এই উল্লুকটা যদি যত্ন করে তোয়াজে রাখত তাহলে এসবতো ফেল মারত। মাইরী বলছি দাদা। এ ব্যাটার বৌতো নয়। বাঁদরের গলায় মুক্তোহার। সুকুমার অরুণ ঘোষের দিকে তাকাল। অতবড় জোয়ানটা কেমন হাবাগোবা হয়ে গেছে। সুকুমার ঘরের দিকে ফিরে চলল। যেতে যেতে শুনল, এল. সি. মণ্ডল বলছেন, চল্ আজ তোর বাড়ীতে খাব। তোর বৌএর হাতের চিঁড়ে দই অনেকদিন খাইনি।

দূরে বেলতলায় পৌঁছে সুকুমার একবার পিছনে তাকাল দেখল, এল. সি. মণ্ডল অরুণ ঘোষের বলিষ্ঠ হাত দুখানা ধরে ছোট্ট ছেলের মতো ঝুলবার চেষ্টা করছেন। অরুণ ঘোষ মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে ছোটবাবুর ফোলানো ফাঁপানো জামা কাপড়ের মধ্যে।

পরদিন বেলতলায় দাঁড়িয়ে রামবাবু আস্ফালন করে উঠলেন, শালা, বললাম যাস্‌নে। তা শোনা হ'ল না। মরুকগে।

সকালবেলা কি ব্যাপার? সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওই শালা অরুণ ঘোষ ছুটল কেশনগর। পই পই বললাম

যাসনে। তা হোলনা। যত জানে আমার ভাইটা। ছিলি বাবা শহর বাজারে, ফুর্তিরতো অভাব নেই সেখানে। রেস্ত থাকলেই হোল। তাও গাঁয়ে আসা চাই। আবার হুঁকড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হোল ছোঁড়াটার বৌকে সুদ্ধু। সিনেমা দেখান হবে। হুঁ। মরণ পাখা উঠেছে।

সুকুমার অবাক হয়ে শুনছিল। রামবাবু কথা থামিয়ে দুবার পায়চারি করলেন। তারপর সুকুমারের সামনে এসে বললেন, আজতো আর চা জলখাবার এখানে হবে না দেখছি। বাড়ী থেকেই আসবে। খুকুকে বলে দিয়েছি। আর ও যদ্দিন না আসে, দিনেরাতে ভাতটা বাড়ীর মধ্যে গিয়ে খাবেন। বুঝলেন? আর দাঁড়ালেন না রামবাবু। উত্তেজনায় বড় বড় পা ফেলে পুকুরপাড়ের রাস্তায় নামলেন।

খানিকপরে বুড়ী ঝি খুকুর কাছ থেকে জলখাবার নিয়ে এল। দুপুরবেলা সেই আবার সুকুমারকে ডেকে নিয়ে গেল ভাত খাবার জন্যে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, দিদিমণি—

খুকু রান্নাঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। কোমরে আঁচল জড়ান। হাতে হলুদের মাখামাখি। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথার ভিজে চুলগুলো এলোমেলোভাবে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সুকুমারকে দেখে একটু সলাজ হাসি হাসল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠনে নেমে এল। দালানের দিকে যেতে যেতে বললে, আসুন।

নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সুকুমারকে বসাল আবার। হাতে একখানা বই তুলে দিয়ে বললে, পড়ুন ততক্ষণ। আমি খাবার সব সাজিয়ে আসি।

খুকু বেরিয়ে গেল আবার। সুকুমার বই হাতে ভাবতে লাগল, শিল্পীর বিচারের সৌন্দর্য খুকুর নেই। তবু কি একটা আকর্ষণ আছে যেন।

খুকু খেতে ডাকল। খেতে বসে সুকুমার প্রশ্ন করল, বাবা কোথায়?

বেরিয়েছেন।

এখনো ফেরেননি ?

এখনি ? দুপুর গড়িয়ে যাক, আগে। রাতে তো আর বেরুন হবে না।

কেন ?

স্নকুমারের প্রশ্নে খুকু বিব্রত হয়ে পড়ল। কথায় কথা বেরিয়ে পড়েছে। এখন সেটাকে চাপা দিতে বলল, মাছ টুকু সব খান। ফেলবেন না কিন্তু।

স্নকুমার কৌতূহলী। খেতে খেতে আবার প্রশ্ন করল, রাতে উনি বার হন্ না কেন ?

মুস্কিল। সত্যি সকল সময় বলা যায় না। অথচ প্রশ্নের জবাব না দেওয়াও অভদ্রতা। বাধ্য হয়ে খুকু বললে, অরুণ নেই, তাই।

কেন, অরুণ না থাকলে কি ?

বাবা ভয় করেন। দেশের লোকতো ভাল নয়। বাবা নেতা হয়েছেন। সরকারী লোক এখানে ওঠাবসা করে, তাই অনেকের হিংসে। তাই রাতে অরুণ সঙ্গে লাঠিহাতে থাকে।

স্নকুমারের চোখের সামনে সকালের রামবাবুর সেই উত্তেজিত মূর্তি ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনা বোধ করল সে। গ্রামের নেতাকে, এমন একজন উত্তমশীল মানুষকে ভয়ে ভয়ে বেড়াতে হয় ? স্নকুমার এরপর আপন মনে খেয়ে উঠে পড়ল। খুকু পান এনে দিল। প্রশ্ন করল, এবার কি করবেন ? বিশ্রাম না বই পড়া ?

স্নকুমার বললে, কোনটাই না। ভাবছি এখন একবার কলোনীতে যাব।

এখনি ?

হ্যাঁ। সকালে যাইনি।

ও। এখুনি যাবেন ?

কেন বলুন তো ?

না। এমনিই।

তাই কি ?

হ্যাঁ। কলোনী বসাচ্ছেন তো। কত লোকজন এল। সেই ঠাকুর বাড়ীতে নামল। শাঁখ বাজাবার আর খই ছিটাবার সময় দেখলাম।

সুকুমার প্রশ্ন করলে, আপনি ছিলেন নাকি?

ছিলাম।

সত্যি? দেখিনি তো!

দেখেছেন। চিনতেন না।

সুকুমাব একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে, তাহলে—

তা হলেও আমি ছিলাম। আপনাকে দেখেছিলাম। মাথা নীচু কবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যা লজ্জা—

এবার লজ্জা পেল সুকুমাব। কলেজে পড়া, কো-এডুকেশনে পড়া ছেলে হেবে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গান্তবে যাবাব ইচ্ছায় তাই সে বললে, আপনি যাবেন কলোনী দেখতে?

তা যেতে পাবি।

সুকুমার উৎসাহিত হল। খুকু বললে, কিন্তু এখন তো হবে না।

বেশ। বিকেলে। আমিও তাহলে এখন যাবনা। শুয়ে একটু বিশ্রাম করিগে।

বিশ্রাম হলনা সুকুমাবেব। তাব জন্য মনের যে স্থিবতা দরকার, তাব অভাব। ঘবময় পায়চাবি করতে লাগল। আব মাঝে মাঝে জানলাব ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল, পুকুরের স্থিব জলে পডেছে নাবকেল গাছেব বঙ্কিম ছায়া। উত্তরে দিগন্তবিস্তৃত ধূসর প্রান্তব। দ্বিপ্রহবের তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণী পাক খেয়ে ওঠে থেকে থেকে। অদ্ভুত পরিবেশ। এখানে শহর নেই। শহরেব মানুষ নেই। সহ-পাঠিনী বিচিত্রবেশা, সিনেমাযাত্রিনী অসংকুচিত পথচারিণী—কেউ নেই। শুধু খুকু। একটি তরুণী [illegible] যেন অনেক কাছের মানুষ। নিবিড় সম্পর্ক। আজ কলোনী দে[illegible]বে ওর সঙ্গে। বিকেল হবার আগেই ঘব থেকে সুকুমার বেরিয়ে পড়ল। রামবাবুর অন্দব মহলে গিয়ে উঠল। রামবাবু এসে খেয়ে দেয়ে আবার বেরিয়ে গেছেন। খুকু বিশ্রাম

করছিল। সুকুমার ডাকল। ঘরের দরজায় উঠে গেল। খুকুর আয়ত চোখ দুটোতে প্রশ্ন ভরা।

সুকুমার হেসে বললে, তৈরী তো?

খুকু বললে, কি জন্যে?

সুকুমার অবাক হল। একি রহস্য না সত্যি? মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কি কথা হয়েছিল তখন? খুকু হেসে উঠল। বললে, সেকথা মনে রেখেছেন আপনি? তাই এসেছেন?

কেন? যাবেন বলেছেন তো তখন কলোনীতে।

ও বাবা—না, না। কলোনীতে যাওয়া হবে না আমার। প্রায় শিউরে উঠল খুকু। এ-যে পাড়াগাঁ। দেখেন না সারাদিন বাড়ীর মধ্যে থাকি।

সুকুমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খুকু আবার শিউরে ওঠার ভঙ্গীতে বললে, গাঁতো চেনেন না, সাংঘাতিক। তখন আপনাকে এমনই বলেছিলাম। খুকু হাসল। বললে, বসুন, গল্প করা যাক না। সুকুমার যেন জেগে উঠল। ঘর থেকে নেমে এল ক্ষুব্ধ পদে। কিন্তু কেন নেমে এল তার জবাব পেলনা রাস্তায় নেমে। মনে কোন চিন্তাই দানা বাঁধছে না। দুপুরের ঘূর্ণী হাওয়ার মতো কি যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে মনের মধ্যে। কলোনীর দিকে এগিয়ে চলল।

সুকুমার ডাক্তারখানা ছাড়াতেই কানে ভেসে এল একটা গানের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। কলোনীতেই গান হচ্ছে। সাধুচরণ গান ধরেছে মাঠে বসে। চারিদিকে পুরুষরা ভীড় জমিয়েছে। কাছে গিয়ে সুকুমার দেখল, মাঝখানে রামবাবু বসে। সুকুমারকে দেখে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। সাধুচরণ গান থামিয়ে হাসল। রামবাবু বললেন, আসুন। আপনার অবর্তমানে দেখাশুনার কাজ ভালই চলছে স্যার।

সবাই হেসে উঠল। সুকুমারের মনে তখনো খুকুর কথা পাক খাচ্ছে। সে হাসতে পারলনা। বৈশাখের দারুণ উত্তাপে পথ হাঁটতে পিপাসার্ত হয়ে উঠেছিল বেশ। বললে, এখানে জল খাওয়া

হচ্ছে কোথাকার ?

সাধুচরণ বললে, ওই বিলেব। রামবাবু বললেন, মন্দ না জল। গাঁয়ের সবাই খায়। তবে আজকালকার দিনে—দেখা যাক। স্যারতো আছেন। দুজনে চেষ্টা কবে এখানে একটা কল বসিয়ে দিচ্ছি। রামবাবু হাসতে যাচ্ছিলেন। সুকুমাব বললে, তাবজন্যে নয়। তেষ্টা পেয়েছে। এক গ্লাস জল—। কথা শেষ হ'লনা। কলোনী অফিসাব জল চেয়েছেন। সবাই ব্যস্ত যেন। কে এই জল এনে দেবে, নিজেব তাঁবুতে ছুটতে উদ্যত হ'ল সকলেই। বামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আসুন। সবাই থমকে দাঁড়াল। বামবাবু বললেন, তোমরা বস এখানে। আসুন স্যার। জল খাবেন।

দুটো তাঁবু পেরিয়ে বিলেব শেষ তাঁবু হচ্ছে নবীনদের। সেখানে গিয়ে রামবাবু ডাকলেন, নবীনকে। নবীন বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। একহারা লম্বা যুবক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। লাজুক স্বভাব ওব। রামবাবু বললেন, স্যার জল খাবেন। দাও। নবীন ভিতবে চলে গেল। রামবাবু বললেন, এই আমাদের নবীন। এর ভাই জীবন। দুজনেই বেশ ভদ্র। যতো এনেছেন তারমধ্যে সবচেয়ে রুচিবান। আব সব হা-ঘবেব দল। ওদের গ্লাসে জল খাওয়া যায় না। ছিঃ। ঘৃণায় ঠোঁট উল্টালেন বামবাবু। তাই এখানে নিয়ে এলাম আপনাকে।

জলের গ্লাস হাতে নবীনেব বৌ বেরিয়ে এল। মাথায় বড় ঘোমটা। হাতে কাঁচের গ্লাসে জল। রামবাবু ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। ওর হাত থেকে জল নিয়ে সুকুমারকে দিলেন। নিন্ স্যার। জলতো নয়। বরফ গলে আছে। কলসীর জল। কর্পূর দেওয়া। আমি রোজ খাই। নবীনের বৌ হাসল। নিঃশব্দ হাসি। সুন্দর লাগল সুকুমারের। দেহের রঙ, মুখের ছাঁচ, হাসি—এত নিখুঁত। ঘরছাড়া উদ্বাস্তু লাজুক যুবকের ভাগ্যে জুটল কি করে ?

জল খাওয়া শেষ হলে ফিরে চলল ওরা। যেতে যেতে রামবাবু বললেন। দেখলেন তো ? বলেছিলাম বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

মাইরী—কেমন দেখলেন—এ্যাঁ? হেঁ-হেঁ-হেঁ। রামবাবু হেসে উঠলেন। রামবাবুর হাসির ঝড়ে সুকুমারের মনের অবস্থা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। যেন শিল্পীর ছবির ওপর উল্টে পড়ল রঙের পাত্রটা। উগ্ররঙের তলায় ডুবে গেল সেরূপ, সে সূক্ষ্ম রেখার ভাবময় ইঙ্গিত।

খুকুর বাবা রামবাবু। জমিদার রামবাবু। নেতা রামবাবু। অথচ এসব কী উক্তি। কিসের ইঙ্গিত। সুকুমারের বিশ্রী লাগল। গুমরে উঠল ওর মন এক নিদারুণ ক্ষোভে।

পরদিন বিকেলবেলা সুকুমার তখন নিজের ঘরে বসে। রামবাবু গিয়ে হাজির হ'লেন। কি মশাই যাবেন নাকি কলোনীতে?

সুকুমার গম্ভীর হ'ল। বললে, আপনাকে একটা কথা বলব?

আমাকে? বলুন।

সুকুমার ইতস্ততঃ করে বললে, কিছু মনে করবেন না যেন। রামবাবু বললেন, না, না। বলুন না ছাই। সুকুমার বললে, নবীনদের কথা। রামবাবু কৌতূহলী। বললেন, কি? সুকুমার বললে, আপনি জমিদার। সম্মানীয় ব্যক্তি। নবীনদের তাঁবুতে অমন করে যাতায়াত করেন।

তাতে কি? খাড়া হয়ে বসলেন রামবাবু। তাতে কি হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে আপনাকে? কে বলুনতো? সুকুমার বললে, না, কেউ বলেনি। আমিই বলছি। বলতে কতক্ষণ। মুখের কথা বেরুলেই হল।

বেরুলেই হ'ল? রামবাবু মাথা উঁচু করলেন। সুকুমার অবাক হ'ল। এমন প্রসঙ্গে ভদ্রলোকেরা লজ্জিতই হন্। রামবাবু বললেন, বললেই হ'ল? তাকে বাস করতে হবেনা এখানে? আর, কি হয়েছে মশাই? মধু থাকলেই মাছি যায়। আপনি ছেলেমানুষ, তাই। ঘাবড়াবেন না, ওসব অনেক দেখা আছে আমার। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপ্রত্যাশিত রূপ রামবাবুর। সুকুমার-এর মনে হ'ল এই প্রথম দেখল যে, রামবাবু অনেক দূরের মানুষ। রামবাবু হাসতে হাসতে বলে চলেছেন, মশাই, মানুষের রূপ যৌবন তো মানুষের জন্যেই। আর

মেয়েমানুষকে মরদেই ভোগ করে। আপনারা বলে শিক্ষিত, বিদ্বান! জানেন না এসব! এঁ্যা—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বসুন্ধরা মানে কি? মেয়েমানুষ। ক্ষেত্র। ফসল ফলানো ভূমি। সুকুমারের বিদ্যেবুদ্ধি প্রায় শূন্য ডিগ্রিতে নেমে এসেছিল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ প্রায় ত্রাণকর্তার মত এসে উপস্থিত হলেন সে সময়। হেসে বললেন, দু'জনেই আছেন দেখছি। স্যারকে ডাকতে এলাম। এ অঞ্চলটা চিনিয়ে দিতে চাই। পাশের গাঁয়ে যাচ্চি। একটা কল এয়েচে। তাই ভাবলাম, স্যারকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।

রামবাবু বললেন, হ্যা, হ্যাঁ, নিয়ে যান। বুদ্ধিটা একটু পাকিয়ে দিন ওঁর।

সুকুমার সামনে থেকে সরে গেল। জামাকাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল। হরিমোহন দাঁকে বললে, চলুন।

বন্দীপুরের পাশ দিয়ে বিল চলে গেছে। বিলের ওপর কাঠের সেতু যোগাযোগ স্থাপন করেছে ওপারের গ্রামের সঙ্গে। এই সেতুর ওপর দিয়েই সেদিন সুকুমাররা প্রবেশ করেছিল এই গ্রামে সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে—হরিমোহন দাঁ বললেন, আমি যখন প্রথম আসি এখানে তখন এ পুল ছিল না। চোত বোশেখে এখানে বাঁশের পুল বেঁধে যাতায়াত চলত। বর্ষাকালে জল ফাঁপলে একটা ডিঙি জোগাড় হ'ত বটে। কিন্তু আমারই হ'ত মুস্কিল। রাত বিরেতে রুগীর বাড়ি থেকে ডাকতে আসতে পারত না। তখন ডাক্তার ছিল এক বুড়ো। লোকও ভাল। জ্ঞান ছিলও খুব। তবে বাইরে কলে যেত না। কাজেই আমারই ঝামেলা হ'ত। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে আরতো ডাক্তার নেই।

সুকুমার অবস্থাটা কল্পনা করছিল। হরিমোহন দাঁ বললেন, এখন হয়েছে আরেক জ্বালা। ছোকরা ডাক্তার। কিন্তু যেমন ব্যবহার তেমনি মুখ্যু।

মুখ্যু! সুকুমার প্রশ্ন করল। হরিমোহন দাঁ হেসে ওঠলেন। পাশ করলেই হয় না। অভিজ্ঞতা চাই। মাথার চুল যত পাকবে

বুদ্ধির ঘুটিও তত পাকবে। মানুষের প্রাণ নিয়ে কারবার। যমের সঙ্গে লড়াই। সোজা নয়।

ওরা সেতু পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে এসে পড়ল আলোচনা করতে করতে। মোড়ের মাথায় একটা মুদীর দোকান। হরিমোহন দাঁ ছুটে গেলেন সেখানে। মুদীর সঙ্গে কি বলাবলি ক'রে আবার ফিরে এলেন। চলুন। এই দোকানদারটা আচ্ছা ম্যাচলা মশাই। ছেলের অসুখ হ'ল। বাড়ি বয়ে এসে রোগ সারালাম। তার পাওনা টাকা দেবার নাম নেই। নেমকহারাম—যতসব।

মুসলমান পল্লীর মধ্যে ঢুকে কাপড়ের কোঁচা নাকে তুললেন হরিমোহন দাঁ। নাকি সুরে বলে উঠলেন, ওঁ কি নোংরা। এঁকেঁই বঁলেঁ জাঁতেঁর দোঁষ। কথা শেষ করেই পাশের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। নাকের কাপড় সরিয়ে ডাকলেন, কইগো, জাবেদা খাতুন—

কে? ভিতর থেকে ক্ষীণ কম্পিত পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। হরিমোহন দাঁ বললেন, আমি, ছোট ডাক্তারবাবু। জাবেদা ছুটে এল। বিধবা। বাইশ চব্বিশ বয়স হবে। উৎসাহ নিয়ে এসে সুকুমারকে দেখে থমকে গেল। মাথায় ঘোমটা তুলে পিছিয়ে যাচ্ছিল। হরিমোহন দাঁ বললেন, দাদা কেমন আছে গো? দেখতে এলাম।

এস, ঘোমটার আড়াল থেকে জাবেদা বলল।

একখানা মাত্র ঘর। খড়ের তিন চালা। তার বারান্দায় জাবেদার দাদা শুয়ে। খেজুর পাতার মাদুরে শুয়ে ধুঁকছে। হরিমোহন দাঁ বললেন, কেমন আছ সামাদ?

সামাদ বললে, বড্ডা যাতনা প্যাটে। হরিমোহন দাঁ বললেন, তা তো হবেই। জ্বরও আছে। বলেই বারান্দায় রোগী পরীক্ষা সুরু করলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বললেন, এ রোগ তাড়াতাড়ি সারাতে চাও, না ক্রমে ক্রমে?

সামাদ নাকি সুরে বললে, ওগ কি পুষা যায় ডাক্‌তোর বাবু? পড়ে থাকলেই নুকশান্। না খেয়ে মরব।

জাবেদা আর সামাদের বৌ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে হরিমোহন দাঁ বললেন, তাহলে তেজী ওষুধ লাগবে। ছুঁচ ফুটাতে হবে গায়ে। তাই ভাল। কথা শেষ করেই ইনজেকশনের সরঞ্জাম বার করলেন পকেট থেকে। বুঝলে জাবেদা—এর দামটা কিন্তু নগদ দিতে হবে।

জাবেদা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে বললে, কতো দাম ?

বেশি নয়। আসলটা নেব শুধু। অন্যলোকের কাছে নিই দেড় টাকা। তোমরা এক টাকা দিও।

আর কথা নয়। অ্যাম্প্‌ল বার করে সুকুমারের দিকে তাকালেন। সুকুমার উঠোনে দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন, স্যার মনে কিছু করবেন না। বড্ডা গরীব এরা। হেঁ হেঁ। এই এ্যাম্পল্‌টার মুখটা ভাঙুনতো দয়া করে। এ্যাম্পল দেখে সুকুমার অবাক। বিশুদ্ধ ডিস্টিল্ডওয়াটার।

ইনজেকশন দেওয়ার পর বললেন, তোমার তো নানান্ রোগ। পায়খানা হয়নি কদ্দিন তার ঠিক নেই। ওটা পরিষ্কার না হলে জ্বর ছাড়বে না। চারদাগ ওষুধ খেতে হবে। কড়া ওষুধ দিচ্ছি। আজ রাতেই খেতে হবে। খেয়ে শেষ করতে হবে। পকেট থেকে শিশি বার করলেন হরিমোহন দাঁ। এখন ইনজেকশনের টাকাটা দিয়ে দাও তাহলে জাবেদা।

জাবেদা তাকাল দাদার দিকে। সামাদ করুণ সুরে বললে, আপনি উপগারী মানুষ। আট্টু দয়া করুন। দামডা কাল দিয়ে আসবে জাবেদা।

আবার কাল ? ওইতো দোষ। যদি বড় ডাক্তার হত ?

ছাড়ান দ্যান তেনার কথা। আপনি ঘরের নোক। তাই আবদার করি।

খুসীতে হাসতে হাসতে হরিমোহন দাঁ উঠোনে নেমে হঠাৎ যেন সজাগ হলেন। হ্যাঁ, তোমাদের এ উঠোনে কে দাঁড়িয়ে জান ? হেঁ হেঁ। মস্তলোক। হাকিম। বন্দীপুরে রিফিউজীদের কলোনী হচ্ছে না ? তার হাকিম।

মুহূর্তে সামাদের মুখখানা যেন আরও অসহায়, ফ্যাকা[illegible]

উঠল। সম্মান জানাবার জন্যে মাথাটা তুলবার চেষ্টা করল। সামাদের বৌ ঘোমটা বাড়িয়ে দিল মাথার উপর। জাবেদা বিমূঢ়। সুকুমারের সে এক অসহায় অবস্থা।

উঠোনের মাচায় একটা লাউ ঝুলছে। হরিমোহন দাঁ সেদিকে ছুটলেন। এটা নিলাম।

না, না। জাবেদা ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ল। ওটা নিওনা গো। পেথম ফল। দরগাতলায় দিতে হবে। পীরের নামে।

পীর? হরিমোহন দাঁ ঘুরে দাঁড়ালেন। আমরা জ্যান্ত পীর। যমের হাত থেকে মানুষকে টেনে আনি। লাউটা আমার বড্ডা ভাল লাগে। বাঙাল কিনা।

পরে দেব। অনেক কটা। জাবেদা বললে।

এটাই নিলাম। পীরকে পরে দিও। এটায় আমার চোখ পড়েছে। এঁটো হয়েছে। পীরকে আব দেওয়া যাবেনা। বলেই লাউটা ছিঁড়ে নিলেন হরিমোহন দাঁ। জাবেদা তখন ওর খুব কাছে। ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, অত কিপটে কেনেগো? ছেলে নেই। ছেলে হবার বাপও নেই। আবার কি?

কেনে। জাবেদা রুখে উঠল। সে গিয়েচে বলে কি আমার সব গিয়েচে।

হরিমোহন দাঁ বললেন, তবে নিকে কর। জোগাড় করব?

জাবেদা বললে, কেনে, অত দরদ কিসে? আপনি নিকেয় বসবা?

হেঁ হেঁ-হেঁ। হাসতে হাসতে লাউ-বগলে এগিয়ে এলেন হরিমোহন দাঁ। চলুন স্যার! দেখলেনত ওদের দৈন্যদশা। আপনাকে বসতে অবধি দিতে পারল না।

সুকুমারের বিরক্তি আর উত্তেজনা চরমে উঠেছিল ততক্ষণে। তাকে এখানে কেন ডেকে আনা হয়েছে? ইচ্ছে হল পথে নেমেই প্রশ্ন তুলবে এ নিয়ে। কিন্তু তার আগেই হরিমোহন দাঁ আরম্ভ করলেন, স্যার অবাক হয়েছেন খুব, নয়? সুকুমার নীরবে পথ চলতে লাগল। হরিমোহন দাঁ বলে চললেন, জানি। আপনারা শহরের লোক এসব

বোঝেন না। ওই যে জাবেদা—ওকে ভদ্রকথা বলুন, তুষ্ট হবে না। চায়। ছোটলোকের ঘরের মেয়েরা রঙ্গরস খুব ভালবাসে। আর বয়েসও তো কাঁচা। দেহমনের রস মরেনি এখনো।

আরও বিশ্রী লাগছিল সুকুমারের। ইচ্ছে হোল একবার থামিয়ে দেয়। কিন্তু বাক্যালাপ করতেই রুচি হয় না আর। হরিমোহন দাঁ বলে চললেন, আরও একটা জিনিশ। মেয়েদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। ভাগ্যগুণে গুরুদেবের কৃপায় জানতে শিখেছি। আমার বিয়ের কিছু আগে কি যে হোল মনের মধ্যে! সন্ন্যেসী হবার ইচ্ছে হোল খুব। গুরুও জুটল। ভাল গুরু। তাঁর কাছে ধ্যানধারণা, ন্যাস সব শিখলাম। এই দেখুন না ন্যাস ক'রে ক'রে নাকটা কেমন থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছে।

সুকুমার দেখলনা। উনি বলে চললেন, কিন্তু গুরুদেব বললেন, সন্ন্যেসীর শত্রু অনেক। প্রধান শত্রু নারী। কাজেই মেয়েমানুষ দেখলেই বলে দিতে পারি সে কি চায়।

সুকুমার এবার রূঢ়স্বরে বলে উঠল, ইনজেকশন বলে ডিস্টিল্ড-ওয়াটার দেওয়াটা কি? প্রথমটা হরিমোহন দাঁ থতমত খেলেন। পরক্ষণেই হেসে উঠলেন, হেঁ-হেঁ-হেঁ। না হলে যে মুস্কিল। বদনাম হবে চিকিৎসার।

তাই ব'লে ছ-পয়সার এ্যাম্পুল একটাকা দাম?

না হলে ন্যায্যদাম চাইলে যে আমাদের দাম থাকবেনা। বিশ্বাস করবেনা। ছোটলোকের মরণই তো ওই। রোগতো দাস্ত পরিষ্কার না হওয়ার। ম্যাগসালফ দিলাম সেজন্যে। ওতেই কাজ হবে। কিন্তু বিশ্বাস? অত অল্প জিনিশে অমন রোগটা সারে কখনও?

পরিষ্কার ব্যাখ্যা। সুকুমার বলল, কিন্তু আপনারা শিক্ষিত। ওদের ভুল ভাঙান আপনাদেরই কাজ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আপনি ছেলেমানুষ স্যার। রামবাবু ঠিকই বলেছেন।

রামবাবু! সুকুমারের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল অমনি। চম্‌কে উঠে বললে, রামবাবু কি বলেছেন?

উনি বলছিলেন, আমাদের কলোনী অফিসার লেখাপড়া শিখলে কি হবে ? ছেলেমানুষ। সরল। ওঁর মেয়ে খুকুও নাকি তাই বলেছে। খুকু খুব তুষ্ট আপনার ওপর। রামবাবুও বলছিলেন তাই। আমিও দেখছি স্যার। যেমন খুকু বিদ্যায়, গুণে, রূপে, বুদ্ধিতে—আর চিনেছেও ঠিক আপনাকে, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

দুর্বলতা কী নিদারুণভাবে মানুষকে পঙ্গু ক'রে তোলে। ওরা ঠিক পুলটার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে তখন। নীচে বিলের স্থির জল। আকাশে দ্বিতীয়ার চাঁদ। সুকুমার তাকাল হরিমোহন দাঁর মুখের দিকে। ভারী চোয়াল-ওয়ালা মুখ। বিবাট হাঁ-মুখের ফাঁক দিয়ে অ-সম দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কুশ্রী। তবু সুকুমার এক আশ্বাসে ভরে উঠল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আর এই খানিক আগের সমস্ত বিরক্তি আর ধূসরতা মুছে গেল যেন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে।

রাতে খেতে বসে সুকুমার খুকুর দিকে বার বার তাকাল। কথা বলবার, আলাপ করবার তীব্র বাসনা মনে। সুযোগ হল না। পাশে রামবাবু খাচ্ছেন। খেয়ে উঠে সুকুমার ঠাকুরবাড়ীতে ফিরল। মনে অতৃপ্তি। খুকুর কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল আপন মনে। ঠাকুর মন্দিরের উঠোনে গিয়ে চমকে উঠল। কে ?

দুজন পুলিশ সঙ্গে দারোগা এগিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলেন, আপনি কে ? সুকুমার আত্মপরিচয় দিল। দারোগা নমস্কার করে বললেন, আমি এখানকার থানা থেকে আসছি। বড়বাবু। রামবাবুর সঙ্গে একটা দরকার আছে। ব্যক্তিগত।

সুকুমার বলল, বাড়ীতে আছেন। বসুন ডেকে দিচ্ছি। সুকুমারের মনে একটা নতুন আশার সঞ্চার হল। পুকুরপাড় দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

সংবাদ পাওয়ামাত্র রামবাবু ছুটে এলেন। সুকুমারকে বাড়ীতে ফেলে রেখেই। মন্দিরের উঠোনে এসে দারোগাকে বললেন, " কি ব্যাপার স্যার ? দারোগা বললেন, মুস্কিলে পড়েছি মশাই। মহা বিপদ। উদ্ধার করতে হবে। গিন্নী চিঠি দিয়েছে, তার সদ্য বিবাহিত ভাই আর

বৌকে নিয়ে আসছে কলকাতা থেকে। তারা গ্রাম দেখেনি কখনও। তাই এখানেই হানিমুন করবে। কিন্তু মোটা চাল খেতে পারবে না। উপরন্তু দিলে বদনাম হবে। তাই গিন্নী লিখেছে সরুচাল কিছু চাই। দেখুন দিকি—এই কন্‌ট্রোলের যুগে সরু চাল পাই কোথায়? তাই এই রাতেই আপনার কাছে এলাম। জানি দিলে হবেই।

রামবাবু হাসলেন। সিগ্রেট এগিয়ে দিলেন। সিগ্রেটে টান দিয়ে দারোগাবাবু বললেন, আরেকটা জিনিশও লাগবে। চিনি।

চিনি? সেত কন্‌ট্রোলের।

সেই ত। কিছু দরকার। শহরের লোক। চা খাবে বেশি। আবার কুটুম্বলোক—ভালোমন্দ খাবারও খাওয়াতে হবে তৈরী করে। কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে তো—

রামবাবু বললেন, কতটা কি চাই?

চাল মণ দুই। কি দর?

সে ভাবনার দরকার কি? রামবাবু উঠে পড়লেন। দারোগাবাবুও উঠে পায়ের মোজা ঠিক করতে করতে বললেন, এসব আইনের কোন মানে হয় না। যা সাধারণে খায় তাই কন্‌ট্রোল কর। চিনি ক'জনে খায়? এসব যারা খায় তারা দু'পয়সা বেশি দিয়েও কিনতে পারে। কি যে হচ্ছে দিন দিন আপনারাই বলতে পারেন ভাল। নেতা লোক। স্বাধীনতা এনেছেন। কি যে স্বাধীনতা, ইচ্ছে থাকলেও কাজ করবার অধিকার থাকবে না।

রামবাবু যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন। না, মশাই, ওসব আইনের মধ্যে আমি নেই। ইংরেজ আমলেও ওসব দলে ছিলাম না। জানতামও না ওদের। কিন্তু আজ উপায় কি? খেয়েপরে টিকে থাকতে হবে তো। তাই মিশতেই হয়। তাই বলে ওঠো-বোসো যা বলবে তাই মানতে হবে নাকি? ওদের মধ্যে থেকেই আমরা আমাদের মতে চলব। বরং আমাদের মধ্যে টেনে আনব ওদের, কি বলেন? এ্যাঁ? হেঁ-হেঁ বলুন চিনি কতটা লাগবে?

আধমণটেক। ওরা কতদিন থাকবে ঠিক নেই তো। একবার

নিয়ে যাওয়া ভাল এসব হাঙ্গামার জিনিশ।

চাল দেখে দারোগাবাবু মহাখুশী। চিনি পেয়ে আরও। দু'জন কনষ্টেবলকে বস্তা মাথায় তুলে নিতে বললেন।

উহুঁ, রামবাবু বুদ্ধি দিলেন, ওসব জামা খুলে মাথায় জড়াও। চিনিটা চালের মধ্যে ঠুসে নাও ভাল করে। বলা যায়না হিংসুটেরা কে কোথায় আছে। তাও ধরা পড়লে হঠাৎ পুলিশ ব'লে রব উঠবে না। খালাস করার পথ থাকবে।

কৃতজ্ঞ দারোগাবাবু রামবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে এলেন। সাইকেলে ওঠবার আগে কনস্টেবলদের নির্দেশ দিলেন, শ্মশানের ওপর দিয়ে চল। আমি আগে আগে দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

দারোগাবাবুকে বিদায় দিয়ে রামবাবু বেলতলায় উঠে এলেন। সুকুমারের ঘরে আলো জ্বলছে। সেদিকে গিয়ে ডাকলেন। সুকুমার তখনি ফিরেছে খুকুর সঙ্গে দেখা করে। রামবাবুব ডাকে দরজায় উঠে এল। রামবাবু বললেন, উঃ। শালা কি খচ্চর।

কেন?

স্বার্থ। রাতে পুলিশ নিয়ে এসেছে সরু চাল আর কনট্রোলের চিনি আধমণ চুপিচুপি নিতে।

সুকুমার বললে, দিলেন?

না দিয়ে উপায় আছে? বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। নানান কাজের মানুষ আমরা। কখন কি হয়। মন্ত্রী উপমন্ত্রী তো পরে। আগে এরাই। থানার হাকিম।

সুকুমার বললে, দাম দিল তো?

দাম। দাম নয় স্যার। দান। স্রেফ দান করতে হোল। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খায় জানেনতো। যাকে বলে দেনাপাওনা। মাছের চার ফেলার সামিল। কাজে একদিন লাগবেই। বুঝলেন। হেঁ-হেঁ। সুকুমার সে হাসির ধাক্কায় কেমন যেন বোকা হয়ে গেল।

বন্দীপুরে ডাক-পিওন আসে সপ্তাহে দু'দিন। বুধ আর শনিবারে। সেদিন বুধবার। সকালেই পিওন এল। সুকুমার চিঠি পেল।

কৃষ্ণনগর অফিসের চিঠি। ওকে যেতে বলেছে। কাজ বুঝে নিতে। সুকুমার যেন বাঁচল। তক্ষুনি তৈরী হয়ে নিল রওনা হবার জন্যে। বন্দীপুরে আসার পর এই প্রথম বাড়ী যাবে সে। মন বেশ অধীর হয়ে উঠেছে। রামবাবু এসে বাধা দিলেন, কি মশাই, এখন যাবেন? না খেয়ে দেয়েই? অফিস কি পালিয়ে যাচ্ছে?

সুকুমার বললে, না। বাড়ীতে গিয়েই খাব। আর সকাল করেই অফিস যাব।

কিন্তু রান্না হয়ে গেল যে খুকুর?

একটু ইতস্তত করল সুকুমার। না। বাড়ী যাবে, অফিস যাবে, কাজ বুঝে নেবে। নোতুন কাজ। তার তাগিদেই সে পথে বেরিয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত। না খেয়েই।

সুকুমার চলে গেছে শুনে খুকু স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখের ভাত তরকারি খেয়ে গেল না?

রামবাবু বললেন, বললাম তো কত ক'রে। শুনল না। যাক্‌গে। রান্না হয়ে গেছে তোর? তাহলে আমাকে দিয়ে দে। সকাল করেই খেয়ে নিই।

খেয়ে দেয়ে রামবাবু বেরিয়ে গেলেন। অন্যদিন হ'লে খুকু খুব খুশী হত। সেও খেয়ে বিশ্রাম করতে যেত সকাল-সকাল। কিন্তু আজ মন অন্যরকম। ডাল ভাত তরকারি থরে থরে সাজান। তার সামনে বসে আবোল তাবোল ভাবনা।

খুকী—

কাকার গলা। সচকিত হয়ে খুকু উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে এল। কাকা বাইরে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণনগর থেকে ফিরেছে। পিছনে সঙ্গী অরুণ ঘোষ আর তার বৌ দাঁড়িয়ে। এল. সি. মণ্ডল বললেন, দাদা কোথায় রে?

কলোনীতে বোধ হয়। খুকু জবাব দিল।

এল. সি. মণ্ডল এগিয়ে এলেন, তোর রান্না হয়েচে নাকি?

হ্যাঁ।

এল সি. মণ্ডল আস্তে ক'রে বললেন, ভাত তরকারি বেশি আছে? খুকু বললে, হ্যাঁ, তোমার হবে। এল. সি. মণ্ডল অরুণ ঘোষের কাছে এগিয়ে গেলেন। অরুণ, তুই যা ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে রান্না চাপিয়ে দে। ভাতেভাত দুটো। আমরা খাব আর তোর বৌ এখানেই খেয়ে নিক। এস ঘোষানী অন্দরে বসে বিশ্রাম কর একটু।

রান্না ঘরে ঢুকে খুকু কেঁদে ফেলল। অসহায়ের কান্না। বাবাকে দেখছে। কাকাকে দেখছে। কাকীমা বিয়ের কনে এসেছিল। বাপের বাড়ি ফিরে গিয়ে আর আসেনি। আসবে না বলে দিয়েছে। ধনীর শিক্ষিতা মেয়ে ঘটকের খপ্পরে পড়ে নাকি এমন অপাত্রে পড়েছিল। কাকা নাকি মিথ্যে করে বিদ্বান বলে আত্মপরিচয় দিয়েছিল। প্রতারণার অভিযোগে কাকীমা আদালত থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। মা স্বর্গে। কাকীমা চলে গেছেন। এখন তাকে বইতে হচ্ছে এই সব বোঝা। সুকুমারের জন্যে রাঁধা ভাত অরুণ ঘোষের বৌকে এগিয়ে দিতে হল। তার সামনে আর দাঁড়াতে পারল না খুকু। নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

বোশেখ মাস। রোদের তেজ অত্যধিক। কলোনীর মাঠ ধূ ধূ ফাঁকা। গাছপালা বলতে নেই। দুপুরে তাই উদ্বাস্তু পুরুষরা তাঁবুর ছায়ায় এসে বসেছে। সকাল ক'রে খেয়ে দেয়ে রামবাবুও এসে বসেছেন তার মধ্যে। সুকুমার কৃষ্ণনগর গেছে। তারই আলোচনা করতে বসেছে সকলে। সকলেই আশান্বিত। আনন্দ প্রকাশ করছে। একজন বললে, আনন্দ করলেই হয় না। ভেবে করা দরকার। লোনের কথা হচ্ছে। কবে মিলবে ঠিক নেই। বললেই হোল? অন্য একজন বলে উঠল, মাত্র পনের দিনের ডোল নিয়ে এসেছি সব। যবে খুশী লোন দিলেই হোল?

রামবাবু বললেন, না। শিগ্‌গির পেয়ে যাবে লোন।

একজন বললে, সে না হয় পেলাম হাউস্ লোন। তারপর ব্যবসা আর চাষের লোন কবে মিলবে? শুধু হাউস লোন নিয়ে না খেয়ে

ঘরে শুকিয়ে মরব নাকি ?

অন্য একজন বললে, না হয় এল সবকটা লোনই। তাহলেই বা কি হবে ? টাকা পেলেই কি ব্যবসা জমে উঠবে ? না ফসল ফলে যাবে ? ততদিন ?

রামবাবু কথা বললেন এবার। ভয় নেই। আমি যখন তোমাদের এনেছি একটা হিল্লে করে দেবই। হাট বসাবো এখানে। কলোনীর দুধারে দোকান পাট বসে যাবে। আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের লোক কেনাবেচা করতে আসবে। এই কলোনীতেই।

রামবাবুকে ঘিরে আশান্বিত হয়ে উঠল আবার সবাই। আরও আশার কথা, ভরসার কথা শুনতে চায় তারা। কিন্তু রামবাবু চারদিকে একবার তাকালেন। আসরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল নবীন স্বর্ণকার। তাকে প্রশ্ন করলেন, জীবন কোথায় ? মুহূর্তে নবীন সকলের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। মাথা উঁচু করে বললে, তাঁবুতে আছে। রামবাবু উঠে পড়লেন। আসর থেকে বেরিয়ে এলেন। অমনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। গৌরীশংকর তাকাল ব্রজেনের দিকে। হেসে ফেলল। সেই সময়েই সাধুচরণ গেয়ে উঠল।

আগুনের রূপের ফাঁদে
পতঙ্গ পড়ে কাঁদে
তবু এ সর্বনাশা
সবার চেনা এমন নেশা
যায়না খসে, যায়না মুছে হে।

গান শেষ হতেই শ্রীমন্ত আইচ প্রশ্ন করল, ও পদের অর্থ কি ? নবীন আর দাঁড়াতে পারল না সেখানে। সেত বুদ্ধিহীন নয়। খানিক দূর যেতেই মনে হল হাসির ঝড়ে যেন ওলট পালট হয়ে গেল পিছনের আড্ডাটা। অপমানের জ্বালা নিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে ছুটে চলল সে। তার সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার ফলেই যত দুর্ভোগ। জমিদারবাবু প্রথম যেদিন গিয়েছিলেন তাঁবুতে, সেদিন সে স্ত্রীকে বলেছিল, জমিদার রাজা। তাঁর পায়ের ধুলো পাওয়া ভাগ্য। তিনি

এলে সম্মান দেখাতে হবে। যত্ন করতে হবে। আজ বলে দেবে, খবরদার। তাঁবুর বাইরে আসতে হবে না। দরকার নেই ভবিষ্যৎ ভালোর। তাঁবুতে এসে নবীন দেখল, ওর স্ত্রী রামবাবুকে জল দিয়েছে, পান দিয়েছে। জীবন পাশে বসে গল্প করছে। ওকে দেখেই রামবাবু বললেন, এইত এসেছ। ভালই হয়েছে। শোন।

নবীন গম্ভীরভাবে বললে, কি ?

রামবাবু বললেন, বস, শোন। ওদের মধ্যে তো সব কথা বলা যায় না। কদিন থেকেই ভাবছি। তোমরা দু'ভাই। সাবালক। দুজনের পৃথক লোন পেলেই ভাল হয়।

তা কি হবে ? জীবন বললে। রামবাবু বললেন, হওয়াতে হবে। জীবন বললে, তাহলে বেঁচে যাই। দাদারও সুবিধে। আমরাও দু'ভাই দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

রামবাবু বললেন, নিশ্চয়। সুকুমার বাবু ফিরুক। তারপর যা হয় করা যাবে। তবে হ্যাঁ, একথা বলো না কাউকে। পাকিস্থান থেকে সবাই এসেছে বলেই বিশ্বাস করো না। দুনিয়া স্বার্থের। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না।

নবীনের অদ্ভুত ভাল লাগল কথাগুলো। মনের বিক্ষোভ প্রায় জুড়িয়ে গেল। রামবাবু কথা শেষ করে নবীনের স্ত্রীর দিকে তাকালেন, বড্ড গরম। দেখি আর এক গ্লাস জল।

কৃষ্ণনগর থেকে সুকুমার ফিরল দুদিন পরে। সন্ধ্যাবেলায় তখন ঠাকুর মন্দিরের বেলতলায় পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠেছে। রাধারমণ ঘোষ, তুলসী দত্ত আর এল. সি. মণ্ডল আড্ডা জমিয়ে তুলেছে। সুকুমার আসতেই এল. সি. মণ্ডল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, হ্যালো দাদা।

রাধারমণ ঘোষ প্রৌঢ়ত্বের ভঙ্গীতে বললেন, কি মশাই চাকরী করছেন তা হলে ? তুলসী দত্ত বললেন, বাড়ি গিয়ে পাত্তাই নেই। তাও ত ব্যাচেলর। রাধারমণ ঘোষ বললেন, আজকাল আবার

ব্যাচেলর। সবাই হেসে উঠলেন। সুকুমার ক্লান্ত। বললে, দাঁড়ান হাতমুখ ধুয়ে, পোষাক পাল্টে আসি।

কোথায় যাবেন? হাত চেপে ধরলেন এল. সি. মণ্ডল। বসুন। পোষাক পরে ছাড়বেন।

চায়েব কাপ হাতে অরুণ ঘোষ এগিয়ে এল। সুকুমার বললে, কি খবর? তোমাব বৌকে সিনেমা দেখালে? এল. সি. মণ্ডল বলে উঠলেন, শুধু দেখা? সে নিজেও কত সিনেমা করল। আপনাকে সব বলব। সে অনেক কথা। অরুণের দিকে তাকালেন। হাঁরে সুকুমার বাবুর ভাত চাপাবিতো? আমারও দুটো চাল নিস্। এখানেই খাব এক সঙ্গে।

বাত্রে খেতে বসে এল. সি. মণ্ডল অরুণের বৌ-এর আলোচনা তুললেন। মন্দিরেব উঠোন তখন জনশূন্য। বেলতলায় শুধু পেট্রো-ম্যাক্সটা জ্বলছে। এল. সি. মণ্ডল বলতে লাগলেন, কেমন করে গ্রাম্য বধূব লজ্জা ভাঙল, সে আধুনিকা হয়ে উঠল। বলতে বলতে বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট থেকে একগোছা ফটো বার করে ধবলেন সুকুমারেব সামনে। সেদিনেব সেই সিনেমা পত্রিকার প্রচ্ছদের ওপবের ছবির মতই সব ছবি। এল. সি. মণ্ডল সগর্বে প্রশ্ন করলেন, কেমন হয়েছে বলুন?

সুকুমাব মুখ ঘুবিয়ে নিল। রুচিতে বাধে। ছবি দেখে তবু মনে হয়, অরুণ ঘোষের স্ত্রীব আড়ষ্টতা ঘোচেনি। বরং কিছু অসহায়তা, ভয়মিশ্রিত ম্লানিমা ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। অর্থাৎ তার স্বভাববিরুদ্ধ কিছু করা হয়েছে যেন। এই অসঙ্গতি আর অসামঞ্জস্যের নামই কুশ্রীতা। অরুণ ঘোষের স্ত্রীর ফটোয় তাই প্রকাশ পেয়েছে তালভঙ্গের রূপ। যেন সুসম ছন্দ কোন আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে সর্বাঙ্গে সৃষ্টি করেছে এক চরম বিশৃঙ্খলা। এল. সি. মণ্ডলের এই নিয়েই গর্ব। বললেন, ফটোয় আর কি উঠেছে? কেশনগরে দিন যা কেটেছে! উগ্র লালসার উল্লাসে মুখখানাআচ্ছন্ন হয়ে উঠল ওঁর। সুকুমার অরুণ ঘোষের দিকে তাকিয়ে দেখল, ও যেন লজ্জায় মিশেযাচ্ছে। অতবড় জোয়ান, পেশীবহুল মানুষটা কেমন কাতর হয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অরুণ ঘোষ।

খেয়ে উঠে এল. সি. মণ্ডল সুকুমারকে চাপ দিলেন, চলুন, আমার ঘরে শোবেন আজ রাতে। সুকুমার অবাক হল। এল. সি. মণ্ডল বললেন, কোন অসুবিধা হবে না। খাট বিছানা—ঢালা ব্যবস্থা। পাশাপাশি শুয়ে সব কথা বলা যাবে। অরুণের বৌ-এর কারবারের কথা।

সুকুমারের ঘৃণা হল। হাত জোড় করে বললে, বড্ড ক্লান্ত। খুব ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম! এল. সি. মণ্ডল হেসে উঠলেন। এখনো ব্যাচেলর, অথচ রসের গল্প শুনে ঘুম আসবে? হুঁ—একেবারে বে-রসিক।

সুকুমার প্রতিবাদ না করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। অসহ্য এই সঙ্গ। কাল থেকে কাজের মধ্যে ডুবে যাবে বলে ঠিক করল মনে মনে। পরদিন সকালে উঠেই কলোনীতে বলে এল সকলকে দুপুরে মন্দিরে আসতে।

ছেঁড়া টায়ারের ওপর ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সাইকেল চেপে দুপুরবেলা হাজির হল হাবুল কর্মকার। মন্দিরতলার বেল গাছে হেলান দিয়ে রাখল সাইকেলখানা। হ্যাণ্ডেলে বাঁধা চটের থলিটা হাতে নিয়ে সে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ছায়াশীতল বারান্দা। সেখানে বসে হাফসার্টের পকেট থেকে চশমা বার করে নাকে লাগাল। সুকুমার বললে, একটু বসুন। কলোনীতে ওদের ডাকতে পাঠাই।

হাবুল কর্মকার বললে, না স্যার। তার আর দরকার হবে না। আমি ডেকে এসেছি। সব এল বলে। আপনি ততক্ষণে ওদের ফ্যামিলি লিষ্টটা বার করুন।

খানিক পরেই উদ্বাস্তরা এল। কাজ আরম্ভ হল। হাবুল কর্মকার বললে, দশ কাঠা করে সব জমি পাবে, এইত? ঠিক আছে। বিলের ধার ঘেঁষে সব দিয়ে দেব নমঃদের। আর জেলে ক'ঘরকে। আর মাঠের ধারটায় চাষীদের দেব। বিজনেস লোন যারা নেবে তারা থাকবে মধ্যে। মানে মধ্যেখানে দোকান পসার জমবে ভাল। পরিকল্পনা শুনে উদ্বাস্তরা খুব খুশী। চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা জীবন্ত পরিবেশ। তারা বলে উঠল, বেশ, বেশ। বেশ হবে।

অমনি টিকি নেড়ে হাবুল কর্মকার বললে, তা হবেনা গো। বকশিস চাই। সকলে হেসে উঠল। সাধুচরণ বললে, আমরাই ত আপনার বকশিস। এতগুলো মানুষ আপনাদের ঘরের মানুষ হচ্ছে। চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে হাবুল কর্মকার জবাব দিল, ওসব চলবেনা। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। শ্রীমন্ত আইচ শেষ জবাব দিল, আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। কাঙাল ছিলাম না। নজর খাটো ছিল না। এখানেও বসে নিই আগে।

হাবুল কর্মকার হাসতে হাসতে কাজ আরম্ভ করল। জমির আমলনামা লেখা কাজ।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিশোর বালক গোপীনাথ আর তার মা মিলে একটা পরিবার। গোপীনাথের মা প্রৌঢ়া মহিলা। ভদ্র শান্ত। কাশীতে নাকি বাপের বাড়ি ছিল। ইংরেজী স্কুলেও পড়েছিলেন উঁচু ক্লাশ অবধি। তিনি বললেন, আমাদের জমিটা কলোনীর মাঝামাঝি দেখে দেবেন। নবীনরা দেশের লোক। ওদের পাশাপাশি থাকতে চাই।

বেশ। জমির ম্যাপ পাশে রেখে দ্রুত কলম চালাতে লাগল হাবুল কর্মকার। তারপর যখন মাথার ওপর থেকে সূর্য গিয়ে হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে, বারান্দার আলো আবছা হয়ে উঠল, তখন কলম ছাড়ল হাবুল কর্মকার। চোখ থেকে চশমা খুলে বললে, আজ থাক। আবার কাল।

কাজের নেশা মানুষকে মাতিয়ে দেয় সহজেই। সেদিন কাজের শেষে সুকুমারের নিজেকে এক নতুন মানুষ মনে হল। খুশীর নেশায় মনে গান এসে গেল। গুন গুন করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ঘোষ ডাকল, হুজুর। সুকুমার বেরিয়ে আসতে, সে বললে, দিদিমণি ডেকেচে আপনাকে। দুপুরেই ডাকছিল। কাজ করছিলেন বলে আর ডাকিনি। সন্দেবেলা যেতে বলেচে। অরুণ ঘোষ চলে গেল। সুকুমার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে গান করতে লাগল। খুকু ডেকেছে। হাসি পেল।

সারা দুপুর কাজ করেছে সে জামা গায়ে দিয়ে। গরমে ঘামে জবজবে হয়েছে সব। সেসব ছেড়ে সাবান গামছা নিয়ে পাশের পুকুরে নেমে গেল। পুকুরের জলও গরম। তবুতো জল জল থেকে উঠে দাঁড়ালেই আরাম লাগে। অনেকক্ষণ ধরে ওঠানামা করল। যখন তালগাছে বাবুইগুলো বাসায় আশ্রয় নিল, বাদুড়গুলো উড়ে যেতে লাগল পুব থেকে পশ্চিমের বাঁশঝাড়ের দিকে, আর ঠাকুবমন্দিরে ছোকরা পুরোহিত ঘণ্টা বাজাল মন্দিরেব, তখন সুকুমার উঠে এল।

রামবাবুর বাড়ি। পুরনো জমিদার বাড়িব বিকৃত অবস্থা। সর্বত্র ভয়াবহ অন্ধকারের বাসা। চামচিকেব আশ্রয়। কয়েকদিনের যাতায়াতে সুকুমার অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই সহজভাবেই বাড়ির মধ্যে এগিয়ে যেতে পারল সে। বাড়ির মধ্যে উঠোনে আলো জ্বলছেনা। খুকুর শোবাব ঘবে আলো জ্বলছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সুকুমার কাশল। আলো হাতে খুকু বেরিয়ে এল। এসেছেন? আসুন। সুকুমাব ওপবে উঠে এল। তাকে খাটের ওপরে বসাল খুকু। তারপর কি করবে? দু'পক্ষই নীরব। দুঃসহ স্তব্ধতা। শেষে সুকুমারই বললে, সেদিন হঠাৎ চলে গেলাম।

হ্যাঁ। খুকুর গলা ভারী শোনাল। মুখের ভাত খেয়ে যাবারও সময় হলনা?

সুকুমার সলজ্জভঙ্গীতে বললে, হ্যাঁ, কাজটা একটু অন্যায়ই হয়েছে।

থাক। খুকু থামিয়ে দিল। সুকুমার খুকুর মুখের দিকে তাকাল।

খুকু দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। গম্ভীর ভঙ্গী। কিন্তু সুকুমার মুগ্ধ হয়ে গেল। খুকুর আজ কী অপূর্ব রূপ হয়েছে। একটা ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ী, ওই রঙেরই ব্লাউজ। হাতে কয়েকগাছা চুড়ি। খোঁপায় জড়ান বকুলমালা। টেবিলে বসান লণ্ঠনের মৃদু আলোর সামনে টেবিলে হাত দিয়ে খুকু।

সুকুমার শহরের ছেলে। অনেক মেয়ে দেখেছে সে। নানা রঙের, নানা ঢঙের। শিক্ষিতা, প্রগল্‌ভা, ব্যক্তিত্ববিশিষ্টা কিংবা

অমনি টিকি নেড়ে হাবুল কর্মকার বললে, তা হবেনা গো। বকশিস চাই। সকলে হেসে উঠল। সাধুচরণ বললে, আমরাই ত আপনার বকশিস। এতগুলো মানুষ আপনাদের ঘরের মানুষ হচ্ছে। চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টি ফেলে হাবুল কর্মকার জবাব দিল, ওসব চলবেনা। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না।

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। শ্রীমন্ত আইচ শেষ জবাব দিল, আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ। কাঙাল ছিলাম না। নজর খাটো ছিল না। এখানেও বসে নিই আগে।

হাবুল কর্মকার হাসতে হাসতে কাজ আরম্ভ করল। জমির আমলনামা লেখা কাজ।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে কিশোর বালক গোপীনাথ আর তার মা মিলে একটা পরিবাব। গোপীনাথের মা প্রৌঢ়া মহিলা। ভদ্র শান্ত। কাশীতে নাকি বাপের বাড়ি ছিল। ইংরেজী স্কুলেও পড়েছিলেন উঁচু ক্লাশ অবধি। তিনি বললেন, আমাদের জমিটা কলোনীর মাঝামাঝি দেখে দেবেন। নবীনরা দেশের লোক। ওদের পাশাপাশি থাকতে চাই।

বেশ। জমির ম্যাপ পাশে রেখে দ্রুত কলম চালাতে লাগল হাবুল কর্মকার। তারপর যখন মাথার ওপর থেকে সূর্য গিয়ে হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে, বারান্দার আলো আবছা হয়ে উঠল, তখন কলম ছাড়ল হাবুল কর্মকার। চোখ থেকে চশমা খুলে বললে, আজ থাক। আবার কাল।

কাজের নেশা মানুষকে মাতিয়ে দেয় সহজেই। সেদিন কাজের শেষে সুকুমারের নিজেকে এক নতুন মানুষ মনে হল। খুশীর নেশায় মনে গান এসে গেল। গুন গুন করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ঘোষ ডাকল, হুজুর। সুকুমার বেরিয়ে আসতে, সে বললে, দিদিমণি ডেকেচে আপনাকে। দুপুরেই ডাকছিল। কাজ করছিলেন বলে আর ডাকিনি। সন্দেবেলা যেতে বলেচে। অরুণ ঘোষ চলে গেল। সুকুমার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে গান করতে লাগল। খুকু ডেকেছে। হাসি পেল।

সারা দুপুর কাজ করেছে সে জামা গায়ে দিয়ে। গরমে ঘামে জবজবে হয়েছে সব। সেসব ছেড়ে সাবান গামছা নিয়ে পাশের পুকুরে নেমে গেল। পুকুরের জলও গরম। তবুতো জল জল থেকে উঠে দাঁড়ালেই আরাম লাগে। অনেকক্ষণ ধরে ওঠানামা করল। যখন তালগাছে বাবুইগুলো বাসায় আশ্রয় নিল, বাদুড়গুলো উড়ে যেতে লাগল পুব থেকে পশ্চিমের বাঁশঝাড়ের দিকে, আর ঠাকুরমন্দিরে ছোকরা পুরোহিত ঘণ্টা বাজাল মন্দিরের, তখন সুকুমার উঠে এল।

রামবাবুর বাড়ি। পুরনো জমিদার বাড়ির বিকৃত অবস্থা। সর্বত্র ভয়াবহ অন্ধকারের বাসা। চামচিকের আশ্রয়। কয়েকদিনের যাতায়াতে সুকুমার অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই সহজভাবেই বাড়ির মধ্যে এগিয়ে যেতে পারল সে। বাড়ির মধ্যে উঠোনে আলো জ্বলছেনা। খুকুর শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সুকুমার কাশল। আলো হাতে খুকু বেরিয়ে এল। এসেছেন? আসুন। সুকুমার ওপরে উঠে এল। তাকে খাটের ওপরে বসাল খুকু। তারপর কি করবে? দু'পক্ষই নীরব। দুঃসহ স্তব্ধতা। শেষে সুকুমারই বললে, সেদিন হঠাৎ চলে গেলাম।

হ্যাঁ। খুকুর গলা ভারী শোনাল। মুখের ভাত খেয়ে যাবারও সময় হলনা?

সুকুমার সলজ্জভঙ্গীতে বললে, হ্যাঁ, কাজটা একটু অন্যায়ই হয়েছে।

থাক। খুকু থামিয়ে দিল। সুকুমার খুকুর মুখের দিকে তাকাল।

খুকু দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। গম্ভীর ভঙ্গী। কিন্তু সুকুমার মুগ্ধ হয়ে গেল। খুকুর আজ কী অপূর্ব রূপ হয়েছে। একটা ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ী, ওই রঙেরই ব্লাউজ। হাতে কয়েকগাছা চুড়ি। খোঁপায় জড়ান বকুলমালা। টেবিলে বসান লণ্ঠনের মৃদু আলোর সামনে টেবিলে হাত দিয়ে খুকু।

সুকুমার শহরের ছেলে। অনেক মেয়ে দেখেছে সে। নানা রঙের, নানা ঢঙের। শিক্ষিতা, প্রগল্‌ভা, ব্যক্তিত্ববিশিষ্টা কিংবা

ব্রীড়াবনতা। কিন্তু এমন? না। হয়ত তেমন সুযোগ মেলেনি দেখাব। নয়ত কেউ ছিলনা এমন। কিন্তু কেন খুকু আজ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? কেমন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগল সুকুমার ক্রমেই। বকুলেব সৌরভ যেন তার সত্তা হাবিয়ে মিলে মিশে গেছে খুকুর চুলের গন্ধ, রূপের গন্ধ আর তার সত্তার গন্ধর সঙ্গে। সুকুমার বিহ্বলের মত বলে উঠল, আপনি রাগ করেছেন? খুকু কথা বল্‌ল না। ঘুরে দাঁড়াল। পরক্ষণেই দবজার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। খুকু চলে যাচ্ছে? রাগ কবে? অভিমানে? মুহূর্তে সুকুমারের দেহ-মনে ঝড় উঠল। উন্মাদেব মত ছুটে গেল। বিশাল, পরুষ বাহুদ্বয় দিয়ে বেষ্টন করে ফেল্‌ল খুকুকে। খুকু শিউরে উঠল। ওর চোখের পাতায়—যেন পদ্মপাতায় উছলে উঠল কাঁনায় কানায় ভরা হৃদয়-জলের ঢেউ। সুকুমারের বাহুতে খুকু। কি করবে সে এখন? খুকুর ডানহাতখানা চেপে ধর্‌ল। নিজের মুখখানা নামিয়ে আনল। তারপর কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে।

দিদিমণি—। খুকু চমকে উঠল। সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রাণপণ ধাক্কায় সুকুমারকে ঠেলে, ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তখনও সুকুমারের পা দুখানা যেন চলতে শেখেনি ঠিক মত। এক গ্লাস জল পেলে ভাল হত। কে দেবে? সুকুমার টলতে টলতে বেরিয়ে এল। উঠোনে নামতেই প্রশ্ন হল, কে?

চেনা গলা। বুড়ী ঝির। কানে কম শোনে। চোখে কম দেখে। তবু সুকুমার চমকাল।

কে গো তুমি? বুড়ী ঝি আবার প্রশ্ন করল। সুকুমার ছুটতে আরম্ভ করল। দৌড়।

ঠাকুর বাড়ির উঠোনে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার নীচে শুধু দুভাই বসে। রামবাবু আর এল. সি. মণ্ডল। ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। কারণ সমস্ত ব্যবসারই মূলধন এল. সি. মণ্ডলের। বোশেখ মাস শেষ হব হব। আষাঢ়ের প্রথমেই বর্ষা নামবে।

কেঁপে উঠবে সব নদীনালা খালবিল। কাঁচা মেঠো পথ কাদায় দুর্গম হবে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হবে। শহরের সুযোগ সুবিধার যোগ ছিন্ন হবে এ-অঞ্চলের। অন্ততঃ দশখানা গাঁয়ের। প্রকিওরমেণ্টের যুগে ধানচাল কারো ঘরেই থাকে না। ফলে আকাল নামে। তখনই মজুতদারের বাঁধাই চালের মরশুম। প্রত্যেকবারেই ওই কারবার করেন রামবাবুরা। এবারে আরও বেশি করে করতে হবে। এবার উদ্বাস্তু এসেছে। খদ্দের বেশি হবে। কাজেই এখনও বেলডাঙার দর সতের আঠার টাকা। এখনই মজুত করে ফেলা ভাল। এই আলোচনা হচ্ছিল দুই ভাইয়ে। সুকুমার ওদের পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে চলে যাচ্ছিল। রামবাবু দেখে ফেলে প্রশ্ন করলেন, কে?

সুকুমারের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। দাঁড়িয়ে গেল। রামবাবু বললেন, কোথায় ছিলেন? খুঁজে পাচ্ছিনে। সুকুমারের বুকটা কেঁপে উঠল তবু জোর করে হাসবার চেষ্টা করল। রামবাবু আলোচনা ছেড়ে উঠে পড়লেন। চলুন, আপনার ঘরে। কথা আছে। সুকুমারের পা দুটো কাঁপতে লাগল চলতে গিয়ে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। রামবাবুকে বসতেও বলতে পারল না। রামবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, কোথায় সব? এস।

যাই। নবীন আর জীবন এসে সামনে দাঁড়াল। রামবাবু বললেন, এদের সম্বন্ধে কথা আছে। এরা দু'ভাই এক ফ্যামিলি। এদের পৃথক লোন করে দিতে হবে।

সুকুমার বললে, সেতো হবে না। প্রথমতঃ ছোট ভাই অবিবাহিত, দ্বিতীয়তঃ পৃথক করার অধিকার আমার নেই। পারেত, এক ধুবুলিয়ার সুপারিন্টেনডেণ্ট পারবেন। কারণ তিনিই ফ্যামিলি পাঠিয়েছেন।

তাহলে? চিন্তিত রামবাবু নবীনদের দিকে তাকালেন। তিনি জমিদার। বে-সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। গ্রামে উদ্বাস্তু বসাচ্ছেন। তাঁর দ্বারা এ-কাজটা হবে না? খানিক গুম হয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে। আপনি স্যার তা'হলে ধুবুলিয়াতেই একখানা চিঠি দিয়ে দিন। এরা নিয়ে যাক।

চিঠি কাকে দেবে? সুকুমার বললে, চিঠি দিয়ে কি হবে? হলে এমনিতেই হবে।

রামবাবু বললেন, না, না। চিঠি দিতেই হবে। জ্ঞাতগোত্রের কথায় মানুষের মন অনেক নরম হয়। দিন স্যার, লিখে দিন একখানা, দু'খোঁচা দিয়ে।

চিঠি না দিলে রামবাবু নড়বেন না। অথচ সুকুমার তখনো প্রকৃতিস্থ নয়। তখনো তার হাত পা কাঁপছে। রামবাবু সামনে থেকে চলে গেলে স্বস্তি পায়। অগত্যা খুকুর বাবাকে তুষ্ট করতে একখানা চিঠি লিখে দিল সুকুমার। অর্থহীন, অবান্তর চিঠি।

পরদিন দুপুর বেলা রামবাবু আবার এক আব্দার নিয়ে হাজির হলেন। সুকুমার তখন অনেক সুস্থ। রামবাবু বললেন, স্যার, কি হয়েছে বলুনত? হেবলোর কাছে শুনলাম—আপনি অফিসার হয়ে কেরানীর কাজ করে দিতে চেয়েছেন? সুকুমার জবাব দিল না। হাবুল কর্মকার আমলনামা লিখে, লোনবণ্ড পূরণ করতে লেগেছে। তারজন্যে উদ্বাস্তুদের কাছে লেখাই খরচ চাই বণ্ডপিছু এক টাকা করে। উদ্বাস্তুরা আপত্তি তুলেছে। সামান্য লোন পাবে। তাই নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। তার থেকে আবার এখনই এক টাকা বাদ দিতে হবে! হাবুল কর্মকার গালাগাল দিয়েছে ফাঁকিবাজ, জোচ্চোর সব। বুকে বসে দাড়ি উপড়ে খাবে। মজুরী দেবে না, পাওনা দেবে না? দেখে নেব। বাস করতে বস এখানে। তারপর।

এ সব শুনে সুকুমার লোন ফরমগুলি কেড়ে নিয়েছে। সে নিজে লিখে দেবে বলেছে। ফলে হাবুল কর্মকার রেগে মন্দিরের বারান্দা থেকে উঠে চলে গেছে। তারই খানিক পরে রামবাবু ছুটে এসেছেন। সুকুমার নীরব। রামবাবু বললেন, স্যার, ওগুলো হেবলোই করুক। পায় কিছু পাক না। উদ্বাস্তুরা এদেশে এসেছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করবে না? লেনদেন হবে না? উভয়ে উভয়ের বলে বাঁচবে, ভবেত। হেবলোকে দু'পয়সা দিলে জলে পড়বে না। এ-দিগরের সবচেয়ে করিতকর্মা লোক। বিপদে আপদে বুক দিয়ে

করবে। একে বঞ্চিত করবেন না।

সুকুমার বললে, কিন্তু ওরা এখন টাকা কোথায় পাবে? আর লোনের টাকাই বা কি এমন পাবে? এমনি করে এক একটা টাকা যদি চলে যায়—

যাক। যাক। টাকা আসে আবার যায়। লখ্‌খী চঞ্চলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থাকলে তার মার নেই। উপদেশ শেষ করেই রামবাবু সুকুমারের ঘর থেকে লোন ফরমগুলো বার করে আনলেন। হেঁ-হেঁ। কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। কালকেই লেখা হয়ে যাবে সব। খুব হাত চালাতে পারে ও। ওস্তাদ লোক। যাই দিইগে। হেঁ হেঁ।

রামবাবুর আচরণগুলো ঠিক যেন মেনে নেওয়া যায় না মনে প্রাণে। এই চিন্তাটা সন্ধ্যাবেলা বেলতলায় বসে সুকুমারের বিশেষ করে মনে হতে লাগল। সেই সঙ্গে আরও প্রশ্ন। পাশের এই রাধারমণ ঘোষ, তুলসী দত্ত—এঁরা প্রাচীন অভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী—কী নিবিড় ভাবে মিশতে পারেন রামবাবুর সঙ্গে। রামবাবুকে খুশীর সঙ্গে মান্য করেন। রামবাবুর মতামত মত কাজ করেন। অথচ সে পারে না কেন? একি তার অনভিজ্ঞতার কারণ? সে কী ভ্রান্ত?

রাধারমণ ঘোষ বললেন, জানেন রামবাবু, আজ হট্টগ্রামে গিয়েছিলাম।

তাই নাকি? রামবাবু উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তুলসী দত্ত বললেন, আপনার কথা শুনেই কাজ হয়েছে। বেটারা প্রচুর ধান লুকিয়েছিল। আর দিন কতক হলেই যেত। শুধু ঠেকিয়ে দিয়েছে ওগাঁয়ের রেশানের দোকানদার অমূল্য পাল। সে বললে, আমি রামবাবুর দলের লোক। কাউকে ভয় করিনে। দরকার হলে আপন বাপমাকেও ছেড়ে কথা বলব না।

রামাবাবুর শিড়দাঁড়া খাড়া হয়ে উঠল। বললেন, তাহলে কাজ হচ্ছে কিছু। স্বাধীন দেশের সরকারের কর্মচারীদের এমনি কাজই দরকার।

বলুন, বলুন। তুলসী দত্ত বলে উঠলেন, আপনার মুখ দিয়েই বার হোক কথাটা। আপনারা নেতা। দশের প্রতিনিধি। আপনারাই ভরসা।

হেঁ-হেঁ। স্পষ্ট করে হেসে উঠলেন রামবাবু। অরুণ ঘোষ চা দিয়ে গেল। সবাই সিগ্রেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে রামবাবু বললেন ওদের কি হল? উষাগ্রামের যতীন বিশ্বাস আর হজরদ্দি সেখের?

ওঃ। তুলসী দত্ত বললেন, ওরাতো কথা শুনল না। ধান নেই বলেছে। ফের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তাও ধান নিয়ে এল না। কাল যাব ওখানে ট্রাক আর গার্ড নিয়ে।

হ্যাঁ। শালাদের জব্দ করা দরকার। ধান আদায় নয়, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, বাবারও বাবা আছে। এরপর রামবাবু তাকালেন সুকুমারের দিকে। সুকুমার কলোনী গড়তে এসেছে। মানুষের সংসার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা তার কাজ। সহানুভূতি আর ভালবাসা নিয়ে তার কাজ। সে অবাক হয়ে শুনছিল এই সব আলাপ আলোচনা। রামবাবু বললেন, কাল সুকুমারবাবুকেও আপনাদের সঙ্গে নেবেন। একবার দেখিয়ে আনবেন আমরা কোথায় আছি।

তুলসী দত্ত লাফিয়ে উঠলেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল ধরে নিয়ে যাবই। লোকসান হবে না। পুষিয়ে দেব। ডবল, তিন ডবল ডিমের ওমলেট। মুরগী, হাঁস—আরও কতরকম কি—

পরদিন ট্রাক এল। আর্মড পুলিশ এল। ঠাকুরবাড়ির সামনে মন্দিরের পুকুরে জাল ফেলে অরুণ ঘোষ একটা বোয়ালের বাচ্চা পেয়েছিল। তাই রেঁধেছিল পেঁয়াজ দিয়ে বেশ মজিয়ে। সেই সঙ্গে মুশুরির ডাল আর আলুভাতে। খেয়ে দেয়ে ওরা সবাই হৈ হৈ করে ট্রাকে গিয়ে উঠল। সুকুমার গেল না। তুলসী দত্ত পীড়াপিড়ী করলেন খুব। সুকুমার বললে, কলোনীতে আমারও অনেক কাজ আছে। কাজ করতেইত এসেছি আমরা সবাই।

রাধারমণ ঘোষ বললেন, এখন থেকেই অফিসারী চাল শিখে ফেললেন ভায়া!

কথাটা অনেক পরিমাণ সত্যি। সুকুমারের কাজ তেমন ছিল না। অজুহাত দিয়েছিল কাজের। সুকুমার দাঁড়িয়ে দেখল। ট্রাক চলে গেল। নিবিড় নির্জনতা চারিদিকে। গ্রাম-জীবনের আর কোন গতি নেই যেন।

বিজ্ঞানের ক্রূরতা নেই প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁশের পাতাগুলো হাওয়ায় ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে নেমে আসছে। ঝোপের অন্ধকারে একটা হাঁড়িচাঁচা বসে আছে চুপ করে। এই স্তব্ধতার মধ্যে স্মৃতিরোমন্থনে মন যায়। কান্না পায়। হারিয়ে যাওয়া বর্ত্তমান মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে চায়। তবু তাকে ছোঁয়া যায় না। মন না-পাওয়ার বেদনায় গুমরে ওঠে। এ বেদনা দুঃসহ। খুকুর কাছে যেতে পারল না সংকোচে। কলোনীতে ছুটল। ফাঁকা মাঠে দারুণ গরম। তাঁবুতে থাকা যায় না। তাই পাশের আম কিংবা কাঁঠাল তলায় এসে বসেছে উদ্বাস্তুরা। সুকুমারের কথা ছিল আমলনামা অনুযায়ী জমিগুলো মাপবে। এই দুপুরে তা সম্ভব নয়। উদাস হাওয়া বইছে দুপুরে। মনকে আনমনা করে তুলছে। জীবনকে যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যের পানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। কেউ কারো নয়। অনাদি কাল থেকে মানুষ চলেছে। সংসার চলেছে। কত সম্পর্ক, সুখদুঃখ বন্ধন দুর্বলতা—না, কেউ কাবো নয়। কে কতদূর চলতে পারে সেই তার পরিচয়। সুকুমার ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিলের ধারে, গাছতলায়, তপ্তধূসর ধূলোর মধ্যে। শেষপর্যন্ত ছুটে এল আবার ঠাকুরমন্দিরে। না। এখানেও নয়। অন্য কোথা—আর কোনখানে। রামবাবুর অন্দর মহলেব দিকেই ছুটে চলল। শূন্য, খাঁ খাঁ বাড়িতে খুকু একা। ঘরে বসেছিল। উঠোনে ঘুঘু ডাকছে। ঘরের পিছনে বকুল গাছের ডালেডালে অজস্র ফুল। সেখানে মৌমাছিদের অশ্রান্ত গুঞ্জন। তারা পাখা কাঁপিয়ে যেই ফুলে বসতে যাচ্ছে, অমনি টুপ করে ফুল খসে পড়ছে। ব্যর্থ মৌমাছি আবার উড়ছে। অন্য ফুলে যাচ্ছে। মধু চাই মধুকরের। খুকু তন্ময় হয়ে দেখছিল। আর ভাবছিল। কত অজানা, অচেনা শিহরণ। তার কি এক বেদনার দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মাঝে মাঝে বাইরের দমকা হাওয়ায় চমকে উঠে ভাবে কার বুঝি পদধ্বনি। তেমনি একবার চমকে উঠেই তাকিয়ে দেখল, সুকুমারকে। চোখকে বিশ্বাস হয় না।

সুকুমার খুকুর দরজায় থমকে দাঁড়াল। উদাস দুপুরের বৈরাগ্যের মায়ায় আচ্ছন্ন তার মন। কেন এসেছে সে? খুকু অবাক দৃষ্টিতে

তাকিয়েছিল ওর দিকে। খুকুর চোখের দিকে তাকিয়ে সুকুমার চমকে উঠল। যেন খুকুর চোখের দৃষ্টিতে ছায়া পড়েছে বিরহীনি গোপার, বিষ্ণুপ্রিয়ার। সিদ্ধার্থ, নিমাই কেউ ফেরেনি। সুকুমার পিছন ফিরল। রামবাবুর অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে। আবার কলোনীর দিকে ছুটল

সুকুমার কলোনী থেকে ঠাকুরমন্দিরে ফিরছিল সন্ধ্যাবেলায়। পথে ভূপালবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। উদাত্তভাবে হাসতে পারেন ভদ্রলোক। হেসে বললেন, কই আরত গেলেন না আমার বাড়িতে? সুকুমার লজ্জিত হ'ল। বললে, কাজের চাপ পড়েছে। যাব একদিন। ভূপালবাবু হাসলেন। সুকুমারের সঙ্গেই মন্দিরে এলেন। বললেন, পুরুতটার অসুখ হয়েছে শুনলাম। ও আবার আমার ঔষধ ছাড়া এ্যালোপ্যাথি খায়না। দেখে আসি একবার। আপনি ততক্ষণ জামাকাপড় ছাড়ুন। এসে গল্প করা যাবে। ভূপালবাবু পুরুতের বাড়িতে ঢোকার পরেই মোটরইঞ্জিনের শব্দ হল। সুকুমারের আর জামা ছাড়া হলনা। সকালে যাওয়া সেই ট্রাকটা এসে থামল। পুলিশ কজনা নামল আগে। তারপর আরদালি, পিয়ন। সবশেষে ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে এলেন রাধারমণ ঘোষ আর তুলসী দত্ত। উঠোনে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুলসী দত্ত আবেগে বলে উঠলেন থ্রি চিয়ারস্ ফর— কেউ পাদ পূরণ করল না। তার লক্ষণও দেখা গেল না। সবাই জোট পায়ে এগিয়ে আসছে বেলতলার দিকে। তুলসী দত্ত নিজেই বলে উঠলেন, হিপ্ হিপ্ হুররে। পুলিশরা পিঠে রাইফেল নিয়ে হাসছে। রাধারমণ ঘোষ ঘুরে বললেন, নামাও সব ট্রাক থেকে।

তুলসী দত্ত সুকুমারের কাছে ছুটে গেলেন। গেলেননাত মশাই —দেখতে পেতেন সব কাণ্ড। ঘুরে হাঁকলেন, দয়াল, ওগুলো নিয়ে আয়ত। দয়াল পিয়ন। নেমে এল ট্রাক থেকে। বেলতলায় এনে ছড়িয়ে দিল পায়ে পায়ে বাঁধা একপাল মুরগী। চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল ওগুলো। তুলসী দত্ত বললেন, আরও আছে ভাই। দয়াল টেবিলে একটা ছোট থলি নামিয়ে দিল। খুলতেই বেরুল সার সার মুরগীর ডিম। তুলসী দত্ত হেসে বললেন, কি চাকরী করেন ভাই, দেখুন

আমাদের চাকরীর মাহাত্ম্য। কত প্রণামী। আমরা ঠাকুর দেবতার কাছে ভোগ দিই জানেনত? কেন? তুষ্ট করতে। এও তাই।

সুকুমার এবার বললে, কেন ধান দেয়নি?

ধান দেবেনা মানে? তাহলে কি মুরগী ডিম আসত শুধু? বেটাদেরও বেঁধে আনতাম।

রামবাবু কোথায় ছিলেন। ঝড়ের বেগে এসে হাজির হলেন। কি হল সব?

ক্লান্ত রাধারমণ ঘোষ ধুঁকছিলেন। খাড়া হয়ে বসলেন। হয়েছে আজ। লড়াই, যাকে বলে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। শালারা আজ জব্দ।

হ্যাঁ। তুলসী দত্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে কাহিনী আরম্ভ করলেন। আজ মহাকাণ্ড। গাঁয়ে ট্রাক ঢুকতেই, রাস্তার ইঁদারায় জল নিচ্ছিল যেসব মেয়েরা দে চম্পট। উঃ সে-কী দৌড়। কাপড়চোপড় খুলে একাকার। বুকের কাপড় জড়িয়ে ধরে দৌড়-দৌড়। উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে রামবাবু মন্তব্য করলেন, চাষার মরণ। তুলসী দত্ত বিবৃত করে চললেন, হজরদ্দি, যতীন কেউ বাড়ী ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা আড়ষ্ট। ভেতরে সে কী মরা কান্না।

ঢঙ্। রামবাবু বলে উঠলেন, ওসব ঢঙ্। মিনসেদের শেখানো কায়দা। রাধারমণ ঘোষ সমর্থন করে বললেন, আমিও তাই বললাম। তুলসীভায়াতো নার্ভাস। বলে, চলুন ফিরে যাই। শুনে হেসে মরি। চাকরী করতে এসে সেন্টিমেন্ট? মেয়েমানুষের কান্নায় নরম হয়ে যাওয়া? একি নিজের বৌ-মেয়ে কাঁদছে, যে সত্যি হবে? শত্রু। শত্রু-পুরীর ছলনা। এদের মায়া কান্নায় ভুললেই রামচন্দ্রের সীতাহারানোর দশা নির্ঘাত।

বটেইতো। রামবাবু মাথা নাড়লেন। তুলসী দত্ত ম্লান বিষণ্ণ হয়ে গেছেন। রাধারমণ ঘোষ বলে চললেন, উঃ মাগীদের কান্নায় মরছিলাম। বাঁচলাম তিনজন মোড়ল আসাতে। যা সবজায়গায় হয়।

ওরা এসে পেন্নাম করল। তার পরেই তোয়াজ। চা খান, ডাবের জল খান, ডিম খান। ওরা আসছে। খবর গিয়েছে মাঠে। রাধারমণ ঘোষ হেসে বললেন, আরে শালারা—তোদের ওই ভিক্ষে করা ছাতাড়ে কাপে, গেলাসে মুখ দেবে কেরে? একি তোর কলকাতার কফি-হাউসে ছুঁড়ী নিয়ে বসে ফুর্তি ক'রে কফি খাওয়া? না দিলখুসার চা? হুঁ, কে খাবে তোদের ওই ঘোড়ার পেচ্ছাব চা?

হেঁ-হেঁ। পুলকিত রামবাবু বললেন, তারপর? তারপর তুলসী-ভায়ার কাণ্ড। বলে কিনা তাতে কি? চা যখন দিয়েছে। শেষে হাত থেকে গেলাস নিয়ে মাটিতে ফেলে তবে নিস্তার। ভায়ার আমার কি আপশোষ। রামবাবু ঘুরে তুলসী দত্তকে বললেন, কি স্যার, চা কী পান্ না? আবার মুখ ঘুরিয়ে রাধারমণ ঘোষকে বললেন, তারপর? রাধারমণ ঘোষ বললেন, শালারা ছুটে এল বাড়ীতে শ্মশানে শকুন পড়ার মত করে। আছড়ে পড়ল পায়ের 'ওপর। বলল, দোহাই হুজুর, মাফ করুন আমরা আপনাদের সন্তান তুল্য। মাগছেলের দিব্যি করে বলছি—আমাদের ঘরে ধান বলতে নেই।

মিথ্যেবাদী। রামবাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন। জোচ্চোর সব। বদমায়েস। পরের পাছায় কাঠি দিতে মিষ্টি লাগে? রাধারমণ ঘোষ বললেন, সত্যিই ছিলনা কিন্তু। অমনি রামবাবু বললেন, সেত জানা কথাই। শুধু জব্দ করতে যাওয়া। রাধারমণ ঘোষ বললেন, জব্দ খুবই হয়েছে। ধান নেই বলে কি আর রক্ষা মেলে? ট্রাকের পুলিশের খরচা দেবে কে? আমাদের বদনাম হবে নাকি? যা করে সবাই। ডাইরেকটিভ ইস্যু হয়ে গেছে। কাজেই গাঁ থেকে ধার করে এনে দিল শেষ পর্যন্ত। নাহলে পুলিশ, পিয়ন, আরদালি চা, ডিম চালাচ্ছে সমানে। চাঁচি, ছানার হুকুম চালাচ্ছে। কাজেই একটু হেসে নিয়ে রাধারমণ ঘোষ বললেন, সে সময় এক ছোকরা এসে হাজির। শুনলাম পাঠশালার মাষ্টার। সে বললে, ধান নেই তবু নেবেন কোন্ আইনে? ভাল ফ্যাসাদ। আইন দেখালেই বিপদ। বাধ্য হয়ে গোপন অস্ত্র ছাড়তে হ'ল। বললাম, নাম বলুন ত? সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি

করছেন। নিরাপত্তা আইনে পড়া উচিত। মাষ্টারত! ঘাবড়ে গেল। পালাল দেখলাম। উঃ। একি কম ঝামেলা?

রামবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন এবার। কেমন এক আবেগ নিয়ে এগিয়ে গেলেন। রাধারমণ ঘোষকে তোল্লাতোল্লা করে বুকের ওপর তুলে নিলেন। তারপরেই ছড়ার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলেন?

দাদা আমার কাজের লোক
দাদার আমাব পুণ্যি হোক।

সেই সঙ্গে নাচ। নাচের চোটে পায়েব তলায় চিপ্টে-যাওয়া-প্রায় একটি মুরগী পরিত্রাহি চীৎকার করে উঠল, ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ। অন্যগুলো করে উঠল, কোঁক-কোঁক-কোঁক।

আরদালি, পুলিশ, দারোয়ান, সবাই উপভোগ করছে। প্রৌঢ় রাধাবমণ ঘোষ কোট প্যাণ্ট পরে রামবাবুর কোলে চড়ে আবদার করে চলেছেন, কালকেই চাই কিন্তু—হ্যাঁ—একটা বিলিতি দিতে হবে।

রামবাবু কোলে খোকা নাচানো করে বলছেন, আচ্ছা, আচ্ছা হবে, হবে........।

সুকুমার আর দাঁড়াতে পারলনা। তার চোখকে বিশ্বাস হয় না। তার ছাত্রজীবনে শুনে আসা সভ্যতার আদর্শের বুকনিগুলো তালগোল পাকিয়ে সমস্ত চেতনার ওপর যেন আছড়ে পড়তে লাগল। সে ছুটে পালাল সেখান থেকে।

ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েও মুক্তি নেই সুকুমারের। একটু পরেই সেখানেও রামবাবু এসে হাজির।

স্যার।

সুকুমারের অসহ্য লাগল। রামবাবু বললেন, ধুবুলিয়া থেকে নবীনরাত ফিরে এল। কিছুই ফল হয়নি।

সুকুমার এবার কথা বলল। আমিত আগেই জানতাম। বলেছিলামও।

কিন্তু তাবললেত হবে না স্যার। রামবাবু কথায় জোর দিলেন। একটা হিল্লে করতেই হবে।

কি করে করবো ?

রামবাবু হাসলেন। আপনি স্যার একটুতেই হতাশ হয়ে পড়েন। ধুবুলের কে কি বলল বলে বন্দীপুরে আপনার কি হবে ? আপনিত কেরানী নন। আপনি সুবিধে বুঝে কাজ করবেন। রামবাবু আরও ভাল করে ব্যাখ্যা করলেন। আইনের ফাঁকত আপনার হাতে। স্রেফ কলমের খোঁচায় লিখে দিন আলাদা হয়ে গেছে দুভাই। বাস্ তারপর যা করবার সব আমি করব। বড়জোর একটা এন্‌কোয়ারী হবে। সে আমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঠিক করে নেব। শুধু আগে এ-কাজটা আপনাকে করে দিতেই হবে স্যার।

করে দিতেই হবে ? সুকুমার বিকেলে সকলের জমি মেপেছে উপদেশ দিয়েছে সকলের মধ্যে বসে—পঞ্চাশ ঘর বিদেশী মানুষ যেন এখানে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে। আর এখন সে নিজেই সেই বিভেদ সৃষ্টির কারণ হবে ? তাছাড়া সে রামবাবুর কথামত কাজ করবেই বা কেমন করে ? আইনকে, নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গতে হয় তাহলে।

রামবাবু সুকুমারের উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন। সুকুমার হাত-জোড় করে বলে উঠল, ওসব করতে পারব না। আমাকে অনুরোধ করবেন না।

রামবাবুর দেহে তখনও রাধারমণ ঘোষের স্পর্শরেশ জড়িয়ে আছে। সেই স্তাবকতার সুর কানে বাজছে। তারমধ্যে সুকুমারের সুর বেসুরো ঠেকল। তিনি থমকে গেলেন। হাসি মিলিয়ে গেল। মুখ-খানা থমথমে হয়ে উঠল। পাশে নবীন, জীবন দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, পারবেন না ? আমি বলচি তাও নয় ? রাখবেন না আমার অনুরোধ ?

সুকুমার হকচকিয়ে গেল। জড়িত স্বরে বললে, এযে বে-আইনী। পক্ষপাতিত্ব—

সে আমি বুঝি। রামবাবু হুঙ্ক'র দিয়ে উঠলেন। যেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চৌকীদার শাসনে ব্যস্ত। জানতে চাই এ-কাজ করবেন কি না ?

রামবাবু—সুকুমার কি একটা বলতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল। রামবাবু বলে উঠলেন, না, না, শুনতে চাইনে কিছু। আপনি জানেন—এ কলোনী আমিই বসাচ্ছি। আমি বে-সরকারী রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী। তাছাড়া—আপনি আমারই বাড়িতে বসে, আমারই খেয়ে—

বজ্রপাতেও সুকুমার বোধহয় এত চমকাত না। চৌকী ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কি, কি বলছেন আপনি ?

ঠিক বলেছি। রামবাবু সমান উত্তেজিত। অনেক অফিসার দেখেছি। বাইরেও বসে আছে দুজন। আপনার চেয়ে অনেক উঁচু। কই তারাত এমন করে না। আমার কথা অমান্য কবে না ? আপনি ভারিত এক পুঁচকে—

ঘর থেকে নিচে নেমে এলেন রামবাবু। চলে যাবার আগে আরেকবার ঘোষণা করলেন, আমিও চলে যাচ্চি ওদের সেপারেট করাবোই। ছুটো লোন দেওয়াবোই। আর যদি তা না হয় রাম মণ্ডল মরেনি এখনো। এখনো দেউলে হ'য়ে যায়নি........

এতখানি অপমান মানুষ মানুষকে করতে পারে ? এমন নির্লজ্জতা —এত হীনতা - ! সুকুমারের জীবনেব সমস্ত অভিজ্ঞতা আর কল্পনা স্তব্ধ প্রায়। একটু পরেই তার মনে হল, এখনো সে এই আশ্রয়ে আছে ? ওর মনে যেন এক অপমৃত্যুর বিভীষিকা ভেসে উঠতে লাগল। সুকুমার তার বিছানা গুটিয়ে ফেলল। বিছানা আর সুটকেশ এই তার সম্পত্তি। সে-দুটো হাতে নিয়ে ঘর থেকে নেমে এল। কলোনীতে থাকবে। সুবিধা না হয় চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, চাকরী ছেড়ে।

রামবাবু আবার উঠোনে ফিরে এসেছেন। সুকুমারের অপরাধের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেছেন। ভূপালবাবু রোগী দেখে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে গেছেন। তাদের পাশ দিয়ে সুকুমার এগিয়ে যাচ্ছিল রাস্তার দিকে। তুলসী দত্ত লাফিয়ে উঠলেন, ওকি, চলেছেন কোথায় মশাই, সুকুমার জবাব দিল না। এগিয়ে যাচ্ছিল। তুলসী দত্ত সামনে এসে দাঁড়ালেন, আপনার জন্যে যে মুরগী আনলাম, ডিম আনলাম—

রাধারমণ ঘোষ বললেন, ভায়ার হোল কি? এমন কি হয়েছে? এক জায়গায় থাকতে গেলে অমন হয়েই থাকে। তাছাড়া আইন একটা জিনিস– তা নিয়ে আবার মতান্তর? তাহলে তো আমাদের কাজ কর্ম চুকিয়ে চলে যেতে হোত এ্যাদ্দিন।

তুলসী দত্ত সুটকেশ চেপে ধরলেন সুকুমারের। যাচ্ছেন কোথায় এ আস্তানা ছেড়ে?

সুকুমার বলল, ছাড়ুন।

ছাড়ব কি? রাখুন আপনার ছেলেমানুষি। চাকরী করতে এসে অভিমান? চলে গেলে এসব মুরগী খাবে কে? আসুন—

কে এই তুলসী দত্ত? তারই মত একজন সরকারী কর্মচারী মাত্র। রামবাবুর সমর্থক। সুকুমার নিজের সুটকেস আঁকড়ে ধরল। ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। আমি মানুষ।

স্তব্ধ পরিবেশ। পরিণতির প্রতীক্ষায়। হঠাৎ রামবাবুর আস্ফালন পরিবেশের হাওয়া পাল্টে দিল। ছেড়ে দিন মশাই। যেতে দিন ওসব নোংরা আবর্জনার দল। দেখুকগে একবার বাইরে গিয়ে চরে খুঁটে খেয়ে। কে ঘরে আশ্রয় দেয়, জামাই আদর করে দেখি—

কেন? করলে কি হবে? আবার পরিবেশ চমকে উঠল এই অবিশ্বাস্য উক্তিতে।

রামবাবুর ভাগনে জামাই ভূপালবাবু সুকুমারের হাত চেপে ধরলেন। আমি আশ্রয় দেব। আসুনত আমার সঙ্গে।

রামবাবু উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন। কিন্তু ভূপালের মত তেজীমানুষ গাঁয়ে কমই আছে। ওকে চটাতে সাহস করেন না রামবাবু। তবে ভূপাল এমন করল! ভূপালবাবু সুকুমারকে নিয়ে উঠোন থেকে নেমে গেলেন।

সংবাদটা যতদূর সম্ভব সে-রাতেই ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

সে-রাতে সুকুমার গিয়ে ভূপালবাবুর বৈঠকখানায় আশ্রয় নিল। পরদিন সকালবেলায় রামবাবু মেয়ের মুখ দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

কি হয়েছে রে খুকু?

খুকু কোন জবাব দিতে পারল না। বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে খুকু। যেন কত বিনিদ্র-রজনী কাটিয়েছে। যেন দুঃস্বপ্ন দেখে উঠেছে। রামবাবু বললেন, অসুখ করেচে? জ্বর? তাহলে কম্পাউণ্ডারবাবুকে পাঠিয়ে দিই।

না থাক। খুকু জড়িতস্বরে বললে।

রামবাবু বললেন, থাকবে কেন? অসুখ হলে ওষুধ খেতে হবে না?

বাবার এ সহৃদয়তাকে আজ ভাল লাগল না খুকুর। কই অন্যদিন অন্য সময়ত এমন করেন না উনি। আজ? রামবাবু সামনে দাঁড়িয়ে জবাব চান। খুকু বলল, থাক্‌গে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে নেব জামাইবাবুর কাছে।

রামবাবু বিরক্ত হলেন। ভূপাল সুকুমারকে যেচে আশ্রয় দিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করেছে। শত্রু! মেয়েকে বললেন, হোমিওপ্যাথি খেয়ে কি হবে? ওতে রোগ সারে? খেতে হবে না ওসব। কম্পাউণ্ডার বাবুকে বলচি। ওষুধ দেবেন। কথা শেষ করে রামবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই হরিমোহন দাঁ এলেন খুকুর কাছে। কি হয়েছে? জ্বর? কই দেখি। হরিমোহন দাঁ খুকুর গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করবেন? খুকু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, জ্বর হয়নি। তেমন কিছু হয়নি।

হরিমোহন দাঁ বললেন, তবু কেমন যেন লাগছে। দেখি একবার। ছাড়লেন না। পরীক্ষা করলেন। তারপর রোগ আর ওষুধ বাতলে দিলেন। শরীরে ক্যালসিয়াম কমে গেছে। ট্যাবলেট পাঠিয়ে দেব। উপকার হবে খেলে। —খুকু মনে মনে খুব হাসল।

হরিমোহন দাঁর মন পড়ে আছে মন্দিরে। রামবাবুর সঙ্গে কলোনীতে যাবেন। সেখানে প্রতিপত্তি সবে জমে উঠেছে। সুকুমারবাবুকে ছেড়ে এবার রামবাবুর সঙ্গে ঘুরতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে। খুকুকে দেখেই মন্দিরে ছুটে এলেন। সেখানে তখন হাবুল কর্মকারও এসে উপস্থিত হয়েছে। রামবাবু তাকে গতরাতের কথা বলছেন। হরিমোহন দাঁ গিয়ে বললেন, উৎপাত গিয়েছে। তবে এখন থেকে কলোনীর দিকে নজর রাখতে হবে, যাতে ও দল পাকাতে না পারে।

রামবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। ক্ষেপেছেন ? আমাদেরই বুকে বসে রাজত্ব করবে ? সেজন্যে রাম মণ্ডল কলোনী বসায়নি এখানে।

হরিমোহন দাঁ দাঁত বার করে হাসলেন। হাবুল কর্মকার খুব খুশী।

সুকুমার আশ্রয় নিয়েছে ভুপালবাবুর বৈঠকখানায়। খড়ের পাঁচচালা। জাফরির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে চৌকীর ওপর নিজের বিছানাটা পেতেছে। পাশের একখানা বেঞ্চিতে সাজিয়ে নিয়েছে অন্যান্য সরঞ্জাম। সারাদিন আর সে-ঘর থেকে বার হয়নি সুকুমার। মানুষের ভাবনার ভুল হয়ে যাওয়া, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া, কল্পনা মুছে-যাওয়ার কান্না মর্ম্মান্তিক। দুঃসহ। সেই বেদনা সুকুমারের বুকে।

সুকুমার এখানে আসার পর গ্রামের অনেক মানুষই এসেছিল দেখা করতে। তার মধ্যে উপেন শিকদার প্রধান। উপেন শিকদার ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়কারী। মধ্যবয়সী মানুষ। সেই হরি-মোহন দাঁর সঙ্গে সুকুমার রাতের বেলা যখন এখানে এসেছিল, তখন ইনিই নানা প্রশ্ন তুলে ভাবিয়ে তুলেছিলেন সুকুমারকে। তিনি এবার এসে বললেন। এমন হবে আমি জানতাম। রামচন্দরকে ছোটবেলা থেকে দেখচি। কম কীর্ত্তি করল ? সরকারী লোকজনও এসে ওর কাছে বশ হয়ে যায় বেশ। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গিয়েচে। কিন্তু আপনি— আপনাকেই দেখচি অন্যরকম। কিন্তু সাবধান মশাই। আপনার বয়েস কম। রামচন্দর সব করতে পারে, তবে আমরাও আছি।

বিকেল বেলা সুকুমার কলোনীতে গেল। উদ্বাস্তুরা এসে ঘিরে ধরল। রামবাবুর কাছে শুনেছে সব কথা তবু তারা সুকুমারের কাছে শুনতে চায়। শ্রীমন্ত আইচের জিবটা নেচে উঠল কবার প্রশ্নের ইচ্ছায়। সাধুচরণ হেসে ঘনিষ্ঠ হবার ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা করল। ব্যর্থ হল। সুকুমার নীরব। ব্যক্তিগত বিষয়কে বারোয়ারী করতে চায় না।

শেষে মুস্কিল বাধালেন হরিমোহন দাঁ। ছুটে এসে সকলের সামনে প্রশ্ন করলেন, স্যার, আপনি বলে ঠাকুরবাড়ি ছেড়েছেন ? কি হয়েছিল ?

এড়িয়ে যেতে পারল না আর সুকুমার। বললে, রামবাবুর জেদের

জন্যেত বে-আইনী কাজ করা যায় না। এক পরিবারের ছুভাইকে পৃথক পরিবার করি কেমন করে? সুকুমার থামল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল একটা চাপা আক্রোশ। তারা শুনেছে নবীন, জীবনের কথা।

কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ সুকুমারকে দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। পুলের ধারে। তারপর বললেন, রামবাবুর আশ্রয় ছেড়ে ভালই হোল। অপমান সহ্য করে তারাই যাদের ঘেন্না পিত্তি নেই। আর ভূপালবাবুর কাছে ওঠা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। ও রামবাবুর যম। তাই রামবাবু এখন চুপ করে আছেন। হেঁ-হেঁ। হরিমোহন দাঁ আরও খানিক ঘনিয়ে এলেন। আর একটা কথা, স্যার—। আপনি নতুন এসেছেন। বিদেশী। আমিও বিদেশী, তাই বলছি, ভূপালবাবুর আড্ডার সব লোক কিন্তু ভাল না। বিশেষ করে উপেন শিকদারটা। মিশলে বিপদে পড়বেন. কথা শেষ করেই হরিমোহন দাঁ আরেকবার হেসে বললেন, আচ্ছা চলি স্যার। আমাকে আবার কলোনীতে একটা রোগী দেখতে হবে।

সুকুমার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কলোনীতে আমাশা হয়েছে জগন্নাথ মণ্ডলের ছেলের। তাকে চিকিৎসা করছে কবিরাজ শ্রীমন্ত আইচ। তবু হরিমোহন দাঁ উপযাচক হয়ে গিয়ে তাঁবুর সামনে দাঁড়ালেন। জগন্নাথ মণ্ডল তাঁবুতে ছিল না। তার স্ত্রীকে বললেন, ছেলেকে একবার দেখব। জগন্নাথের স্ত্রী ঘোমটা টেনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। হরিমোহন দাঁ বুঝলেন জগন্নাথকে ডাকতে গেল। জগন্নাথ ছিল কলোনীর ওপাশে। ছুটে এসে হরিমোহন দাঁকে নমস্কার করল। হরিমোহন দাঁ বললেন, খোকাকে দেখতে এলাম একটু।

ও। জগন্নাথ বললে, কবিরাজ মশাই দেখছেন ওকে।

বেশত। দরদ জড়িয়ে এল হরিমোহন দাঁর কণ্ঠে। কবিরাজী ভাল। তবে এযুগে এ্যালাপাতির আলাদা কদর। কম সময়ে রোগ সারে। সাধ করে কে আর ভুগতে চায়? পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, ভিটে মাটি ছাড়া—জীবনে কি কম কষ্ট?

জগন্নাথ মণ্ডল খুশী হয়ে ছেলে দেখাল। কবিরাজকে উৎখাত করে

পসার করা যাবে না বুঝে আপোষের আশায় হরিমোহন দাঁ বললেন, চল, কবিরাজ মশাইএর সঙ্গে একটু আলোচনা করব তোমার ছেলের সম্বন্ধে।

শ্রীমন্ত আইচ তখন উদ্বাস্তুদের মধ্যে বসে আলোচনারত। বিষয় রামবাবু—সুকুমার। হরিমোহন দাঁ গিয়ে সেখানে বসলেন। ব্যাপার বুঝে চিকিৎসার কথা চেপে গেলেন। শ্রীমন্ত আইচের পিঠে হাত রেখে বললেন, আপনাদের এখন কোন দলেই যোগ দেওয়া ঠিক নয়। সুকুমারবাবু লোনের মালিক। ওদিকে রামবাবু জমিদার। প্রেসিডেণ্ট —নেতা। তবে কোন দলে যোগ দিতে হলে রামবাবুর দলেই যাওয়া ঠিক। সরকারী লোকত চাকর। আজ আপন, কাল কেউ নয়। আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু রামবাবু অক্ষয় বট ওঁর সঙ্গেই ওঠা-বসা করতে হবে। তাই কিনা বলুন কবিরাজ মশাই? এ্যাঁ-হেঁ-হেঁ—। উদ্বাস্তুদের মধ্যে আরও ঘন হয়ে বসলেন হরিমোহন দাঁ।

সুকুমার সন্ধ্যাবেলা কলোনী থেকে ফিরে দেখল হাবুল কর্মকার বসে আছে ভূপালবাবুর বৈঠকখানায়। লোনবণ্ডগুলো দিতে এসেছিল। সেগুলো দিয়ে হেসে বললে, স্যার আমরা কাজ বুঝি। যখন যা দরকার হয় আমাকে ডাকবেন দয়া করে। রামবাবুর গোমস্তা বলে ভুল বুঝবেন না। গোমস্তা মানেত পোষা চাকর নয়। ভালমন্দ বিচার আমার কাছে। আমরা মানুষের কাজ নিয়ে বিচার করি। তাই স্যার, আমাদের ভুল বুঝবেন না যেন। রাগ করবেন না আমাদের ওপর। সুকুমার আশ্বাস দিল।

হাবুল কর্মকার লোনবণ্ড পূরণ করে দিয়ে সুকুমারকে অনেকখানি সাহায্য করল এই দুঃসময়ে। পরদিনই সুকুমার প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারের কর্তাদের নিয়ে কৃষ্ণনগর রওনা হয়ে গেল। জমি রেজেষ্ট্রি হবে। লোনবণ্ড জমা দিতে হবে।

সুকুমার কৃষ্ণনগর চলে গেল। আর সেই দিনই রামবাবু গিয়ে হাজির হলেন ভূপালবাবুর বাড়িতে। ভূপালবাবুর স্ত্রী হেমলতা সতরঞ্চি পেতে বসতে দিলেন। ভূপালবাবুও ছিলেন। রামবাবু বললেন, বস ভূপাল। কথা আছে। হেম তুইও বস। শোন।

রামবাবু বললেন, একটা নেমকহারামকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি। খাইয়ে, আশ্রয় দিয়ে আমিও রেখেছিলাম। আজ গাঁয়ের লোক সব হাসাহাসি করছে। আত্মীয় হয়ে আমার বিরুদ্ধ-কাজ করেছ বলে। তাই বলছি তুমি ওকে এখান থেকে উঠিয়ে দাও।

ভূপালবাবু প্রতিবাদ জানালেন। অসম্ভব। একজন বিদেশী ভদ্র-লোককে অকারণে তাড়িয়ে দিতে পারব না।

অকারণে ?

নিশ্চয়ই। অকারণ বলেইত ডেকে এনেছি। নাহলে আপনার অপমান আরও বেশি হ'ত। আমার দ্বারা ও-সব কাজ হবে না।

রামবাবু রাগ করলেন। ভূপালবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভূপালবাবু বেরিয়ে যেতেই রামবাবু হেমলতার দিকে ঘুরে বসলেন। হেম্ তুই-ই বল্, ভূপালের কি এটা ধর্ম হচ্ছে ? তুই একটু কঠিন হ।

হেমলতা এবার বললে, আমি কি করব ?

তুই ভূপালের খামখেয়ালীতে বাধা দিবি।

হেমলতার হাসি পেল। স্বামীকে বাধা দিতে হবে। তার স্বামী পরের হুকুম খাটার ভয়ে কেরানীর চাকরী পেয়েও গেল না। বাঁধা মাইনের লোভ ছেড়ে হোমিওপ্যাথির অনিশ্চিৎ উপায়ের ওপর নির্ভর করল। তাকে বাধা দেবে হেমলতা ?—আর কেন ?

রামবাবু বললেন, তুই স্ত্রী। সংসার তোর হাতে। তুই একটু কড়া হলেই—

হেমলতা হেসে বললে, কি বলচ মামা ? ওকে চেন না ?

রামবাবু একটু থমকে গেলেন। একটু পরেই আবার ধূর্ত শেয়ালের হাসি মুখে ফুটে উঠল। এক কাজ কর্। চল্ তোর মার কাছে গিয়ে দুদিন থাকবি। আমিও যাব।

আবার হাসল হেমলতা। যাওয়া কি আমার হাতে ? তোমার জামাইএর মত দরকার।

আবার জামাই ? ভূপাল ? একটা রুদ্ধ আক্রোশ নিয়ে রামবাবু

চলে গেলেন ভূপালবাবুর বাড়ি থেকে। নিজের বাড়ি গিয়ে তাঁর সে আক্রোশ ফেটে পড়ল মেয়ের সামনে। শত্তুর—শত্তুর। আত্মীয় চিরকাল শত্তুর হয়। বিভীষণ শত্তুর, মীরজাফর শত্তুর, মহম্মদই বেগ শত্তুর। আপন ভাগ্নেজামাইও তাই। বাইরের লোককে ঘরে তুলে অপমান করল। আমিও দেখে নেব।

রামবাবু আস্ফালন করলেন। তাই শুনে কিন্তু খুকুর সমস্যাসংকুল মনে একটা সমাধানের আলো জ্বলে উঠল। সেদিন বিকেল বেলাতেই সে ভূপালজামাইবাবুর বাড়ি চলে গেল। হেমদিদির কাছে।

হেমলতা অবাক হল! খুকু এসেছে তার বাড়িতে! খুকু কারো বাড়ি যেতে চায় না। পথে বার হওয়াই পছন্দ করে না। তাই নিয়ে হেমলতা কতদিন অভিমান করেছে।

হেমলতা অভ্যর্থনা করল। আয়, আয়। কি ভাগ্যি আমার আজ।

খুকু এসে বারান্দায় বসল নীরবে। কে কথা বলবে আগে? খুকু এসেছে আপন তাগিদে অথচ এখানে কিছুই বলতে পারে না আর।

হেমলতাই বললে, মামা কোথায়?

কলোনীতে বোধ হয়।

হেমলতা হাসল। বোনকে বললে, হাঁরে, কলোনীতে বলে এক অপ্সরী এসেছে? আর মামা নাকি সেখানেই ঘুরছে? আর তাই নিয়ে একজন বিদেশী মানুষকে পর্যন্ত বিপদে ফেলার চেষ্টা ওনার। তারজন্যে এই দুপুরেই এখানে এসেছিল। বলে কিনা ওকে তাড়াও। আমাকে বলল, ওকে রেঁধে দিস্‌নে। মার কাছে চলে যা। বল দিকি ভাই—মামার কি এতে মুখ উজ্জ্বল হবে খুব?

খুকু উঠে দাঁড়াল।

কি হল? হেমলতা হাত ধরল। উঠলি যে—

খুকু কেঁদে ফেলল। হেমলতা অপ্রতিভ। শিক্ষিতা শহরের মানুষ খুকুকে ঈর্ষা করে বৈকী হেমলতা। সুযোগ-সুবিধা মত বিদ্রূপ-রসিকতা করেছে অনেকদিন। আজ সর্বপ্রথম বড় ভাল লাগল খুকুকে। খুকুর

কান্নায় তার সব রসিকতা যেন ভিজে গলে গেল। হাত ধরে খুকুকে বসাল। খানিক পরে সহানুভূতির স্বরে বললে, বল দিকি ভাই, মামার ওসব কথা মানা যায়? একজন ভদ্দর লোকের ছেলেকে—

খুকু বলে উঠল, সে তোমাদের খুশী। যা ইচ্ছে করগে। কচি খোকাত নয়। বিদেশে চাকরী করতে আসবার সময়ত তোমাদের চিনে আসেনি। নিজের ভরসাতেই এসেছিল। ব্যবস্থা করে চলতে পারে ভাল। না পারে ভুগবে।

হেমলতা প্রথমটা অবাক হল। তারপরেই হেসে উঠল খিল খিল করে। বিয়ে হয়েছে তার। পুরুষ মানুষ নিয়ে ঘর করছে। অভিজ্ঞতার ছাপ লেগেছে জীবনে। খুকুকে জড়িয়ে ধরে বললে, দাঁড়াও। সুকুমারবাবু আসুক। বলব বাবা-মেয়ে ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে।

খুকুর মুখখানা একবার দীপ্ত হয়ে উঠেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

রাতে ভূপালবাবু খেতে বসলে, হেমলতা বললে, মামাত অমন করে বেড়াচ্ছে। এধারে খুকু যে মরেছে।

কি রকম?

সুকুমার'সঙ্গে মজেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। খুকু এসেছিল। তার কথার মধ্যেই পরিষ্কার বুঝলাম। মনে রঙ লাগা কথা শুনলেই বোঝা যায়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তা নয়তো কি? মেয়েমানুষ এ ভাল বুঝতে পারে।

ভূপালবাবু স্ত্রীর কথায় হেসে উঠলেন সজোরে। হেমলতা বললে, তুমি সুকুমারবাবুর দিকে একটু নজর রেখো তাহলেই বুঝতে পারবে।

সুকুমার কৃষ্ণনগর থেকে ফিরলে উপেন শিকদার এসে উপস্থিত হ'ল।—আপনাকে একবার তুল্লুবপুর নিয়ে যাব।

তুর্লভপুর? কেন?

ওখানে নিবারণ খুড়ো আছে। জাতে খীরিষ্টান। কিন্তু লোক সজ্জন। আগের বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিল অনেকদিন। সে রামচন্দরের নাড়ীনক্ষত্তর সব জানে। আপনার এ-অপমানের কথা শুনে অবধি আলাপ করতে চাচ্চেন। তার কাছে আপনি অনেক উপকার পাবেন।

কৃষ্ণনগরে গিয়ে সুকুমার ফিরে পেয়েছিল তার আপন পরিবেশ। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব। সেখানে শহরের নিভৃত পরিবেশের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিল প্রায়, গ্রামের চিন্তা। কে রামচন্দ্র জমিদার—আপন দম্ভে কি বলল না বলল, কালস্রোতে ভেসে-যাওয়া জীবনে তাতে কতটুকুই বা যায় আসে? তাই সুকুমারের মনে এ কিন্তু ফিকে হয়ে এসেছিল।

গ্রামে ফিরেই আবার সেই রামবাবুর গণ্ডী। শুধু গাঁজিয়ে ওঠা বাতাস। পরিত্রাণের আশায় সুকুমার তাই উপেন শিকদারের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেল। পরদিনই গেল দুর্লভপুরে।—সকালবেলা।

নিবারণ বিশ্বাস। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পার-হওয়া মানুষ। খাটো ধুতি পরণে। ফতুয়া গায়ে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। লম্বা-চওড়া দেহ। শ্যামবর্ণ রঙ। মোড়লের মতই চেহারা।

উপেন শিকদার পরিচয় করিয়ে দিল। সুকুমার নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার করে অবাক হয়ে তাকালেন নিবারণ বিশ্বাস। ধুতিসার্ট-পরা, চোখেমুখে প্রথম যৌবনের সরল উদার দীপ্তি—অফিসার। আপনি অফিসার? আমার নাতির বয়সী যে?

সুকুমার হেসে বললে, উপেনদারকাছে আপনার নাম শুনে এলাম।

বেশ, বেশ। আমিও উপেনের কাছে আপনার নাম শুনেছি। আগেকার দিন হলে নিজেই যেতাম, এখন বয়স হয়ে আর…। আসুন, ঘরে আসুন।

বাইরের ঘরে আসবাবপত্র বেশ সাজানো-গোছানো। টেবিলে সূচীকাজ করা একটা টেবিলক্লথও আছে। সুকুমার চেয়ারে বসল। নিবারণ বিশ্বাস বললেন, রামচন্দর তাহলে অপমান করল? নিজেই হাসলেন খানিক। তারপর বললেন, চা খাবেন ত?

সুকুমার বললে, হ্যাঁ—তা—

আমার এ খৃষ্টান বাড়ি কিন্তু।

তাতে কি?

না। আপত্তি থাকতে পারেত। গাঁয়ে-ঘরে হিন্দুরা খায় না। এই উপেনই খায় না।

না। আমার সে বালাই নেই। সুকুমার বললে।

নিবারণ বিশ্বাস ভিতরে গেলেন। উপেন শিকদার নীরব ছিল। এবার বললে, সব জাত নিজের নিজের বিশ্বাস মানবে আর আমরা মানব না? আপনারা আজকাল শহরের ছেলে। না হিন্দু, না কিছু। বাইরে দু'জন চৌকীদার বসেছিল। তারা ডাকতেই উপেন শিকদার উঠে গেল।

নিবারণ বিশ্বাস আবার ঘরে এসে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে আরম্ভ করলেন, রামচন্দরের স্বভাবই ওই, জীবন গেল বেইমানী করতে করতে।

সুকুমার প্রশ্ন করল, তাহলে ওঁকে প্রেসিডেন্ট করলেন কেন?

সে আরেক কাণ্ড। দাড়িতে হাত বুলোলেন একবার নিবারণ বিশ্বাস। প্রেসিডেন্ট এ দিগরে আমিই হয়েছি বরাবর। লীগের আমলে পেথম বিপর্যয় হল।

বৃদ্ধ গল্প বলছেন। ওঁর মাথার চুল সুপরিপক্ক। সাদা ভ্রূযুগল। চোখের ঈষৎ বাদামী মনিদুটো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির রোমন্থনে জ্বলে জ্বলে উঠছে। বৃদ্ধ বলে চললেন, বিপর্যয় ঠিক নয়। জবর দখল। ভোটের মুখোমুখি সদর থেকে লীগ নেতারা এল। উকিল-মোক্তার-ব্যবসাদার। সভা করল গাঁয়ে গাঁয়ে। বলল, এবার মুসলমান প্রেসিডেন্ট হবে। তার জন্যে মসজিদে মসজিদে কোরবাণীর ধূম পড়ে গেল। গোস্ত ছাড়া আর মুসলমানেরা কথা বলে না কেউ। সেই সব শুনেই এল স্বদেশীওয়ালারা। বলে বেড়াল, ধর্ম নিয়ে মাতামাতি কোরনা কেউ। আমরা দুর্বল হয়ে যাব।

কিন্তু আমরা তখন এ-অঞ্চলে দলে ভারী। আমাদের গীর্জাঘর আছে। পাদরী সাহেব আছেন। সবাই মিলে ঠিক হল, রাজার

জাত দেশের কোন দলেই নয়। তবে লীগ যখন বলচে তখন এবার ওদের গদী ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তাই হ'ল। খৃষ্টান সমাজের ব্যবস্থা মত কাজ হ'ল। কিন্তু হিন্দু হয়ে রামচন্দর করল কি? সোজা লীগের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল, এই হচ্চে আমার দল। ও স্বদেশীওয়ালারা কিছু নয়। এদের ভোট দাও সব।

লীগওয়ালারা ওর গলায় মালা দিয়ে ঘোরালে গাঁয়ে গাঁয়ে। সোজাকথা নয়। জমিদার দশরথ মণ্ডলের ছেলে বলে বেড়াচ্চে লীগের জিত হয়ে গেল। উষাগ্রামের হালসানা বরকত সেখের ছেলে রহিম সেবার প্রেসিডেণ্ট হল। কথা থামিয়ে নিবারণ বিশ্বাস মৃদু হাসলেন। ঘরের থমথমে হাওয়ার মধ্যে আবার আরম্ভ করলেন, কিন্তু হলে হবে কি? ও নাম সই করতে জানে কোন মতে। বুদ্ধিই বা তেমন কই? কাজেই গণ্ডগোল আর গণ্ডগোল। আমার কাছে নালিশ নিয়ে ছুটে আসে দেশসুদ্ধ লোক।

আমিও অবিশ্যি চাষার ছেলে। বিদ্যেও বেশি নয়। পেথমবার আমিও ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পাদরী সায়েব ছিলেন খাঁটি সায়েব। যেমন বিদ্বান তেমনি ভালোমানুষ। ইটমিট সায়েব। হাত ধরে বললেন, ভয় কি? আমি আছি। ইংরেজ। এসব আইন-পত্তর ইংরেজের তৈরী। আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তুমি হচ্চ খৃষ্টান। কাজেই তোমাকে এ আইনের কাজ করতেই হবে। আহা ইটমিট সায়েব—। তাঁর মুখখানা এখনও চোখের সামনে ভাসে। কী লোক, কী সুন্দোর........। চোখদুটো চিকচিক করে উঠল নিবারণ বিশ্বাসের। কাপড়ের কোঁচা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কিন্তু রহিম? ও কি জানে? সবাই বলে বাঁচাও। তাই ঠিক করেছিলাম আবার দাঁড়াব। তার আগেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। রহিম কানা পড়ে গেল। আর রামচন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। হাত পা ধরে বললে, খুড়োগো দোহাই—আমি দাঁড়াব। বললাম, কি বাবা—তুমি যে লীগ? লীগত আর নেই এ দিগরে?

রামচন্দর বললে, খুড়ো, লীগ করে কোন্ শালা? হিন্দুর ছেলে

লীগ হ'তে যাব কোন দুঃখে ?

হয়েছিলে যে তখন ?

সে আমার মতিচ্ছন্ন। তা ছাড়া তখন লীগে না ঢুকলে কি হিন্দুরা বাঁচত ? আমি তলায় তলায় কি করেচি তা কেউ জানেনা। সে সব জানে এ জেলার এখনকার নেতারা। তাই স্বাধীন না হতে হতে আমাকে দলে ডেকে নিয়েচে। তাই আমি এবার দাঁড়াব খুড়ো।

সুকুমার আক্রোশ নিয়ে বললে, তাই বলে আপনি মানলেন ?

নিবারণ বিশ্বাস হেসে বললেন, না। আমি বিশ্বাস করিনি। এ-দিগরে কেউ বিশ্বাস করে না ওকে। সবাই জানে ওদের বাস ছিল এই তুল্লুবপুরে। ওর ঠাকুদ্দা—অজয় মণ্ডল পেথম বয়েসে ভুষিমালের কারবারী ছিল। সে সময় নীলের চাষের সায়েবদের ডাকে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল ওই অজয় মণ্ডল। গোমস্তা হল। আমাদের খৃষ্টানরা যা পারেনি ও তাই করল। চাষার বেগার খাটনি চাই, পরের পাট করা জমি চাই নীল বুনতে, নইলে লাভ হবে কেন ?

কিন্তু বিনে জুলুমে বেগার হয় ? জুলুম করবে কে ? অজয় মণ্ডল হাজির। বেপরোয়া মদ্দানি। নীল-সায়েব ঘোড়া দিয়েচে ওকে। হাতে চাবুক দিয়েচে। ঘোড়াকেও মারা যাবে। অবাধ্য চাষাকেও চাবকে দিতে মজা। সায়েব বলেচে—ভয় নেই। আমরা আছি।

তবু মানুষেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। শেষ অবধি আর মুখ বুজে সইতে পারল না সব। এখন যেখানে বন্দীপুর। তখন ওটা মাঠ ছিল। আর এককোণে একটা গেরাম। তার নাম ছিল চক্করবিল। চাকার মতো গোল হয়েছিল বিলটা ওখানে। ওখানদিয়ে অজয় মণ্ডল ফিরছিল। সন্দে হয়ে গিয়েচে। হঠাৎ বন থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে এল। ওর ঘোড়াকে ঘিরে ধরল। হাতে নানা অস্তর। মুখে মুখোশ। বললে, নাম্। নামিয়ে 'দা' দিয়ে একটা কান কেটে দিয়ে সব পালিয়ে গেল।

অসহ্য যাতনা আর অঝোর ঝরা রক্ত নিয়ে অজয় মণ্ডল গিয়ে আছড়ে পড়ল সায়েবের সামনে দেখেশুনে সায়েব বলল, অজয়, তোমার কান কাটা গিয়েছে দুঃখ নেই। ও কান আমি সোনা দিয়ে

বাঁধিয়ে দেব। কিন্তু ওদের জব্দ করতে হবে। যেখানে ওরা তোমাকে বন্দী করেছিল, সে মাহাল কিনে তোমাকে দিচ্চি। ওখানেই তুমি বাস করবে। আর শোধ নেবে এ অপমানের।

কানকাটা অজয় মণ্ডল তাই করল। ছল্লুবপুরের বাস উঠিয়ে গেল চক্করবিলে। গাঁয়ের নাম দিল বন্দীপুর। জমিদার হল নাতি রামচন্দর।

সুকুমার কাহিনীটা অন্যভাবে শুনেছিল। রামবাবুর কাছে। তাতে ছিল রামবাবুর গর্ব আর ভাষ্য। বাকী অংশটা পূরণ করলেন নিবারণ বিশ্বাস। বৃদ্ধ বললেন, ওকে আমরা বিশ্বাস করিনে। তবে প্রেসিডেন্ট করলাম কেন? সে খৃষ্টান-সমাজের ঘরের কথা। রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্ট্যাণ্টের বিবাদ কাহিনী। তাছাড়া চোখে ভাল দেখিনে। বুড়ো হয়েচি। কাজেই যা খুশী করুক গে। দেশে আরও ত মানুষ আছে। তারা দেখে নিক।

নিবারণ বিশ্বাসের এ উক্তিগুলো ভাল লাগল না সুকুমারের। ওঁর এ আত্মতুষ্টির ভঙ্গী এতো মৃত্যুর লক্ষণ। এঁর কাছে কি সাহায্য পাবে সুকুমার?

সুকুমারের সেই হতাশ মুহূর্তে নিবারণ বিশ্বাসের নাতনি ঘরে এসে ঢুকল। নিবারণ বিশ্বাস বলে উঠলেন, জোছনা, এই যে ইনিই কলোনী গড়তে এয়েচেন বন্দীপুরে। সুকুমারবাবু।

জ্যোৎস্না টেবিলের ওপর খাবারের রেকাবী আর চা-এর কাপ নামিয়ে নমস্কার করল।

নিবারণ বিশ্বাস বললেন, এই আমার নাতনি। ছেলের মেয়ে। ওর বাবা-মা কেউ নেই। আমার কোলে-পিঠেই মানুষ। এখন কলকাতায় নার্সের কাজ করে। মিশনে। সায়েব-সুবাদের সঙ্গে খুব খাতির। ছ'মাস পরেই বিলেত যাবে। ভাল নার্স হতে। মিশনই পাঠাবে। তাই এ-কটা মাস আমার কাছেই থাকতে এয়েচে। বুড়ো মানুষ। আজ আছি, কাল নেই—।

জ্যোৎস্নাময়ী বললে নিন্ খেতে আরম্ভ করুন। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

সুকুমার ভাল করে জ্যোৎস্নাময়ীকে দেখল। কাল রঙ। মাঝারি গড়নের। বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। কালাপাড়, শাদা খোলের শাড়ী পরণে। নার্সেরই ঢঙ্।

সামনে খাবার। সুন্দর পেয়ালায় চা আর ডিমের অমলেট।

লৌকিক রীতি অনুযায়ী সুকুমার বললে, এত খাবার—

এত আর কি? কাল কলকাতা থেকে এনেছি, তাই। আপনাকে আমার দিতে ভয় করছিল।

কেন?

এতো কলকাতা নয়। দিলখুসা বা গ্র্যাণ্ডও নয়। গাঁয়ের বুকে হিন্দুর ছেলে—

সুকুমার হেসে উঠল। না, না, ওসব বালাই আমার নেই। কৃষ্ণনগরে কি কম খৃষ্টান আছে? আমার বন্ধুই আছে কতজন। কলেজের পাশেই প্রোটেষ্ট্যান্ট গীর্জা। কলেজে পড়ার সময় ঘণ্টা শুনে শুনে তো মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল কোনটা প্রার্থনার—কোনটা শোকজ্ঞাপক।

নিবারণ বিশ্বাস খুশীতে ভরে উঠলেন। নাতনিকে পাশে নিয়ে আলাপ জমিয়ে তুললেন।

জ্যোৎস্নাময়ী এখন থাকবে এখানে। সুকুমারকে মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবার আমন্ত্রণ জানাল। সেই সঙ্গে প্রস্তাব পেশ করল, এই দিন আপনি এলেই আপনার সঙ্গে বন্দীপুরে যাব। আপনার কলোনী দেখতে।

সুকুমার চমকাল। খুকুও অমনি প্রস্তাব করেছিল। তাই এসব প্রস্তাবকে আর বিশ্বাস হয় না ওর। জ্যোৎস্নাময়ীর মুখের দিকে তাকাল। স্পষ্ট বুঝতে পারল না। মুখচোখের ভাব স্পষ্ট দেখা গেল না। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নামছে।

সুকুমার উঠে এল ঘর থেকে। জ্যোৎস্নাময়ী, নিবারণ বিশ্বাস সঙ্গে এলেন। জ্যোৎস্নাময়ী আবার আসবার অনুরোধ জানাল। সপ্রতিভ তরুণী। খুকু নয়। খুকুর মত জরদ্‌গব মেয়ে নয়। হ্যাঁ, এখানে আবার আসবে সে।

উপেন শিকদার কোথায়? নিবারণ বিশ্বাস হাঁকলেন, উপেন?

সামনের চালা থেকে উত্তর এল, যাই।

সুকুমাব আগে লক্ষ্য করেনি। এখন চালাটা দেখে অবাক হ'ল। কৌতূহল নামল। চালার মাথায় কাঠের ক্রুশ আঁকা। তার পাশেই লালঝাণ্ডা উড়ছে। সুকুমার প্রশ্ন করল, এটা কি?

নিবারণ বিশ্বাস মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেল। ওর জ্বালাতেইত মরলাম। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েও নিস্তার নেই। কুলাঙ্গার।

কে সে?

জ্যোৎস্নাময়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। এই এর ভাই? লোকে আবার ছেলে চায়। মেয়েই ভাল। জ্যোৎস্নাময়ী বাড়ির দিকে চলে গেল। নিবারণ বিশ্বাস আবাব বললেন, জ্যোচ্ছনাও দেখতে পারে না ওকে। পারবে কেন? খৃষ্টান হয়ে শয়তানেব বুলি আওড়ে বেড়ায়। ওই উষা গেবামের ভীমপদা হ'ল ওর সঙ্গী।

চালা থেকে উপেন শিকদাব বেরিয়ে এল। পিছনে কালরঙের এক যুবক। সে সোজা এগিয়ে এল সুকুমারেব সামনে। ভনিতা নেই। প্রশ্ন কবলে, আপনিই কলোনী অফিসার?

হুঁ।

নিবারণ বিশ্বাস বিবক্তি প্রকাশ করলেন। ঝামেলা বাদ দিন। সন্ধ্যে লেগে গেল। ফিরে যান। তিনি নিজেও ভিতরে চলে গেলেন।

তিনজনে পথে নেমে এল। উপেন শিকদার বললে, এই হচ্চে নিবারণ খুড়োর নাতি।

যুবক বললে, হ্যাঁ। আমার নাম, জেমস্ গোবিন্দলাল ছিল দেশ-ভাগের আগে। এখন হয়েচে কমরেড গোবিন্দলাল।

সুকুমার হাসল। গোবিন্দলাল বললে, সত্যি। ব্যাপটিজমের সময় জেমস্ নাম হয়েছিল। ইংরেজ আমলে তার দাম ছিল খুব। কিন্তু এখন? ওতে ফল নেই। প্রজাতন্ত্রী ভারত। তাই নতুন করে ব্যাপটাইজড হতে হল। জেমস্ থেকে হলাম কমরেড। আমি প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান। প্রটেষ্ট্যান্টদের কাজই হল প্রটেষ্ট করা। যুগে-

যুগে অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে মানবতার হয়ে প্রচেষ্ট করেই যাব। কথা শেষ করে নিজেই হাসল সে। তারপর প্রশ্ন করল, আচ্ছা, বুড়োটা কি বললে? সুকুমার ওর মুখের দিকে তাকাল। গোবিন্দলাল বললে, বুড়ো মানে আমার দাদু। নিশ্চয়ই কিছু বলেচে। অবশ্য ভয় করিনে তাতে। শুধু পাদরীদের ধামাধরে বেড়ায়। খৃষ্টান ছাড়া দুনিয়ায় কেউ ভাল নয় ভাব। ওসব চলবে না। কথা শেষ করে থমকে দাঁড়াল। আচ্ছা, আপনাদের কলোনীতে কত ঘর লোক এয়েচে?

সুকুমার বললে, পঞ্চাশ ঘর।

চাষী কত ঘর?

পঁচিশ।

জেলে?

পনের ঘর। বাকী দশ ঘর ব্যবসায়ী—তাঁতি, মুদী, কর্মকার।

বা'। বেশ। একদিন তাহলে যাব আপনার কলোনীতে। ঝাণ্ডা নিয়ে যাব কিন্তু।

সত্যিই গোবিন্দলাল একদিন বন্দীপুরে এসে গেল। পুরোভাগে লালঝাণ্ডা কাঁধে গোবিন্দলাল পিছনে জন কুড়ি মানুষের একটা দল। পিঁপড়ের সারির মত বিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে এল। পুলের ওপর উঠল। তারপর সারি বেঁধে এসে কলোনীর সামনে দাঁড়াল। ধ্বনি দিয়ে উঠল, ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ্‌।

তখন বিকেল বেলা। কলোনীর সবাই তাঁবুর আশেপাশে ছিল। এগিয়ে এল। গোবিন্দলাল সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াল। বক্তৃতা আরম্ভ করল। বোঝাতে লাগল তাদের আগমনের কারণ। বক্তৃতা শেষে আলোচনার রূপ নিল। কিন্তু উদ্বাস্তুরা মিলতে পারে না কিছুতেই।

সাধুচরণ বললে, আপনারা ঈশ্বর মানেন না। হিন্দুরা যার জন্যে দেশ ছাড়ল তাই জানেন না আপনারা।

গোবিন্দলাল বললে, আমরা কিন্তু অন্যরকম ভাবি। দেশময় যদি ধর্মের গোঁড়ামি না থাকত তাহলে আর কাউকেই দেশ ছাড়তে হত না।

শ্রীমন্ত আইচ বললে, ওসব রাজনীতির মধ্যে আমরা নেই। নতুন এসেছি। সরকারী সাহায্য আর ঋণের ওপর নির্ভর। রামবাবু জমি দিচ্ছেন। আমরা এখন মাথা গুঁজে বাঁচতে চাই। অনেক ভুগেছি।

গোবিন্দলাল তবু বোঝাবে। বললে, ভুগচি আমরাও কম নয়। দেশে-ঘরে থাকলেও এদেশের অনেক মানুষই আপনাদের মতোই ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, জীবিকাহীন বেকার। ধনীর আর জমিদারের শাসন জর্জরিত। কাজেই দু'পক্ষেরই সমস্যা এক। তাই যদি আমরা সংঘবদ্ধ হই তাহলে একদিন সত্যিকার স্বাধীন হতে পারব। নইলে জেলের জাল শুকোবে, চাষীর লাঙল যাবে বিক্রী হতে! তার ফাঁদই চারিদিকে পাতা।

গৌরীশংকর হেসে উঠল। মন্তব্য করল, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

সাধুচরণ শেষবারের মত বলে উঠল, যদি আমাদের মঙ্গল চানতো আর আসবেন না।

উদ্বাস্তুরা হেসে উঠল। গোবিন্দলাল প্রতিবাদী হয়ে উঠল। না, ও কথা বলবেন না। আজ যারা জাগল না, কাল তারা জাগবে। আমরা আশাবাদীরা তাই আবার আসব, বার বার আসব। আপনাদের ডাকব। কারণ আপনাদের যে আমাদের মধ্যে চাই। কারণ আপনাদের জাগরণে আমাদের মঙ্গল। সমস্ত মানুষের মঙ্গল। এমন কি আপনাদের শত্রুদেরও মঙ্গল হবে। সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে তারাও রক্ষা পাবে। ওদের মূঢ়তা আশ্রয় পাবে। গোবিন্দলাল তার নতুন শেখা বুলিগুলো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সবাই মিলে জাকার দিয়ে উঠল ওরা, ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ্।

সুকুমার তখন ডাক্তারখানার পাশে দাঁড়িয়ে। ওর পাশে জাবেদার ভাই সামাদ।

কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে দু'দিন ধরে। বোশেখের উত্তাপ কিছুটা কমেছে। আউসের জমিগুলো চাষের যোগ্য হয়ে উঠছে। ডাক্তারখানার পাশের পতিত জমিটার ওপর লাঙল চালাচ্ছিল সামাদ। সুকুমার তার পাশ দিয়ে কলোনীতে যাচ্ছিল।

কাছাকাছি হতেই সামাদ কাছে ছুটে এল। বাবু ছ্যালাম।

সুকুমার থমকে দাঁড়াল। এই তোমার জমি?

জী। হ্যাঁ। এইটুকুন সম্বল। নিজের লাঙল-গরুটা পরের জমিতে বেচে খাই। আর অবসর সময়ে এই জমিটুকুন চষি।

প্রসঙ্গ পাল্টে সুকুমার বললে, শরীর কেমন? ইন্‌জেকশানেই কাজ হয়েছিলত?

সামাদ হাসল। ইঞ্জিশান্—হুঁ—একি আপনাদের ওগবালাই? সাতখানা! একটা ইঞ্জিশানে কি যায়? বেশি ইঞ্জিশানের পয়সাই বা পাবু কুতায়? পরের দুয়োরে খেটে খেয়ে মানুষ আমরা—

সুকুমাব বললে, কিন্তু ছোট ডাক্তারবাবু যে বললেন সারাবই।

হুঁ। উনি বড্ডা ভাল নোক। গরীব মানুষ, মোচলমান বলে একটুও হেনস্তা করেন না। ধারে-দেনায় ওষুধ দেন। কথা বুলে সাহস দেন। কেন্তুক বাবু, ওগবালাই সবই কি উনার কতা শোনে? উনার খাস-তালুকের পেরজা?

তবে এ রোগ সারে কিসে?

নাতি খাতি। কেরমে কেরমে।

আশ্চর্য অন্ধবিশ্বাস। রোগে ভোগে। চড়া দাম দেয় ওষুধের। ডিষ্টিক্টওয়াটার ইনজেকশান নেয়। বলে সবই রোগের দোষ। শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে রোগ বীজাণুকে পরাজিত করে বলে নাইতে খেতে সবই সেরে গেছে। সুকুমার অবাক হয়ে শুনছিল আর ভাবছিল।

লাঙলের দিকে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছে সামাদ বললে, বাবু ছিচরণে এট্টু ঠাঁই দেবেন আমাদের। সুকুমার অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠল। সামাদ আবার বললে, এজ্ঞে কি সব শুনচি। নোকে বুলচে।

কি বলছে।

এই রিফুজি এয়েচে। কলোনী হচ্চে। বুলে মোচনমান আর রাখবে না এ-দিগরে। গরীব মানুষ। আধপেটা খেয়ে থাকি। এই জমিটুকুন সম্বল। এই ধানডা হলে বছরান্তে কিছু সাচ্ছিরায় হয়। এবার বুলে এ-ফসল আর ঘরে নিয়ে যেতে দেবে না কলোনী থেকে?

সুকুমার বলে উঠল, বাজে কথা। দৃঢ়স্বরে বললে, তোমার ধান ওরা নেবে কেন? ওরা কি লুট করতে এসেছে?

হুজুর—। দুপা এগিয়ে এল সামাদ।

সুকুমার অভয় দিল। ওরাও মানুষ। তোমাদের মধ্যেই বাস করতে এসেছে। আর আমি যতদিন আছি।

হুজুর—এবার একান্ত অসহায়ের মত সুকুমারের হাত দুখানা সামাদ চেপে ধরল। দোহাই হুজুর। আমাদের কেউ নেই, বড্ডা গরীব।

ধু-ধু মাঠ। অনাবৃত দিগন্ত। মাথার ওপর মুক্ত আকাশ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন অসহায় মানুষ আরেকজন ক্ষমতা প্রাপ্ত মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ঠিক সেই সময়ে বাতাসে ভেসে এল মিলিত কণ্ঠের হুংকার। ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ

সুকুমার ঘুরে দাঁড়াল। দেখল একটা লালঝাণ্ডা—আর একদল মানুষ সার বেঁধে বেরিয়ে যাচ্ছে কলোনী থেকে। সামাদ বললে, ওই দুল্লুবপুরের নিবারণ বিশ্বাসের নাতির দল।

—সুকুমার ছুটল।

গোবিন্দলাল যখন কলোনীতে, রামবাবু তখন নবীনদের তাঁবুতে। ওরা চলে যেতেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। উদ্বাস্তুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, ওরা জাতির শত্রু। লাল-ঝাণ্ডাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ। তোমরা ওদের সঙ্গে মিশোনা। লোন পাবেনা তাহলে। আর ওরা কেমন করে এখানে এসেছে জানো? ওই কলোনী অফিসার বাড়ি গিয়ে আলাপ করে ডেকে এনেছে গোবিন্দলালকে। ও দালাল। তাই ঠাকুরদালান থেকে উঠিয়ে দিয়েছি।

উদ্বাস্তুরা হাঁ করে শুনছিল। গৌরীশংকর মাঠের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওইতো উনি আসছেন।

রামবাবুর বক্তৃতা থেমে গেল অমনি। স্থান ত্যাগ করার আগে বলে গেলেন, ওই আসছে। ওর মুখ দর্শনও পাপ।

সুকুমার আসতেই উদ্বাস্তুরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

গৌরীশঙ্কর বললে, লালঝাণ্ডারা এসেছিল। দলে যোগ দিতে বলে

শ্রীমন্ত আইচ বললে, দেখুন দিকি কাণ্ড।

জগন্নাথ মণ্ডল বললে, শালাদের গণ্ডগোলের মতলব।

সাধুচরণ বললে, নাস্তিক হতে যাব কি দুঃখে।

শ্রীমন্ত আইচ বললে, রামবাবু তাই বললেন, তোমাদের অফিসারকে দিয়ে থানায় একটা খবর দিয়ে রাখ। আর যাতে ওরা কলোনীতে না ঢোকে তারজন্যে নিষেধ করতে বল—অফিসারকে।

অসম্ভব যুক্তি। সুকুমারের মনে হল, কলোনী অফিসার কি গারদখানার পাহারাদার? উদ্বাস্তুরা কি কয়েদী? সুকুমারের চোখের সামনে আসে একটা দুরাগত ছবি। একদল আশ্রয়চ্যুত মানুষ এসেছে নতুন করে আশ্রয় গড়তে। সে ভার পেয়েছে তাদের আর্থিক সাহায্য করার। আর অতি সাময়িকভাবে তাদের চাওয়া পাওয়ার দিকে পক্ষপাতহীন দৃষ্টি রাখার। তারপর এই আশ্রয়চ্যুত বিপন্ন মানুষের দল একদিন তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এই স্বাধীন মানুষের মেলামেশার মধ্যে সুকুমারের হস্তক্ষেপের অধিকার কোথায়? গোবিন্দলালকে আসতে নিষেধ করবে কেমন করে? রামবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কি পারেন এ-এলাকায় তার বসবাস নিষিদ্ধ করতে?

মনের কথাগুলো সুকুমার গোপন রাখতে পারল না। বলে ফেলল, ভেবেছিল সুফল হবে এতে। বিপরীত ফল হল।

গৌরীশঙ্কর বলে উঠল, স্যার, রামবাবুতো বলছিলেন, আপনিই নাকি ডেকে এনেছেন ওদের?

রাত্রিবেলা সুকুমার কলোনী থেকে ফিরল এক নিবিড় মানসিক উত্তেজনা নিয়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে রামবাবুর শত্রুতার নেশা সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে।

উত্তেজনা থাকলে আহারে রুচি হয় না। খেতে বসে খেতে পারল না। ভূপালবাবু পাশে বসে খাচ্ছিলেন। ডাক্তার মানুষ। বললেন,

শরীর খারাপ করছে ?

হ্যাঁ। কেমন করছে।

কি রকম করছে ?

ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। একটা অস্বস্তি। এর বেশি সব কথা সকলকে বলা যায় না। যতই ভালোমানুষ হন্ তবু ভূপালবাবু রামবাবুরই আত্মীয়। না খেয়েই প্রায় সুকুমার বৈঠকখানার আশ্রয়ে চলে এল। ভূপালবাবুও এলেন তার পরেই। সুকুমারকে ওষুধ দিলেন, অগ্নিমান্দ্য, পরিশ্রম জনিত অসুখের প্রতিষেধক। বললেন, রাত জাগবেন না। শুয়ে ভালমতো ঘুম দিন একটা।

কিন্তু সুকুমারের কাছে সে রাত্রি প্রায় বিনিদ্র হয়ে উঠল। শোবার আগে, আলো নিবিয়ে দেবার আগে ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিচ্ছিল। দৃষ্টিটা আটকে গেল পাশের বেঞ্চিটার ওপর। সেখানে তার সাজানো সংসারটা কে যেন নাড়াচাড়া করেছে। একখানা বই কেমন যেন ফুলে উঠেছে মাঝখান থেকে। কেন ? কে নেড়েছে বইগুলো এমন করে ? সুকুমার বিরক্তি নিয়ে উঠে বইখানা টেনে আনল। সেখানা খুলতেই বারহোল একখানা নীল খাম।—চিঠি।

নিশুতি পল্লী। দক্ষিণের-বাশঝাড়ে-হাওয়া লেগে শব্দ উঠছে ফট্ ফট্ কোঁ-ওঁ। উত্তরে রাস্তার মোড়ে বটের শাখায় বেজে উঠেছে পাখীর পাখার ঝটপটানি। আর ভেসে আসছে ঝাউপাতায় শন্ শন্ হাওয়ার গান। ঘরের টেবিলল্যাম্পের মৃদু আলোয় সুকুমার চিঠি পড়ল। খুকু চিঠি লিখেছে। লজ্জায় সংকোচে ভেঙে পড়েছে। বাবার ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়েছে বাবার হয়ে।

রামবাবুর মেয়ে খুকু। রামবাবুর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগল সুকুমারের চোখের সামনে। রামবাবু তাকে অপদস্থ লাঞ্ছিত করবার সুযোগ সন্ধানী। রামবাবুর পাশে খুকু যেন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দুর্বল। ব্যক্তিত্বহীন। হ্যাঁ। সেতো একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলোনীতে যেতেও রাজী হয়নি সুকুমারের সঙ্গে। সেই খুকু।

চিঠির জবাব চেয়েছে খুকু। ডাকযোগে নয়। চিঠি হাতে চলে

যেতে হবে ওদের খিড়কী পথের ধারে। জনবিরল পথ। কচা আর জিওল গাছের ঝোপ শুধু। তার মধ্যে আছে একটা কাঁঠাল গাছ। তার গুঁড়ির কোটরে রেখে আসতে হবে জবাবী চিঠি।

না। কোন চিঠি দেবেনা সে। সুকুমার সিদ্ধান্ত করে ফেলল।

কিন্তু ঘুম এল না ওর চোখে। সারারাত ধরে। শেষে ভোর হতে না হতেই, অন্ধকার থাকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পায়ে পায়ে খুকুদের খিড়কীর দিকে চলে এল। সেই কাঁঠালতলা। অথর্ব কাঁঠাল গাছ। তার একটা ফোকর আছে। এখানে খুকু আসবে। চিঠির জবাব খুঁজবে। তারপর? মুহূর্তে সুকুমারেব মনটা কেমন নরম হয়ে গেল। ভাবালুতায় ভরে উঠল। পুরনো স্মৃতি পেয়ে বসল। কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একটা বেজী চলে যেতেই সুকুমার চমকে উঠল। ভয় পেয়ে দ্রুত পথে নেমে এল। সকাল হয়ে গেছে। সব সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এক মুহূর্তেই। যদি কেউ দেখে ফেলে?

খুকুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না। অনেক আশা নিয়ে সুকুমারকে চিঠি দিয়ে এসেছিল। তারপব থেকে কাঁঠালতলায় হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেল। ব্যর্থতাব একবুক চাপা কান্নায় ভরে উঠল। উদগ্র যৌবনের কান্না। শতমুখী সম্ভাবনার কাঙালপনার কান্না! সেই কান্না নিয়ে সে বিছানায় পড়ে ধুঁকছিল।

রামবাবু দরজায় এসে ডাক দিলেন। তিনি কলোনীতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের কাছে শুনেছেন সুকুমারের ওই গোবিন্দলালদের সম্পর্কে মন্তব্য। শুনেছেন, সুকুমারের সেই উক্তি—সেই মনোভাব—স্বাধীন নাগরিক উদ্বাস্তু তাদের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপের প্রস্তাবের প্রতিবাদের কথা। এত তাঁকেই অপমান করা হয়েছে। উত্তেজিত হয়ে তাই উদ্বাস্তুদের সাবধান করে বলেছেন, ও হচ্ছে লালঝাণ্ডার দালাল। তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। তারপর তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন সুকুমারের সমস্ত দম্ভ, আত্ম-মর্যাদাবোধকে ব্যর্থ করে দেবেনই।

আর তার জন্যেই দারোগাবাবুর কাছে যাওয়া দরকার। তাঁকে একবার পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে বলে আসা উচিত। তাই মেয়ের দরজায় এসে ডাকলেন, খুকু। খুকু চমকে উঠে বসল। মেয়েকে দেখে রামবাবুও চমকালেন। খুকুর আলু-থালু বেশ। রুক্ষচুল। শুকনো মুখ। তিনি প্রশ্ন করলেন, অসুখ সারেনি এখনো? ওষুধ খাসনি?

খুকু ম্লান হেসে বললে, অসুখতো নেই।

তবে? চান করিসনি বুঝি?

হ্যাঁ। মাথা নাড়ল খুকু। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

রামবাবুর অত লক্ষ্য করার সময় নেই। বললেন, শোন, কাপড় পরে তৈরী হয়ে নে। থানায় বড়বাবুর বাসায় যেতে হবে। তাঁর শালার বৌ এসেছে কলকাতা থেকে। তোকে নিয়ে যেতে খবর দিয়েছেন। এখানে মেশার লোক পাচ্ছে না।

খুকু প্রতিবাদ করল না। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। রামবাবু বলে উঠলেন, শুকনো মুখটা একটু ভিজিয়ে নিস্। তোদের স্নো পাউডার মাখিস টাকিস একটু। অমন করে যাসনে।

শুধু দারোগাবাবুই নয়। কলোনী অফিসার-এর কাছেও রামবাবু অভিযোগটা পৌঁছে দিলেন কৃষ্ণনগর গিয়ে। লালঝাণ্ডাদের কলোনীতে আসা বন্ধ করতেই হবে। সুকুমারের দাপটকেও ভাঙতে হবে।

কিন্তু গোমস্তা হাবুল কর্মকার সংশয় প্রকাশ করল। ঠাকুরবাড়িতে বসে রামবাবু তাঁর এই সব পরিকল্পনার কথা শোনাচ্ছিলেন। হাবুল কর্মকার বললে, দারোগাবাবু থাকে থানায়, আর কলোনী অফিসার কেষ্টনগরে। তাঁরা কি দুবেলা কলোনী দেখতে পারবেন? তাছাড়া এটা হচ্ছে কলোনী—পল্লী বিশেষ। মানুষ নিয়ে কারবার। মানুষের মন—সে যদি একবার অন্যদিকে চলে যায়—

কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ পাশে বসে ছিলেন। বলে উঠলেন, তা হবেনা সহজে। গোবিন্দলাল খৃষ্টান। যীশু—ভগবান। তাও মানে না! নাস্তিক। ঝাণ্ডাওয়ালা। বিদেশীর চর। ওকে মানবে কেন এই হিন্দুরা? পাকিস্থান থেকে চলে এল যে ভয়ে সেই জাতধর্ম

খোয়াবে এখানে ? সোজা ত নয়। সনাতন ধর্মকে কে ছাড়তে চাইবে ? আর এ-ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মের দেশ। ভগবান আর ভক্তি এখানে বিশ্বাসের ডোরে বাঁধা। ভগবানই বলেছেন, এখানে অধর্ম এলেই তিনি অবতীর্ণ হবেন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে। কাজেই এদেশের মানুষকে ধর্ম থেকে টলাতে পারবে না কেউ।

হাবুল কর্মকার অত উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, তবু কথা কি জানেন, মানুষের মন হচ্ছে একটা আজব বস্তু। ওকে বিশ্বাস করা দায়। এই যে দেশ জুড়ে মুসলমান, খৃষ্টান এরা কি আরব আর বিলেত থেকে এসেছে ? স্রেফ আমাদের হিন্দুর রক্ত। কাজেই ঢিল দিয়েছেন কি ঠকেছেন। এই হচ্ছে রীতি। কাজেই আমার মতে মানুষকে সকল সময় ধর্মের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা ভাল। অন্যদিকে মন দেবার ফুরসুৎ পাবে না।

খাঁটি কথা। ঠিক ! রামবাবুর চোখে আলো জ্বলে উঠল। বললেন, হেবলো কি করা যায় তাহলে ?

হরিমোহন দাঁ বললেন, এ হচ্ছে নদীয়া। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি। এখানে নাম কীর্ত্তনই পথ। নামে রুচিই বড়। মন্ত্র নয়। পূজা নয়। শুধু নাম গান।

না। হাবুল কর্মকার বাধা দিল। আমি একটু ভেবে নিই। মনে হচ্ছে শুধু ওতে হবে না। আরও দরকার। কাল সকালে বলব।

পরদিন সকালে হাবুল কর্মকার রামবাবুর সঙ্গে কলোনীতে এসে হাজির হল। হাবুল কর্মকারের পরণে মটকার কাপড়। কাঁধে গামছা। কৌতূহলী উদ্বাস্তুরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। রামবাবু হাবুল কর্মকারকে বললেন জায়গা বুঝতে পারছ ?

হ্যাঁ। এই তো। কলোনীর ঠিক মাঝামাঝি থেকে উত্তর দিকে—এই—বলে হাবুল কর্মকার একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। এইখানে—। বসে পড়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

রামবাবু উদ্বাস্তুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরাত সব নাস্তিক হত্তে যাচ্ছ। আর দেখ দিকি কাণ্ড। কাল রাতে ভগবান ৺: ঋাপাল

বিগ্রহ স্বপ্ন দিয়েছেন হাবুলকে। বলেছেন, ওরা সব আমার সন্তান। দুর্গত। এখানে আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু আমাকে স্মরণ করে না। আমি তাই বলেত দূরে থাকতে পারিনে। এইখানেই আশ্রয় নিলাম। তাই রোজ এই জায়গাটায় একটু গঙ্গাজল, ধূপধূনা আর সন্দেবেলায় পিদীমটা দেবার ব্যবস্থা করিস। হাবুল কর্মকার চাবটে কাঠি কুড়িয়ে চারটে খুঁটি পুঁতে সীমানা গড়ে দিল,—এইখানে তাঁর অধিষ্ঠান হয়েছে।

এইখানে? —সাধুচরণ তাঁবুব দিকে ছুটল। একটা দড়ি নিয়ে এসে খুঁটি চারটে বেঁধে সীমানা গড়ে দিল। সবাই খুসী। সবাই শুভ সম্ভাবনায় আশান্বিত। রামবাবু মন্দিরের পুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। গঙ্গাজল ছিটিয়ে সুদ্ধ করতে হবে।

শুধু কি তাই? কলোনীর মেয়েরা শংখ বাজাল, উলু দিল, গঙ্গাজল ছিটোবার সময়—আহা এত ভাগ্য! দেশ ছেড়ে, কত কষ্ট পেয়ে তবে এখানে আশ্রয় নিতে এসেছে। এখানে তাদেরই পাশে এসে বসলেন স্বয়ং ভগবান?

রারবাবু এটাই ত চেয়েছিলেন। —না। এর চেয়ে আরও গভীর উদ্দেশ্য তাঁর। উদ্বাস্তুদের বললেন, এটা নদীয়া আর বোশেখ মাস। এ মাসটা এখানে তোমাদের রোজ সন্দেবেলা নামকীর্ত্তন করা দরকার।

রামবাবুর প্রস্তাবে গদগদ হয়ে উঠল উদ্বাস্তুরা। বিশেষ করে সাধুচরণ আর শ্রীমন্ত আইচের মত প্রবীণেরা। কিন্তু গৌরীশংকর যুবক। ধীর প্রকৃতির। সে বললে, কীর্ত্তনের খোল করতাল পাবো কোথায়? রামবাবু হেসে উঠলেন।

হাবুল কর্মকার বললে, ঘোড়া হলে চাবুকেব অভাব? তোমরা রাজী থাকলে আমাকেই করতে হবে। প্রভু আমাকেই যখন কৃপা করেছেন।

রামবাবু বললেন, খোলকরতালের জন্যে এতো ভাবনার কি আছে? আমি কি মরেছি? টাকা দিচ্ছি। নবদ্বীপ থেকে কিনে আনোগে।

জাবেদার ভাই সামাদের জমি কলোনীর খানিক দূরেই। বৃষ্টির

পর জমি চাষ করে যে ধান বুনেছিল তার অঙ্কুর হয়েছে। কচি ধানের অঙ্কুর কি সুন্দর। চাষীর চোখে, সন্তান—আপন সন্তান। সামাদ দুবেলা তাদের দেখতে আসে। বিকালে আসে খেয়ে দেয়ে, সন্ধ্যার আগে আগে। সেদিনও তাই এসেছে। আকাশের সূর্য পশ্চিমে অস্তগত তখন। তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে রঙের সমারোহ নিয়ে। খানিক পরেই অন্ধকারের ছায়া নামল পৃথিবীতে। তখন সামাদ তার নিয়ম মত বসে পড়ল মাটিতে। নামাজ করতে।

সামাদ নামাজ করছিল। হঠাৎ মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে তার তন্ময়তা কেটে গেল। চম্‌কে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল কলোনীর দিকে। একদল মানুষের জটলা—ওই যেখানে নাকি স্বপ্ন দিয়ে এসে অধিষ্ঠান হয়েছে। আর খোলের শব্দ। করতাল বাজছে। কীর্ত্তন হচ্ছে। সুরটা কীর্ত্তনের মত নয় কোনকালেই। বাজনাটাও। দুটোয় মিলিয়ে বেশ একটা মোলায়েম গান। শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু নামাজ? তাড়াতাড়ি কর্ণরন্ধ্রদুটো আঙুল দিয়ে জোর করে চেপে ধরল।

পরদিনও সামাদ কীর্ত্তন শুনল। তারপর দিনও। রোজই। শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। পীঠস্থানকে ঘিরে কলোনীর মানুষেরা কীর্ত্তন চালাচ্ছে সারা বোশেখ মাস ধরে চালাবে। বোশেখ মাস পুন্যিমাস ওদের।

কিন্তু সামাদ একদিন শুনল অনেক নতুন কথা। দেখল গরুর গাড়ী করে ইট আসছে কলোনীতে। তাহলে দালান তুলবে রিফুজীরা। গাঁয়ে জমিদার বাড়ী ছাড়া আর দালান নেই। এবার ওরা দালান তুলবে। সরকারী ধান পাবে ওরা। বড়লোক হয়ে যাবে। জমিদারের সমান হবে। দলের মানুষ। তাহলে, এখন কি আর গাঁয়ে ঘরে থাকতে পারবে তাদের মত গরীব মানুষের দল? সামাদ আপন মনেই শিউরে উঠল। ধানের ক্ষেত থেকে পথে নেমে এল। ইটের গাড়ী আসছে। তার পাশে গেল। হাগো হরিদা—এ ইট কলোনীর? দালান করচে নাকি সব?

নাগো। ওঃ। উড়ে এসে বসে আবার দালান। বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করে হাসল হরিপদ গাড়োয়ান। হেসে বললে, কলোনীতে মুন্দির হবে।

মুন্দির ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ৺গোপাল ঠাকুর হাবুল কামারকে স্বপ্নে যে খানডা দেখিয়েচেন, সেই খানডায় মুন্দির উঠবে। গাড়োয়ান হরিপদ, গাড়ী নিয়ে এগিয়ে চলল। সামাদ আশ্বস্ত হয়ে ক্ষেতের দিকে ফিরে গেল আবার।

দেবতার শ্রীচরণেই মানুষের আশ্রয়। সেই দেবতা নিজে এসে আসন পেতেছেন কলোনীতে। তাঁকে সম্মান দেখালেই সৌভাগ্য আসবে। তাই কলোনীর মানুষ রামবাবুর সঙ্গে মিলে দ্রুত মন্দির গড়ে তুলছে। সুকুমার এখানে দর্শকমাত্র। সে নীরবে দেখে যায়, কলোনীর মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে মন্দির গড়ে উঠছে। প্রায় সমাপ্তির পথে। সে শুনেছে এ মন্দিরে ৺গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে।

একদিন কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ, আরও একটা নতুন খবর শোনালেন। হরিমোহন দাঁ আজকাল সুকুমারকে এড়িয়ে চলেন। সেদিন বিকেলবেলা মাঠে মুখোমুখি দেখা। কাজেই হেসে নমস্কার করলেন। হাতে পুঁইশাক দেখিয়ে বললেন, সেই জাবেদা—আজও ওষুধের দাম দিল না। তাই তাগাদার ভয়ে এটা দিল মুখবন্ধ করতে। মহামুস্কিল। এখন দেখি প্রাণরতন হালদারকে। ওর ছেলেকে সেদিন সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়ে তুললাম। ওকে বলি, যদি ঠেলা জালটা ফেলে বিল থেকে দুটো চিংড়ি তোলে........

বিরক্তিকর। সুকুমার পাশকাটাতেই ডাকলেন আবার, মন্দিরতো হয়ে এল। এই সংক্রান্তিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবেন। হৈ চৈ ব্যাপার। আপনাকেওত ব্যস্ত থাকতে হবে।

কেন ? আমার কি ?

আপনারইত ওপরওয়ালা আসছেন। রামবাবু কালকেই নেমন্তন্ন করে এসেছেন সব। সবাই আসছেন। রিলিফ অফিসার। দেশ-নেতারা, আরও কতজন। তাঁরাইত মন্দির-এর দ্বারোদ্ঘাটন করবেন।

সুকুমার উদ্বাস্তুদের কাছেও শুনল, রিলিফ অফিসার এসে দেখে খুব তুষ্ট হবেন। আর তাহলেই লোনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

রামবাবু ভূপালবাবুর বাড়িতে আবার গিয়েছিলেন। হেমলতার

কাছে বলেছেন, মন্দির করে এত খরচাপত্তর করতে হত না আমাকে। শুধু তোরা যদি ওই সুকুমারকে পাত্তা না দিতিস। আত্মীয় হয়ে আমার কথা শুনলিনে। ঠিক আছে। আমিও দেখছি। তারপর তিনি জানিয়ে গেছেন অফিসারদের আসবার কথা।

রাতে সুকুমার ফিরতেই ভূপালবাবু হাসতে হাসতে বললেন, গোঁসাই রামমামা যে আপনার বাবার বাবাদের আনছেন। অফিসার আর দেশনেতাদের। এই সংক্রান্তির দিন। আবার বৌকে বলে গেছেন, নেতাদের দিয়ে কি করাই দেখে নিস্। এই আমারই হাতে তাদেব মরণ বাঁচন। সামনে ভোট। তারা জানে—এ রাম মণ্ডল লীগ থেকে লালঝাণ্ডা দরকার হলে সব হতে পারে।

ভূপালবাবু আবার হাসলেন। সুকুমার হাসল না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক হীন ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। শুধু তাকে নয়, সমস্ত গ্রাম, গ্রামের পরিবেশকে নিয়ে সে ষড়যন্ত্রের লীলা। রামবাবু একজন সেবাব্রতী, দেশসেবক, দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতার রক্ষক!

•

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন উৎসাহ উদ্দীপনায় কলোনীর মাঠ ভরে উঠল। আশপাশের দশখানা গ্রামের মানুষ এসে জমল। অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন আরম্ভ হল সকাল বেলাতেই। হাবুল কর্মকারই এ উৎসবের প্রধান। ভগবান তাকেই স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। তাই সে মটকার কাপড়, মটকার চাদর গায়ে জড়িয়ে কীর্ত্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে।

কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ সকালের দিকে একবার নাচলেন। চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। খানিক পরে চোখ মুছে রামবাবুর ঠাকুর বাড়ির দিকে চলে গেলেন। সুকুমার কলোনীর ভার প্রাপ্ত কর্মচারী। তারপক্ষে এ উৎসব থেকে একেবারে সরে থাকা শোভন নয়। করনীয়ও কিছু নেই। কাজেই কলোনীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছিল। ব্যস্ত সাধুচরণ একবার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে উঠল, কেমন দেখছেন স্যার? সুকুমারের পাশে ভূপালবাবু ছিলেন। বললেন,

বেশ। এ শেয়াল ডাকা, সাপখোপের জঙ্গলে এমন হবে ভাবিনি।

সাধুচরণ খুব খুশী। বললে, তাহলে কলোনী হয়ে লক্ষ্মীশ্রী ফিরল বলুন গাঁয়ের ?

নিশ্চয়। মানুষত লক্ষ্মী।

ঠিক। সাধুচরণ আবেগে বললে, জমিদারবাবুও তাই বলছিলেন। মানুষকে খাইয়ে ফতুর হয়েও সুখ। মানুষকে মর্যাদা দেন খুব।

ভূপালবাবু সুকুমারের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন।

বেলা এগারটা নাগাদ হরিমোহন দাঁ কলোনীতে এসে খবর দিল, অতিথিরা এসে গেছেন সব। শিগগির সব ঠাকুরবাড়িতে চল।

এসে গেছেন! অতিথিরা! হাকিম! নেতা! জনসমাবেশটা মুহূর্ত্তে উল্লসিত হয়ে উঠল। কীর্ত্তনীয়াদের নাচের মাত্রা বেড়ে গেল। খোলবাদকের উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে খোলের বাজনা বুজতা-বুজাং, বুজাং-বুজাং—সেই সঙ্গে সম্মিলিত গায়কের আকাশ ফাটান নামগান—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হাবুল কর্মকার বললে, চল, সব এমনি করে গাইতে গাইতে ঠাকুর বাড়িতে চল। অতিথিদের নিয়ে আসতে হবে।

চারদিক থেকে রব উঠল, চল ভাই, চল, চল— !

খানিক পরেই অতিথিরা কলোনীতে এসে পৌঁছলেন। পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী নারী পুরুষের একটা দল কীর্ত্তন করে, শংখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে, অতিথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন সমারোহ করে।

অতিথিরা জীপ থেকে নামলেন। জাতীয় নেতা কয়েকজন। কলোনী অফিসার। আরও কয়েকটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। কজন কনট্রাকটর আর ব্যবসায়ী। চাকুরীজীবী হিসাবে সুকুমারকে গিয়ে দেখা করতে হল কলোনী অফিসারের সঙ্গে।

অমনি রামবাবু ছুটে এলেন কলোনী অফিসারের সামনে।

আসুন স্যার। বসবেন। অবজ্ঞায় সুকুমারকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। সুকুমার পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন জাতীয় নেতা। প্রধান অতিথি হলেন সুকুমারের ওপরওয়ালা কলোনী অফিসার।

কষ্টি পাথরের ৺বালগোপাল প্রতিষ্ঠিত হল মন্দিরে। হামাগুড়ি দেওয়া দামাল শিশু গোপাল। নাড়ু তার বড় প্রিয়। তাই পরম পুণ্যক্ষণে শংখ-ঘণ্টা-বাদ্য আব অগণিত ভক্তেব সম্মুখে জাতীয় নেতা এসে ৺গোপালের হাতে একটা নারকেল ও তিল মিশ্রিত বড নাড়ু তুলে দিলেন। কী মধুব দৃশ্য। মুমুক্ষু মানুষের চোখে চোখে আনন্দাশ্রু।

এর মধ্যেই সুকুমার চমকে উঠল। খুকু কলোনীতে এসেছে। সঙ্গে ও কারা ?

দারোগাবাবুর শ্যালক শ্রীপতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী। সুকুমার চেনেন তাদের। ওঁরা তিনজনে এসে সভাব মধ্যে বসলেন। কৃষ্ণনগর থেকে আগত অতিথিদের মধ্যের চেয়ারে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে খুকু বসল। সুকুমাবের মনে পড়ল, এই খুকুই কলোনীতে আসতে চেয়েও আসেনি।

খুকু আজকেও আসতে রাজী হয়নি। শ্রীপতিবাবু আর তাঁর স্ত্রী ছাড়েননি। ওঁরা বিয়েব পব মধুচন্দ্রিকা করতে এসেছেন। উচ্ছ্বাসভরা জীবন। ওঁরা খুকুকে ছাড়লেন না। খুকুর মনের কথা শোনবার ধৈর্য তাঁদের নেই। নিজেদেব মনের উদ্বৃত্ত রঙ দিয়ে খুকুকে ভরিয়ে দিতে চান। শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী জোর কবে টেনে নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে কাপড় চোপড় পরিয়ে দিলেন। স্নো পাউডার মাখিয়ে দিলেন মুখে। দুহাতে খুকুকে বুকের মধ্যে টেনে মুখের ওপর চুমু দিয়ে বললেন, এমন মুখ লুকিয়ে রাখে কেউ? বোকা কোথাকার। পাঁচজনে দেখুক। জ্বলে পুড়ে মরুক।

ওরা জোর করে খুকুকে কলোনীতে ধরে আনলেন।

সুকুমার আর বসতে পারছিল না ক্ষোভে। উঠে পায়চারি করতেই খুকুর নজরে পড়ে গেল। খুকু প্রথমে সংকুচিত হল। তারপরেই অভিমান নামল মনে। দাম্ভিক মানুষ চিঠির জবাব দেয়নি। অন্যমনস্ক হবার জন্য খুকু শ্রীপতিবাবুর দিকে তাকাল। বললে, গ্রামে সভা কেমন দেখছেন ?

চমৎকার শ্রীপতিবাবু বললেন। পাশেই খুকু। সাগ্রহে কথা বলছে। একদিন আলাপ হওয়ার পর এমন অন্তরঙ্গ ভাব খুকুর দেখতে পাননি তিনি কোনদিন। শ্রীপতিবাবুর খুব ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আলাপ জমাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

হাসি, গল্প, অন্তরঙ্গতা। পাশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে খুকুর এমন ব্যবহারকে স্নকুমার লক্ষ্য করল দূব থেকে। খুকুর প্রতি সমস্ত সহানুভূতি মুছে গেল স্নকুমারের মন থেকে। ক্ষুব্ধ হল। এবং এরই প্রতিবাদে সভা ছেড়ে, উৎসব ছেড়ে, কলোনী ছেড়ে চলে গেল ভূপালবাবুর বৈঠকখানায়, গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কলোনী অফিসার স্নকুমারের দেখা না পেয়ে শেষে ভূপালবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন। ওপরে উঠে স্নকুমারকে ডাকলেন। স্নকুমার চমকে বিছানায় উঠে বসল। কলোনী অফিসার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে আপনার?

স্নকুমার ম্লান স্বরে বললে, শরীরটা ভাল নয়।

জ্বর হয়েছে ?

না। এমনিই - তেমন কিছু না। স্নকুমার হাসবার চেষ্টা কবল।

কলোনী অফিসাব একটু মৃদু হেসে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনলাম কেন ?

স্নকুমার মনে একটা ধাক্কা খেল। পরক্ষণেই জবাব দিল, অভিযোগ শুনবার জন্যেইত এত ঘটা করে ডেকে আনা হয়েছে—।

তার মানে ?

সবইত শুনেছেন। স্নকুমারের সমস্ত অভিমান যেন কলোনী অফিসারের ওপর গিয়ে পড়ল।

কলোনী অফিসার একটু নীরব থেকে বললেন, হ্যাঁ। শুনলাম সব। এই ঘরে আছেন। বেশ। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, আমাকেত জানাতে পারতেন। সেটা কি উচিত ছিল না ?

স্নকুমার বললে, অত সময় ছিল না তখন। তাছাড়া স্পষ্ট আইনের বাধার কথা আর কি জানাব ?

আইন, কলোনী অফিসার হেসে উঠলেন। আইন কিসের? আপনিত কেরাণী নন্। অফিসার। অফিসারের কাজ সাময়িক আইনকে মান্য করা নয়। স্থানকাল পাত্র ভেদে তাকে গ্রহণ বর্জন করে কাজে লাগানই অফিসারের কাজ। আইন থাকলেই তার ফাঁক থাকে। রাখতে হয়। কারণ আইনের প্রয়োগ বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

কলোনী অফিসারের কথার জবাবে সুকুমার বললে, ওই ফাঁক দিয়েই ফাঁকি কিন্তু বিপুলায়তন হয়ে ওঠে।

কলোনী অফিসার বললেন, তা নয়। আপনার এ চিন্তা একটু পুরনো। আমলাতান্ত্রিকতা আর নেই। এখন আমরা জনসাধারণের সেবক। সাধারণের স্বীকৃতিই আইনের শক্তি। যেটুকু তারা নেবে তাই টিকবে। বাকী সব অচল। রামবাবুই উদ্বাস্তুদের ডেকে এনেছেন। তিনি এখানে আমাদের মামুলী আইনের চেয় বড়। তিনি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, জমিদার, দেশকর্মী, জননায়ক—

সুকুমার বললে, না।

সুকুমারের প্রতিবাদের উত্তরে কলোনী অফিসার বললেন, কেন নয়? গণতন্ত্রসম্মত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে বসে আছেন তিনি। ভাল হোক আর নাই হোক, উনি নেতা। চিরকালই থাকবেন। কারণ করিত-কর্মা লোক। আপনি যাই ভাবুন, স্বাধীনতা সংগ্রাম পৃথক জিনিষ। রামবাবুর দল আজকের উপযোগী। তাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওঁদের বশে এনে ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া। অহিংসনীতিরই এই উদ্দেশ্য। বিপথগামী শক্তিকে ঘৃণা না করে ভালবেসে শুভ রূপান্তর ঘটানো।

কিন্তু দলে এলেই কি রূপান্তর ঘটে, ভোল পাল্টায়। আর তাই যদি হয় তবে সেত মারাত্মক ফলদায়ী। আত্মগোপনকারী অশুভকে বিশ্বাসের অর্থ আপাতঃ সংঘর্ষ এড়িয়ে বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সুকুমার যুক্তি তুলল।

কলোনী অফিসার ওর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনি তাহলে সত্যিই রাজনীতি করেন? সুকুমার চমকাল। উনি বললেন, লালঝাণ্ডাদের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ রাখেন?

সুকুমারের আত্মসম্মানে লাগল এবার। স্বাধীন সতেজ মনুষ্যত্বে লাগল। বললে, রাজনীতি আমি করিনে। কিন্তু রাজনীতি কী পাপ সাধারণ মানুষের কাছে? মহাভারতের কালত নয়। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত। মল্লযুদ্ধে নিষ্পত্তি হত। কিন্তু এখন প্রজারই প্রতিনিধিরা শাসক। আজ প্রজার জীবননীতি ও রাজ্যের রাজনীতি একীভূত।

কলোনী অফিসার বললেন, কিন্তু আমরা বেতনভোগী কর্মচারী। দল যাবে মত যাবে, আমাদের থাকতেই হবে। দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাজ করে যেতেই হবে।

তাতে আপত্তি করছে কে? কিন্তু তার বাকস্বাধীনতা থাকবে না? দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেও বাছ বিচারের প্রয়োজন যার সেত দেশের স্বাধীন নাগরিক? তার ভোটাধিকার কেন?

এ সব কূট তর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চান না কলোনী অফিসার। তাঁর সে তরল যৌবন আর নেই। পাকা চাকুরীর লোক। কিন্তু সুকুমারকে ভাল লাগল তাঁর। যেদিন প্রথম এখানে এনে রেখে দিয়ে গেছেন, সেইদিনই কৃষ্ণনগরে ফিরে স্ত্রীর কাছে সুকুমারের গল্প করেছিলেন। বলেছিলেন, ছেলেটি বেশ। নেহ'ৎ ভিজে যাওয়া বাদুড় নয়। একটা তাজা প্রাণ। ভাল সাহায্য পেলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা খুব।

আজও সুকুমারের বিরুদ্ধে রামবাবু যাই বলুন, তিনি বেদবাক্য বলে মেনে নেননি। তারপর সুকুমার এত তর্ক করার পরেও তিনি বিরূপ হলেন না। শুধু তাঁর মনে হল, সদ্য যৌবন প্রাপ্ত, সংসার অনভিজ্ঞ, আপন চিন্তায় নিষ্ঠাবান সুকুমার ভুগবে। নিশ্চিত ভুগবে।

সুকুমারকে তর্ক থেকে বিরত করতে তিনি বললেন, যাক্‌গে। ওসব তর্কে আর কাজ নেই ভাই। আপনি ছেলেমানুষ। আমার কথা শুনুন। রামবাবুর ওই পরিবারটিকে দেখলাম। ওদের পৃথক করে দেব না। তবে বুঝতেইত পারছেন, ওদের লোনের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দেব। আপনি চুপচাপ থেকে যান।

লোনের পরিমাণ বেড়ে যাবে নবীনদের? তারপর, সুকুমারের চোখের সামনে ভেসে উঠল, রামবাবু, হরিমোহন দাঁ, সাধুচরণ, গৌরীশংকর, শ্রীমন্ত আইচ, আরও অন্যান্য পরিবারগুলো। সুকুমার অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়াল। ক্ষুব্ধস্বরে বললে, বেশ, আপনার সিদ্ধান্ত মতই কাজ করুন। কিন্তু আমি তার আগেই চলে যেতে চাই। আজই আমি পদত্যাগ করে দিচ্ছি।

কলোনী অফিসার অবাক। একটু পরেই হেসে উঠে সুকুমারের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, একেবারে ছেলেমানুষ আপনি।

সুকুমার কেঁদে ফেলল। উনি ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, এ দুর্বৎসরে কেউ চাকরী ছাড়ে? ভাই, এটা ইংরেজ রাজত্ব নয়। এখন চাকরী অনেক শক্ত। এটা দ্বৈতশাসনের যুগ। শুধু সরকারী আইন আর ওপরওয়ালাকে মানলেই চলবে না। মসনদে আরূঢ় রাজনৈতিক গোষ্টির নিম্নতম সদস্যেরও হুকুম শুনতে হবে। অন্ততঃ শোনবার ভাণ করতে হবে। নইলে তারা এমন চাবি কাঠি টিপবে যে মন্ত্রীরও মসনদ টলতে পারে। ভোট ওদের হাতে। কাজেই একটু বুঝে চলা দরকার। সবুরে মেওয়া ফলাতে হবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে আপনাকে না জেনে রামবাবুর কোন কথা শুনব না।

বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্রায়। রামবাবুর ঠাকুরবাড়িতে অতিথিদের বিশেষ সভা—সন্ধ্যায়। রামবাবুর ঠাকুরবাড়ি থেকে একজন ডাকতে এলেন কলোনী অফিসারকে। সুকুমারের নিমন্ত্রণ নেই। সুকুমার হয়ত কলোনী অফিসারের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করছিল এ সময়। কিন্তু না। তিনি একাই ভূপালবাবুর বৈঠকখানা থেকে নির্বিবাদে নেমে গেলেন রামবাবুর লোকের পিছন পিছন।

কলোনী অফিসার রামবাবুর ঠাকুর বাড়িতে পৌঁছতেই রামবাবু অভ্যর্থনা জানালেন। কলোনী অফিসার কৃতার্থ ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসলেন। রামবাবুকে ডেকে বললেন, বলে এলাম ওদের পৃথক না করলেও বেশি করে লোন দেব।

রামবাবু জয়োল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

ঠাকুর বাড়ির উঠোন জমজমাট। অতিথি-অভ্যাগত, বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পূর্ণ, মুখর। সামনে প্রায় মাঝামাঝি বসেছেন, জনৈক প্রধান জাতীয় নেতা। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছাঁটাকাটা দাড়িওয়ালা একজন। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরণে। বন্দুকের জন্য উমেদারী করছেন।

নেতা বললেন, তোমার নামে পুলিশের খাতায় ভয়ানক রেকর্ড রহিম। লীগনেতা ছিলে। বর্ডারে থাক, যদি বন্দুক নিয়ে পাকিস্থান পালাও?

রহিম যেন অবাক হল। কি বুলচেন দাদা? আমি পালাবো? হ্যাঁ—লীগ ছেলাম এক কালে। কি করব? এ দিগরের তামাম মোচনমান বুলল তুমি লীগেব নেতা। আর আমাদের এই রামদাদাওত ত্যাখন লীগের নোক।

কি হোল? বামবাবু কলোনী অফিসাবেব কাছ থেকে ছুটে গেলেন বহিমেব পাশে। হ্যাঁ দাদা,—ওকে ওটা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। লীগ ছিল তাই কি? হিন্দুবাত কংগ্রেস করেছে। তাই বলে কি মনে মনে হিন্দুস্থান চায়নি। ধর্ম্মের টান, জাতের টান কার নেই? তা ওত এখন শুধরে গিয়েছে। খদ্দর পরে পাশ্চিত্তির করেছে। আর তার জন্যেইত ভয়। বডারে থাকে। পাকিস্থানের মোচনমানের ভারী রাগ ওর ওপর। প্রাণে মারতে পারে। তাছাড়া এই ঝাণ্ডাওয়ালারাত লেগেই আছে। যেন বিল ইজারা নিয়ে চোর হয়েছে। ঘরের টাকা ঢেলে, ফিরিয়ে আনতে পাবে না। কি আস্পদ্দা। কোন দিন প্রাণের ওপরেই হামলা করবে বর্ব্বরের দল।

রহিম বুঝল, নেতা এবার উত্তেজিত হয়েছেন। অমনি হাত চেপে ধবল। দাদা—গরীবের দুয়ারে একদিন পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বুলে দিন কবে যাবেন।

নেতা শান্তস্বরে বললেন, আচ্ছা। যাব একদিন।

রামবাবুব এক জায়গায় থাকলে চলেনা। অন্য দিকে ছুটলেন।

দুপুরবেলা দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেছেন অতিথিরা। খিঁচুড়ি পায়েস আর মিষ্টান্ন। সন্ধ্যায় তাই ভিন্ন আয়োজন করেছেন রামবাবু।

সরপুরিয়া, সরভাজা, কলকাতার সাহেব হোটেলের পাউরুটি, কেক। কাঁটা চামচ।

সেই খাবারের প্লেট এসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর। সাজান প্লেট। চারদিকের গল্প আলোচনা মৃদু হয়ে গেল। বেজে উঠল কাঁটা চামচের টুং টাং শব্দ। অনভ্যস্ত হাতের তালভঙ্গের আবহ সঙ্গীত। খাওয়া চলছে। রামবাবু অতিথি সৎকার করছেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ কলোনী অফিসার আবদার করে উঠলেন, রামবাবু এযে সব নিরীমিষি হল? একেবারে বোষ্টমে খাওয়া। ঠাকুরের প্রসাদের ওপর আর উঠল না।

সেই মুহূর্তেই হাওয়া পাল্টে গেল পরিবেশের। হাঁ-হাঁ করে উঠল সবাই। রব উঠল, হ্যাঁ, কথা ছিল খাসি কাটা হবে। পোলাও হবে।

নেতা, কনট্রাকটার, ব্যবসায়ী সবাই হাসছেন। কৌতুক অনুভব করছেন। রামবাবু হারবার পাত্র নন। হ্যাঁ বলেছিলামত। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললেন, এখনও ত বলছি, আমার জোগাড় আছে সব। আপনারা রাজী? —তাহলে লাগাই?

তার মানে সকলেই হকচকিয়ে গেল। জোড়া জোড়া দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মধ্যমণি নেতার দিকে। নেতা বলে উঠলেন, জোগাড় মানে?

মানে জোগাড়। দেখবেন? রামবাবু সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপরই তাঁব দেহরক্ষী অরুণ ঘোষ টেনে আনল একটা জলজ্যান্ত খাসি। হৃষ্টপুষ্ট। গলায় দড়ির টান লাগতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, ব্যা—। সবাই হেসে টঠল। রামবাবু এসে প্রশ্ন করলেন, কি? কাটব?

সবাই নেতার দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। নেতা মুচকি হেসে পকেট থেকে ঘড়ি বার করলেন। বললেন, পাগল। দশটা বাজে।

সভা মুষড়ে পড়ল আবার। খানিকক্ষণ। তারপরেই সিভিল সাপ্লাইএর একজন মন্তব্য করলেন, রামবাবুর খাসিটা কিন্তু ভাল ছিল।

অমনি একজন কনট্রাক্টার বুদ্ধি জুগিয়ে দিলেন। ওটাকে নিয়ে গেলে হয় না?

ঠিক। নেতা মাথা উঁচু করে নির্দ্দেশ দিলেম, ওটা আমাদের

জীপে উঠিয়ে দে রামা। রামবাবু কৃতার্থ। অরুণ ঘোষকে বললেন, খাসিটা জীপে তুলে দিতে। কিন্তু অরুণ ঘোষের আগেই প্রকিওরমেণ্টের রাধারমণ ঘোষ, খাসিটা কাঁধে নিয়ে জীপের দিকে ছুটলেন।

খাসির ভোজ কি একতরফা হবে? কথাটা ভেবেই নেতা বললেন, রামা ভোজের একটা দিন ঠিক করে জানাবো। তোরা সব যাস। রহিমকে বললেন, সেদিন যেও। বন্দুকের ব্যবস্থা হবে। কলোনী অফিসার রামবাবুকে ধরে বললেন, লোন শিগগির পাবেন। গিয়েই ব্যবস্থা করব।

— আপনি একটু দেখাশুনা করবেন ওদের।

কিন্তু মুস্কিল বাধল খাসি নিয়ে। জীপে তুলতেই তার চীৎকার আরম্ভ হয়ে গেল, ব্যা— ব্যা—। ভয় পেয়ে গেছে বেচারা। রামবাবুর মাননীয় অতিথিরা জোড়া জোড়া হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের মহিমান্বিত হাতের স্পর্শতেও খাসির ভয় কাটেনা। বরং আরও চীৎকার বেড়ে গেল। নিরুপায় অবস্থা। রাত বাড়ছে। কৃষ্ণনগর অনেক দূর। গৃহিণীরা জেগে বসে আছেন হয়ত। বিরক্ত হবেন।

একজন প্রকিওরমেণ্ট অফিসার বলে উঠল, একমুঠো সর্ষে আর দুটো খোলামকুচি পেলে হোত। ও দুটো ওর কানের ওপর দিলেই থেমে যাবে। বোবা হয়ে যাবে।

খোলামকুচি আর সর্ষের খোঁজ পড়ে গেল চারদিকে। নেতা বাধা দিয়ে বললেন. থাক। গাড়ীতে ষ্টার্ট দাও তাহলেই হবে।

তাই হল। জীপের হুহুংকারের মধ্যে খাসির ক্ষীণ কণ্ঠের ভয়ার্ত আর্তনাদ তলিয়ে গেল। জীপ ছুটতে আরম্ভ করল। বন্দীপুরের নির্জন পথ ধরে।

সুকুমার তখনো জেগে। একবার তাকিয়ে দেখল, জীপের আলোটা ধক ধক করে জ্বলতে জ্বলতে পথ দেখাচ্ছে। সুকুমারের মনে হল, অমনি আলো তার চোখে জ্বলে ওঠেনা?

আলো জ্বলে উঠল রামবাবুর চোখে। চারদিন পর।

খাসির ভোজে কৃষ্ণনগর যেতেই কলোনী অফিসার তাঁর চোখের সামনে একখানা খবরের কাগজ ধরে বললেন, দেখুন।

রামবাবু অবাক। সেই চুল-ঝাঁকড়া, কলার-উল্টান লপেটা ভদ্রলোক ক্যামেরায় যে ছবি তুলেছিলেন সেটা খবরের কাগজে উঠেছে এত বড় করে? মন্দিরের ছবি, তার সামনে অতিথিরা, মাঝখানে রামবাবু বসে। ছবি ও সেই সঙ্গে দীর্ঘ সংবাদ। তাতে বলা হয়েছে, পুনর্বাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছন্নছাড়া মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার সার্থক প্রচেষ্টা বন্দীপুরে। তারই প্রমাণ মন্দির। বাসগৃহের পূর্বেই মন্দির! অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে আরাধনার জন্যই এ মানব জীবন—তাঁর আবাস আগেই গড়ে তুলতে পেরেছে বন্দীপুর কলোনীতে। এইত আশাব কথা। তাদের জয় নিশ্চিত। আর যিনি সেই বৃহৎ কর্মের উদ্যোক্তা, প্রাণস্বরূপ, সেই সেবাব্রতী উদার জননায়ক রামবাবুকে অভি-নন্দন জানান হয়েছে সমস্ত জাতির হয়ে। সমস্ত জাতি যেন তাঁকে অনুসরণ করে সার্থক হয় তারই আবেদন জানান হয়েছে পরিশেষে।

পড়তে পড়তে রামবাবুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কলোনী অফিসার বললেন, এ কাগজের কথাই সত্যি। আমরাও তাই বলি। আপনার মত এমন মানুষ ছিল বলেই—

রামবাবু আবেগে কলোনী অফিসারের হাত চেপে ধরলেন। সত্যি? আপনিও বলচেন? কিন্তু—গাঁয়ে তবু লোকে আমার শত্রুতা করে।

সে ঈর্ষায়।

আপনার সুকুমারবাবুও যোগ দিয়েছে সেই দলে।

পাগল। কলোনী অফিসার বললেন, সেদিন বকে দিয়েছি। ও কি করবে আপনার? আমিত আছি। তাছাড়া আমি ভেবে পাই না কি করে ওদের কথা ভাবতে এত সময় পান আপনি?

না, না। তা নয়। রামবাবু বলে উঠলেন, ওসব আমি ভাবিনে। হেসে আবার কলোনী অফিসারের হাত জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সেদিন আনন্দের আতিশয্যে খাসির ভোজও খেতে পারলেন না। তার আগেই বন্দীপুর ছুটলেন, ডজনখানিক খবরের কাগজ কিনে নিয়ে।

যত তাড়াতাড়ি খবরটা ছড়িয়ে দেওয়া যায় গাঁয়ের বুকে। সুকুমার, ঝাণ্ডাওয়ালারা, গোবিন্দলাল যত শিগগির দেখতে পায়।

খবরের কাগজ? খবরের কাগজে ছবি আর গুণ-কীর্তন রামবাবুর? সংবাদটা তড়িৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল বন্দীপুর ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে। বন্দীপুর, উষাগ্রাম, দুর্লভপুরের পাড়ায় পাড়ায়। পথে পথে মানুষের মুখে মুখে। চারদিকে বিস্ময়েব ঘোর লাগল। খবরের কাগজে নাম উঠেছে? কি বলেছে? রামবাবুর গুণগান? তবে! কাগজে ছাপার অক্ষরে নাম বেরিয়েছে—যারা নাম দিয়েছে, ছবি দিয়েছে তারা কি মুখ্যু? —তবে?

যারা রামবাবুব বিবোধী মানুষ, সাধারণ লোকে তাদের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, তোমরা যে বল গুণ নেই রামবাবুর?

তারা বলল, গুণ যে কি তাত তোমরাও বোঝ সবাই। হাড়মাস ভাজা-ভাজা ওর জ্বালায়।

তবু গুণ নিশ্চয় কিছু আছে। না হলে কাগজে নাম ছাপা হয়? —ছবি ওঠে?

তা বটে। প্রতিবাদীরা জবাব পায় না খুজে। খবরের কাগজের চেয়ে তাদের কথাকে সত্য বলে মান্য করবে কে?

রামবাবু এইত চেয়েছিলেন। জটিল অবস্থায় এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি কার্যোদ্ধারের রাজপথ বিশেষ।

খবরের কাগজ পড়ে কলোনীতে আলোড়ন উঠল আরও বেশি। শেষ পর্যন্ত নীরব থাকতে না পেরে শ্রীমন্ত আইচ খবরের কাগজখানা হাতে নিয়েই সুকুমারের কাছে চলে এল। বললে, দেখেছেন রামবাবু আমাদের জন্যে কি করেছেন? উনি বলেছেন, এবার থেকে ওই সাংবাদিকদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে আনবেন। এবার আমাদের সকলের ছবি ছাপিয়ে দেবেন। সারা ভারতের লোক দেখবে।

রামবাবুর পরিকল্পনাটা যেন দেখতে পেল সুকুমার। সে চমকে উঠল। আজ এই উদ্বাস্তুরা যে স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে রামবাবুর দিকে ঝুঁকেছে, একদিন ওই স্বার্থের সংঘাতেই সারা কলোনীতে বিপর্যয়

নামবে। লোন আসবে যেদিন। বেশি লোন আসবে নবীন জীবনদের জন্যে,—সেইদিন। সুকুমারের পক্ষেত সে এক দুর্ভাগ্যের দিন হবে। কি করবে সে? রামবাবু ধনী, নেতা,—তাঁর স্নায়ু যুদ্ধের জন্য, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জন্য আছে নিত্যনতুন প্রলোভন—জনবল, ধনবল, পদমর্যাদা সে পারবে কেন প্রতিরোধ করতে? সুকুমার মনে মনে বেশ আতংকিত হয়ে উঠল।

না। বিপদ কোন দিক থেকে আসে বলা যায় না।

সুকুমার ভয় করছিল লোন আসবার সেই দিনটিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন উঠল লোন কবে আসবে?

বৈশাখের সংক্রান্তি ছেড়ে জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিও পেরিয়ে গেল। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের সঞ্চার হল আকাশে-আকাশে। উদ্বাস্তুদের তাঁবুতে অবস্থান। কপর্দকশূন্য অবস্থা। ওরা ধুবুলিয়া থেকে পনের দিনের ডোল এনেছিল। সেই সঙ্গে যার যা অতিরিক্ত কিছু সম্বল ছিল, নিঃশেষিত হয়ে উঠেছে এতদিনে। এরপর কি করবে? রামবাবু নীরব। তিনিত মন্দির গড়ে দিয়েছেন। তার পরের যা কাজ, তার জন্যেত মাইনে করা চাকর আছে।

অবস্থা ক্রমেই জটীল আকার ধারণ করছে। দেখে শুনে সুকুমার প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল, চরম অবস্থা নামবার আগেই যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়। সুকুমার অবস্থাটা জানিয়ে চিঠি দিতে আরম্ভ করল কৃষ্ণনগরে—কলোনী অফিসারকে। লোনের জন্য তাগিদ দিতে আরম্ভ করল। আশ্চর্য। কোন চিঠিরই জবাব নেই। আশ্বাস মেলে না।

সুকুমার ভাবছিল এর পর কি করবে। ঠিক এই সময়ে একদিন উদ্বাস্তুরা উত্তেজিত হয়ে ঘিরে ধরল ওকে। সুকুমার বিহ্বল হল না। এমন অবস্থা হবে সে বুঝতে পারছিল কিছুদিন থেকে।

উদ্বাস্তুরা বললে, আপনিই আমাদের সব—ওপরওয়ালা। এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে বসে আছেন কি ব্যবস্থা করছেন?

সুকুমার বললে, জানত সবাই, রোজ চিঠি দিচ্ছি। জবাব না এলে কি বলি বল?

ওরা চেঁচিয়ে উঠল, ওসব শুনতে চাইনে আমরা। প্রতিকার চাই।

সুকুমার বললে, বেশ, আমি চিঠি দিচ্ছি তোমাদের হাতে। তোমরা কলোনী অফিসারের কাছে নিয়ে যাও। এছাড়া আমার আর করণীয় কিছু নেই।

বেশ। তাই দিন। তাতেই রাজী হল উদ্বাস্তুরা। গৌরীশংকর, সাধুচরণ, শ্রীমন্ত আইচ এই তিনজনে কৃষ্ণনগর চলে গেল। আর বাকী মানুষগুলো সারাদিন ধরে সুকুমারের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল। বিপন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষ সব। চোখেমুখে অসহায় ভাব।

সন্ধ্যার একটু পরেই প্রতিনিধি দলটা ফিরল। ভূপালবাবুর বৈঠকখানায় সুকুমারকে ঘিরে উদ্বাস্তুরা তখনো বসে। তাদের সামনে এসে তিনজনে দাঁড়াল উগ্রমূর্তিতে। শ্রীমন্ত আইচ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, কেন আমাদের অপমান খাওয়াতে পাঠিয়েছিলেন?

তার মানে? চারপাশ থেকে হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই।

গৌরীশংকর বললে, কলোনী অফিসার দারোয়ান দিয়ে বার করে দিয়েছেন। শেষকালে এই চিঠি দিয়েছেন সুকুমার বাবুর নামে।

সুকুমার চিঠি পড়ল। ইংরাজীতে লেখা। তার মর্মার্থ হচ্ছে, ভবিষ্যতে যেন আর কাউকে পাঠান না হয়। লোনের নিশ্চয়তা নেই। 'রেডটেপিজিম' নামক জিনিশটার আজকাল বড় বেশি বাড়াবাড়ি অফিসে। কাজেই নেহাৎ অসুবিধা হলে সুকুমার কৃষ্ণনগর চলে আসতে পারে। —এসব কথা উদ্বাস্তুদের বলা যায় না। তারা কৌতূহলী হয়ে বসে আছে। শুনতে চায়। সুকুমার গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বললে, ঠিক আছে। আমিই কালকে যাব। একদিন হোক, দুদিন হোক, যা করেই হোক লোন নিয়ে তবে ফিরব।

দারিদ্র্য, অসহায়তা, অনিশ্চয়তা........এই উদ্বাস্তু জীবন। এরমধ্যে এমনতর আশ্বাসবাণীও মন্ত্রের মত কার্যকরী। বিশ্বাস হয় না, ভরসা হয়না, তবু ক্ষীণ সম্ভাবনার সূত্র ধরেই আশার আলো জ্বলে উঠল ওদের চোখে। সব উত্তেজনা ভিজে-বারুদ হয়ে গেল যেন। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল একটার পর একটা বিচিত্র মন্তব্য—যার:

মূলগত অর্থ হচ্ছে, তুমি বাঁচাও, রক্ষা কর। বড় দুর্ভাগ্য আমাদের.... ।

সুকুমারের মনেও একটা সংকল্প দানা বেঁধে উঠেছিল। কৃষ্ণনগর যাবার সময় একটা দৃঢ়তা নিয়েই রওনা হল। যে করেই হক, যা করেই হক, একটা ব্যবস্থা করে আসবেই। বুঝাপড়া করবেই কলোনী অফিসারের সঙ্গে। তিনি যদি রাগ করেনত করবেন।

কিন্তু কলোনী অফিসার সুকুমারকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সকালবেলা পৌঁছতেই সুকুমার ওঁব বাসায় দেখা করতে গিয়েছিল। কলোনী অফিসার বললেন, আরে! আপনি এসেছেন! আশ্চর্য! আসুন, আসুন, বসুন। একেই বলে উইলফোর্স।

সুকুমার বুঝল না। চেয়ারে বসল।

কলোনী অফিসার বললেন, এক মিনিট বসুন। শুভ্রাকে ডাকি।

শুভ্রাকে বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে এলেন কলোনী অফিসার। শুভ্রা। সাদা রঙের তরুণী। থপথপে চেহাবা। আদর যত্নে লালিত হবার চিহ্ন চেহারায় স্পষ্ট। বেথুনে পড়ে থার্ডইয়ারে। বাংলায় অনার্স। স্কটিশে পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মার আপত্তি। তিনি সেকেলে পণ্ডিতের মেয়ে। তাছাড়া তাঁর এক সম্পর্কিত দিদির মেয়ে অমনি ছেলেদের সঙ্গে কলেজে পড়তে গিয়ে এক খৃষ্টান ছেলেকে বিয়ে করে বসেছে। কাজেই তাঁর মেয়ের বেলায় ওব পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে রাজী নন।

শুভ্রার বাবা কিন্তু প্রগতিবাদী। মেয়েকে মোটর চালান, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া, সবই শিখিয়েছেন। সর্বোপরি শিখিয়েছেন গান। —ওস্তাদী গান।

কলোনী অফিসারের শ্যালিকা শুভ্রা। অফিসার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, পরশু এসেছে। এসে অবধি শুধু তাগিদ দিচ্ছে একটা জলসা করবার। মফঃস্বল শহর। আরত কোন বৈচিত্র নেই। তাই আপনার কথা ভাবছিলাম। আপনিওত গায়ক। এ সময়ে দুজনে জমলে একটা জলসা জমাতে পারবেন। নইলে, আমিত আনাড়ি।

সুকুমারের কানে কথাগুলো বেসুর ঠেকল। গ্রাম থেকে সম্ভ

আসছে সে। চোখের সামনে ভাসছে কলোনীর মানুষগুলো। তাদের উত্তেজনা, বিপন্নতা—

শুভ্রা সামনের চেয়ারে বসে, থেকে থেকে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

সুকুমার বেপরোয়া ভাবেই নিজের কথা তুলল। বিবৃত করল কলোনীর অবস্থা। বললে, তাই আমি নিজেই এলাম।

কলোনী অফিসার হেসে উঠলেন। বুঝেছি। আপনি যে নিষ্ঠাবান কর্মচারী তা জানি। আপনার লোন সম্বন্ধে চেষ্টাত করছিই ভাই। কিন্তু বোঝেনত—অফিসের পাঁচজনকে নিয়ে কাজ। কাউকে চড়া কথা বলার উপায় নেই। অমনি রুখে উঠবে। প্রতিবাদে, হয়ত অপমান। সত্যাগ্রহেব হুমকি দেবে। হয়ত ইউনিয়ন গড়ে ধর্মঘট কবে বলবে, অফিসাবের মুণ্ডু চাই, পদত্যাগ চাই। কাজেই কেরাণীদের এখন যতদূর সম্ভব তোষামোদ করে, হেসে কাজ আদায় করা যায়। তাই একটু দেরী হবেই ভাই। আর এটা কলোনীত নয়। টাকা পয়সাব ব্যাপাব। তবে চেষ্টা আমি খুবই করছি। হয়ে যাবে দু'এক দিনের মধ্যে।

সুকুমাব বললে, হ্যাঁ, না হলে কিন্তু কলোনীতে যাব না। লোন নিয়ে তবে ফিরব।

আচ্ছা, আচ্ছা। তাই হবে। কলোনী অফিসাব হেসে উঠলেন। লোনেব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর কলোনী থেকে চিঠি দিয়ে কাউকে পাঠাবেন না। আপনারই দুর্নাম রটবে। অক্ষম বলবে লোকে। তাইত সেদিন ওদের তাড়িয়ে দিলাম। নাহলে অফিসের সব বলবে কি?

চাকুরীজীবীদের আলোচনা। শুভ্রার ভাল লাগছিল না। উঠে দাঁড়াতেই কলোনী অফিসার বলে উঠলেন, উঠছ? বেশ, সুকুমার বাবুকেও নিয়ে যাও পাশের ঘরে। বসে আলাপ কর। চা-পান করাও। জলসার কাজটা গুছিয়ে নাও। কাজ আদায় করে নাও, বুঝলে?

নিজেই হেসে উঠলেন কলোনী অফিসার। সুকুমারকে বললেন, যান, ওকে একটু সাহায্য করে দিন ভাই। আমাকে বাঁচান।

শুভ্রা বুঝতে পারছে সবই। আকারে ইঙ্গিতে, কথার নানারকম প্যাঁচে দিদি জামাইবাবু অনেক কথাই বলেছেন ওকে। দিদি জামাই-

বাবুর আলোচনাও শুনেছে পাশের ঘর থেকে। কলকাতায় থাকা-কালীনও কাণাঘুসা কিছু শুনেছে বাড়িতে। সব মিলিয়ে নিলে আর কিছু জানবার বাকী থাকে না।

সুকুমারের মত ছেলে পাওয়া ভাগ্য। ব্যবহার, রুচি, শিক্ষা অতুলনীয়। চাকরী জীবনে অত সৎ, নিষ্ঠাবান যদি সবাই হতে পারত তাহলে দেশে অনেক কাজ হত।

আসলে ওর হওয়া উচিত ছিল অধ্যাপক, পণ্ডিত জ্ঞানী। নয়ত মহাপ্রাণ দেশসেবক। কিন্তু কিছুই হতে পারেনি বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ার দরুণ। বর্তমানে পরিবারে ওই উপার্জনশীল। আর সব ভাই বোন ছোট। বিধবা মা। কাজেই শুভ্রার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করতে পারবে। শুভ্রারও জীবনে অনেক সুখ আসবে।

শুভ্রার দিদি, জামাইবাবুর পরামর্শ মত সমস্ত পরিবারে এই পরিকল্পনা স্বীকৃত হয়ে গেছে। তাই শুভ্রা দিদির বাসায় কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হয়েছে।

সে কৃষ্ণনগরে এলে, দিদি আরও অনেক পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছে। সুকুমারের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। আজকাল শিক্ষিত সমাজে সেটাই রীতি হয়েছে। শুনে শুভ্রা হেসেছে মনে মনে। দিদি কি তার চেয়ে বেশি আধুনিকা? তবু প্রতিবাদ না করে শুনে গেছে সবকথা। সুকুমার একটা লোভনীয় ছেলে পাত্র হিসেবে। কিন্তু টাকা দেখিয়ে, কি পদমর্যাদা দেখিয়ে ওসব ছেলে বশীভূত হয় না।

জামাইবাবু সুকুমারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, হ্যাঁ, ওসব ছেলে হচ্ছে সেন্টিমেণ্টাল। ওদের সাবধানে মন জয় করতে না পারলে বশে আনা যায় না।

নানা কথা। সুকুমার সম্পর্কে বিচিত্র আলোচনা শুনতে শুনতে যৌবনবতী শুভ্রার মনে অনন্ত কৌতূহল জমে উঠেছিল। সুকুমারকে দেখেও ভালই লাগল। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

শুভ্রা। নিটোল চেহারা। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো পিঠের ওপর

ছড়ান। তার ডগাগুলো সমান করে ছাঁটা। হাতে গহনার বাহুল্য নেই। ছোট হাতঘড়িটা গহনার মর্যাদা পেয়েছে। অদ্ভুত তীর্যক দৃষ্টিতে তাকায়। স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণে কথা বলে। অসংকোচ। যদিও তার মা ছত্রিশ জাতের হাজার গণ্ডা ছেলের মধ্যে মেয়েকে পড়তে দেন নি। কিন্তু কি আসে যায় তাতে? সে কলকাতার মেয়ে। কলকাতা—সেখানে ট্রাম, বাস, ট্রেন—বিজ্ঞাপনের বহুমুখী অভিযানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষও চলে। তাই সেখানে হেঁয়ালি নেই। পূর্ব-রাগের ভূমিকা নেই। শুধু কাজ। অসংকোচ যন্ত্রের মত কাজ করে যায় মানুষ। দ্বিধা ইতস্ততঃ মনভাব সর্বনাশের কারণ সে শহরে। শুভ্রা সেই শহরে মানুষ। তাই সে অসংকোচ।

জলসার আয়োজনের নাম দিয়ে মেলামেশা আর আলাপ আলোচনা আরম্ভ করে দিল শুভ্রা।

লোনের চেষ্টা করছেন কলোনী অফিসার। লোন না নিয়ে গ্রামে ফিরতে পারবে না সুকুমার। কাজেই শুভ্রার জলসার আয়োজনে যোগ না দিয়ে সে কি করবে? সেত বুঝছে, জলসার আয়োজন না ছাই। শুভ্রা শুধু মুখোমুখি বসে গল্প চায়। নানা আলোচনা চায়। প্রশ্ন-গুলোও তার অদ্ভুত। অদ্ভুত কৌতূহল। কিন্তু মন্দ লাগে না।

শুভ্রা প্রশ্ন করল, আপনি তাহলে পাড়াগাঁয়েই থাকেন?

সুকুমার বললে, হ্যাঁ। চাকরী করতে হলে থাকতে হবে।

শুভ্রা কখন পাড়াগাঁ দেখেনি। কলকাতা ছেড়ে কৃষ্ণনগরের মত মফঃস্বল শহরেও খুব একটা যাতায়াত করেনি। ছুটি ছাটায় বড়জোর দার্জিলিং, দিল্লী, সিমলার মত জায়গাগুলোকে জমকে তুলেছে দল বেঁধে বেঁধে। ওদের মত বিলাসী ভ্রমণকারীদের সঙ্গে জুটে। কাজেই গ্রাম সম্পর্কে কৌতূহল আর সুকুমার সম্পর্কে কৌতূহল মিশে শুভ্রার মনে মহাকৌতূহল জমে উঠেছিল। সেই কৌতূহল নিয়ে শুভ্রা প্রশ্ন করল, আচ্ছা, সে গ্রামে যায় কিসে করে?

সুকুমার বলল, এখান থেকে বাসে। তারপর বাস থেকে নেমে

হাঁটতে হয় মাইল চারেক।

চার মাইল হাঁটতে হয়!

হ্যাঁ।

পথ মাটির না খোয়া বাঁধানো?

মাটির। ধূলোয় ভর্তি। বৃষ্টি হলেই কাদা।

শুভ্রার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। আপনি অমনি করে ওই পথে যাতায়াত করেন?

হ্যাঁ। সুকুমারের হাসি পেল।

শুভ্রা খানিক চুপ করে কাটাল। বেশ খানিকক্ষণ। সুকুমার আবার জলসার প্রসঙ্গ আরম্ভ করছিল। শুভ্রা থামিয়ে দিল।

আচ্ছা, অমন করে যাতায়াত করতে কষ্ট হয় না? ভয় করে না?

সুকুমার বললে, কষ্ট হলেই বা কি করা যাবে? চাকরীত করতে হবে। আর ভয়ের আছেই বা কি?

কেন? গাঁয়ের ওই পথ। বন জঙ্গল আছে নিশ্চয়ই দুধারে। আর লোকজনও বোধ হয় তেমন পথে চলে না।

সুকুমার এবার সশব্দে হেসে উঠল। 'রবীন্দ্রনাথ' আবৃত্তি করে দিল।

"সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।"

জানেন, এই ভয়ই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে।

শুভ্রা এবার লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি বললে, না, না, তা বলছি না।

সুকুমারের আরও হাসি পেল। শুভ্রা আর বলতে পারল না। থেমে গেল। সুকুমারের ভাল লাগল বেশ এই প্রথম পরিচয়ের লগ্নটিকে।

শুভ্রা ফিরে গেল আবার জলসার আলোচনায়। শহরে বিশিষ্ট গায়ক, বাদক, রসিক কে কে আছেন, কাকে বলতে হবে, কি ভাবে আনা যাবে তাঁদের—এরই আলোচনা। কলোনী অফিসার এক সময় এসে যোগ দিলেন। শুভ্রার দিদিও এলেন। এক কথায় সব আলোচনা শেষ হবার নয়। জলসার আয়োজনে সময় লাগবে। কাজেই সুকুমারের নেমন্তন্ন হয়ে গেল দুবেলা আহারের। জলখাবারের কথাই নেই।

শুধু জলসার আলোচনা। কিন্তু শুভ্রা যেন সুকুমারের গ্রাম-জীবনের কথাকে ভুলতেই পারেনা। সুযোগ পেলেই সে বিষয়ে প্রশ্ন করে বসতে লাগল। সকালে যে আলোচনায় লজ্জা পেয়েছিল, বিকেলে তারই জের টেনে বললে, আচ্ছা, গ্রামে গিয়ে থাকেন কোথায়? কোয়াটার্স পেয়েছেন?

আজগুবি প্রশ্ন। গ্রাম সম্বন্ধে এমনধারা অনভিজ্ঞতার প্রশ্নে সুকুমারের হাসি পায়। বললে, কোয়াটার্স কোথায়? সেখানকার বাসিন্দারাই মাথা গুঁজবার ঠাঁই পায় না সকলে।

তবে? থাকেন কোথায়?

একজনের একটি খড়ের চালা আছে, বৈঠকখানা। ঝাঁপের বেড়া-দেওয়া। তারই একটা কোণে চৌকী পেতে থাকতে হয়।

ইস্। শুভ্রা দুঃখজনিত শব্দ করল। খান কোথায়?

সেই বাড়িতেই। দয়া করে খেতে দেন গৃহস্বামীর স্ত্রী।

ও। তাহলে শিক্ষিত লোক কিছু আছেন গ্রামে। শুভ্রা আস্বস্ত হবার ভঙ্গী করল।

সুকুমার বললে, না। আপনারা শিক্ষিত বলতে যাদের বোঝেন তাঁরা নেই বললেই চলে। ইংরেজী জানা, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীওয়ালা মানুষ দুএকটা। তাও তাঁরা ভুলে মেরে দিয়েছেন, ছাত্র জীবনে মগজে ঢোকান বস্তুগুলো।

তার মানে?

সংখ্যালঘু হলে যা হয়। নিতান্তই অস্বাভাবিক নাহলে সংখ্যা-গুরুদের দলেই যেমন করে ভিড়ে যায় কালক্রমে। তাই।

তার মানে—গ্রামে মানুষ আছে, অথচ গ্রামকে গ্রাম অশিক্ষিত?

অশিক্ষিত ঠিক বলা যায় না। প্রায় নিরক্ষর বলা চলে।

তার মানে? নিরক্ষর অথচ শিক্ষিত?

হ্যাঁ।

কেমন করে?

জানেন না, রুশোর শিক্ষা প্রসারের নীতির কথা?

শুভ্রা বিপন্ন বোধ করল। সে কলেজে পড়ে। তার পাঠ্য-তালিকায় কোথাওতো রুশোর শিক্ষানীতি সম্পর্কে কথা নেই। ও সম্পর্কে কেউ কথাও বলেনা। সেই কবেকার লোক রুশো। তারপর হিটলার অবধি পেরিয়ে গেল। এখনত হলিউডের, টেলিভিসনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের আলোচনা চলছে। কাজেই—তাছাড়া শিক্ষা সম্পর্কে ভাববে শিক্ষকরা। তাদের কি দরকার!

শুভ্রার বিপন্নতা দেখে স্নকুমার বললে, রুশো বলেছিলেন, এই অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন আধুনিক জ্ঞানচর্চা—এ শুধু সীমাবদ্ধ থাক সহরের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে। কারণ তারা পরগাছা প্রায়। ওই বুদ্ধিবিদ্যাই তাদের মূলধন। জীবিকার উপায়। আর যারা গ্রামের চাষী, শিল্পী, কারিগর, তাদের থাক মাটির সঙ্গে যোগ। সেই তাদের মূলধন। প্রকৃতি হোক তাদের শিক্ষক। আর পরগাছাদের থেকে চুঁইয়ে—যেটুকু ওদের মধ্যে যায় সেই ভাল। আমাদের দেশে ওনীতি খুবই কার্যকরী হয়েছে। মেকলে সাহেবের ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন থিওরি খুব কাজ করেছে।

তার মানে? শুভ্রা আবার বিপন্ন হল। স্নকুমারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। স্নকুমার একটু হেসে বললে, জল ফিলটার করে,—অনেক পাত্র পেরিয়ে, অনেক পরীক্ষা উতরে যেমন নীচে এসে পড়ে, ঠিক তেমনি, ইংরেজ সরকারকে বুদ্ধি দিলেন মেকলে সাহেব, কয়েকটি শহরে বিদ্যায়তন খুলে দাও, তাদের ছাত্রদের দেখে দেশের অবশিষ্ট মানুষ মুগ্ধ হবে। ওদের অনুকরণ করবে। তাহলেই সারা দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে শহরগুলো হল একছাঁচে ঢালা। গ্রাম থাকল অনেক দূরে। দুয়ের সম্পর্ক হল ভাস্থর-ভাদ্রবৌএর। কাজেই তার ভিতর দিয়ে শহর থেকে গ্রামে যেটুকু গেছে, সেইটুকু নিয়ে গ্রাম যা হতে পেরেছে, তাই হয়েছে।

শুভ্রা এসব কথা কোনদিন ভাবেনি। স্নকুমারের কথাগুলো হাঁ করে শুনল। সেওত বি. এ. পড়ে। কিন্তু স্নকুমার কত জানে। সত্যিই দিদি জামাইবাবুর কথাই ঠিক।

কিন্তু সেওত বি. এ. পড়ে। বাংলায় অনার্স আছে। অধ্যাপিকাদের

বক্তৃতা শোনে। কাজেই আলোচনা করতে পিছপা হবে কেন ?

রাত্রিবেলা আবার কথা তুলল। বললে, তাহলে গ্রামের মানুষ নিরক্ষর হলেও, সেখানে এটা উচ্চ সংস্কৃতি আছে ?

সুকুমার এবার অবাক হল। শুভ্রার উক্তি ঠিক বুঝল না। জিজ্ঞাসু হল। মুখোমুখি চেয়ারে দুজনে বসে। মাঝখানে টেবিলের ওপর চিনেমাটির ডুমওয়ালা বিজলীবাতি জ্বলছে। দেওয়ালে টাঙান ঘুর্নীর তৈরী একটা মাটির আরশুলা। তার পিছনে মাটির টিকটিকি। আরসুলাকে তাড়া করার ভঙ্গীতে।

স্থির। স্তব্ধ ওদুটো। শুধু ভঙ্গী নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে। বিভ্রান্ত করবে। কেননা জীবন্ত নয়,—মাটির।

কিন্তু চেয়ারে জীবন্ত শুভ্রা সুকুমারের ভঙ্গী দেখে বললে, কেন, গ্রামে সংস্কৃতি নেই ? কত পণ্ডিতের সব মূল্যবান পুঁথি মুখস্থ। তাঁরা কথকতা করেন। পাঁচালি পর্ব। আর পথে পথে সর্বহারা বাউলের গান। এসবইত গ্রামের জীবনকে মধুর, সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

সুকুমার এবার প্রশ্ন করল, কোথেকে জানলেন এসব ?

কেন ? আমি বাংলায় অনার্স পড়ি না ? জানিনা কতপুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে গ্রাম থেকে ? কত লোকগাথা, কত ছড়া আউল বাউলের গান—উঃ কত জ্ঞান, কত তত্ত্ব-বিচার। ক্লাশে অধ্যাপিকারা কত বলেন, আজো অনুসন্ধান শেষ হয়নি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে অনেক অমূল্য সাহিত্য রত্নের সন্ধান মেলে। পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে সহর, রাজধানীগুলো বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। তার রূপ পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু বাংলা আর বাঙালীকে আজো খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রামে। বাংলার যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কৃতি গ্রামেই ছড়িয়ে আছে। গ্রামের মানুষগুলো তাই আজো বাঙালী জাতির মর্যাদা, প্রাণ, আলো —

শুভ্রা ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। সুকুমারের চোখের সামনে তখন ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে, বন্দীপুর, উষাগ্রাম, দুর্লভপুর....তাদের অধিবাসী—সামাদ সেখ, জাবেদা, নিবারণ বিশ্বাস, গোবিন্দলাল,

রামবাবু, হরিমোহন দাঁ, হাবুল কর্মকার, আর নবাগত উদ্বাস্তুদল। আর গ্রাম্য পরিবেশ, জীর্ণ চালাঘরগুলো, জঙ্গল পূর্ণ, দুর্গম পথঘাট, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসহায়তা, অবিচার....।

শুভ্রা থেমে যেতেই সুকুমার হাসল। শুভ্রা বললে, হাসলেন যে?

না। —এমনি।

শুভ্রা প্রশ্ন করল, তার মানে?

মানে অধ্যাপকদের কথাগুলো মানবার আগে মাননীয় অধ্যাপকদের সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা ভাল।

কি রকম? স্বভাবতঃই অধ্যাপকরা বর্তমানাশ্রয়ী হন্। মমী আর মেমারী নিয়ে তাঁদের কারবার করতে হয়। গতিশীলের গতি যখনই থামবে তখনই সে হবে অধ্যাপ‌কের সম্পত্তি।

কি রকম? শুভ্রা অপ্রতিভতায় আরক্ত হল। বলে উঠল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, এইসব বলে আপনি কি প্রমাণ করতে চাইলেন?

সুকুমার বললে, আপনার অধ্যাপিকা গ্রাম সম্পর্কে যাই বলুন, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন। বাউলের দেখা পাইনি। বাউলবেশী ভিখারী দেখেছি। পুঁথিপড়া পণ্ডিত, কথক দেখিনি। মুখ্যু পণ্ডিত অনেক দেখেছি। আর দেখেছি দুষ্ট সংস্কৃতির ধ্বজাধারীদের, যারা নিরীহ সবল মানুষগুলোকে চরিয়ে খায়। কে জানে, হয়ত আমারই চোখ খারাপ।

ইস্। শুভ্রা ব্যথিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। বেদনাতুর স্বরে বললে, আপনি তাহলে থাকেন কি করে ওখানে? কি করে দিন কাটে? কার সঙ্গে মেশেন?

সুকুমার বললে,—তাদের সঙ্গেই মিশতে হয়।

সেকি! চাকরী করতে হবে ব'লে, জীবিকার জন্যে, জীবনের শিক্ষা, রুচি জলাঞ্জলি দিতে হবে? কি করে আপনি পারেন? আমি হ'লে পারতাম না। যা করে হোক শহরে বদলি হতাম।

সুকুমার হাসল শুধু। বেশ আমোদ পেল। শুভ্রার অদ্ভুত একটা

আব্দারের ভঙ্গী আছে, যা আদরে লালিতদের খানিকটা সহজাত হয়ে পড়ে। বেশ লাগে ভঙ্গীটা। উপভোগ্য।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুকুমার ভাবল, বন্দীপুর থেকে কৃষ্ণনগরে চলে এসেছে। শহরের চঞ্চল-জীবনের স্পর্শ লাগছে অনবরত। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচনা হচ্ছে। তার ওপর শুভ্রার সংস্পর্শ, সাহায্য···তার মধ্যে কে মনে রাখতে চায় দুর্যোগের কথা? অকল্যাণকর, বিভীষিকা আর অক্ষমতার কথা বিস্মৃত হওয়াই মানুষের স্বভাব। এই বিস্মৃতির মধ্যে শান্তি, মুক্তি, নবজীবন লাভ। রাতে শুভ্রার কথাগুলো ভাবল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিন সকালে, শুভ্রা আবার উত্থাপন করল সেই আলোচনা।

কি করে থাকেন আপনি সেই গ্রামে? এত লেখাপড়া শিখে, এত পণ্ডিত হয়ে, শেষে এই সঙ্গা নিয়ে বাস? বলুন তবে কি মর্যাদা দিলেন এতদিনের শিক্ষার দীক্ষার? গ্রামে থাকার জন্যে মানুষ আরও মিলবে। কিন্তু আপনার কখনই উচিত হয়নি কৃষ্ণনগর ছেড়ে যাওয়া। বরং আমারত মনে হয়, কৃষ্ণনগরেও থাকা উচিত নয় আপনার। কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত।

কেন? সুকুমার সচকিত হল।

শুভ্রা বললে, কৃষ্ণনগরওত দেখছি। দু'চার দিন চেঞ্জে আসা যেতে পারে। কিন্তু বারোমাস থাকতে পারে কোন বুদ্ধিমান, উন্নতিকামী কেউ, তেমন জায়গা নয়। কেমন যেন নিরুত্তপ্ত শহর, সারা বছর ধরে উৎসাহ জোগাতে পারে কাউকে বলে মনে হয় না।

শুভ্রার মুখ খুলেছে। কিন্তু কৃষ্ণনগরে মানুষ সুকুমার, সইতে পারল না। বললে, কতটুকু জানেন এ শহরের? দেখেছেন সব এলাকা? চিনেছেন এখানকার মানুষকে?

শুভ্রা ঝলমলিয়ে উঠল। দেখালেন কই? আমার একার পক্ষে যা দেখার দেখেছি। ভুলও হতে পারে বুঝবার। সংশোধন করে দিন। দেখিয়ে নিয়ে বুঝিয়ে দিন তারপর বলবেন।

এ যেন একটা চ্যালেঞ্জ শুভ্রার।

কলোনী অফিসার বললেন, ভাই, আপনার লোনটার জন্যে খুবই চেষ্টা চালাচ্ছি। দু'একদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

সুকুমার বললে, তাহলে আমি নিয়ে যেতে পারি। একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচি।

কলোনী অফিসার বললেন, ঠিক আছে।

সুকুমার নিশ্চন্ত মনেই সেদিন বিকেলবেলা শুভ্রার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। শুভ্রাকে দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিয়ে দেবে, এ শহর কলকাতার চেয়ে কত সুন্দব, কত বাসোপযোগী। এর সৌন্দর্য আর সুস্থতা নিয়ে কত বছরের পব বছর কাটিয়ে দেওয়া যায়।

সুকুমার শুভ্রাকে নিয়ে বেড়াতে বার হল। সেজেগুজে, চরম আধুনিকা, আকর্ষণীয়া হয়ে শুভ্রা পথে বার হল। ওর দেহ থেকে প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে এসে সুকুমারের নাকে লাগতে লাগল। আধুনিক তরুণ সুকুমার।

প্রথমদিন ওরা গেল, জেলাবোর্ডের পাশ দিয়ে, নবদ্বীপের পথ ধরে। রোড ষ্টেশন অবধি, চওড়া পিচমোড়া পথ। মাঝে মাঝে সার্ভিস বাস, দু'একটা রিক্সা, আর ট্রাক ছাড়া—প্রায়ই নির্জন, শান্ত পথ। দুধারে ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল, ধানক্ষেত। বড় বড় আমবাগান, নিবিড় ঘনান্ধকার। ডালপালাগুলো আমেব ভারে ভেঙে পড়তে চায়। আর সেগুনের সারি। সে সব পেরিয়ে এসে ষ্টেশনের টিনওয়ালা চালা। বেশ রোমান্টিক পরিবেশ। ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে সুকুমার, শুভ্রাকে খানিক ভৌগোলিক জ্ঞানদান করল। শুভ্রা সব শুনলনা হয়ত। খুশী হয়ে তাকাতে লাগল। সুকুমারের মুখের দিকে। সুকুমার নারীর কাছে সত্যিই লোভনীয় পুরুষ। শুভ্রার মনে হতে লাগল। সুকুমার অনেকটা তার বশে এসে গেছে। এরপর সে যা খুশী বলুক। বোঝাক। তাকে পরাজিত করুক জ্ঞানদান করে। সেওত শুভ্রারই জয় হবে। তাই সে সুকুমারের বক্তৃতায় শুধু অনুগত ছাত্রীর মত শ্রোতার ভঙ্গী করতে লাগল।

পরদিন সুকুমার শুভ্রাকে আবার নদীর ধারে নিয়ে গেল। পশ্চিম পাশের শম্ভুনগর গ্রামের নির্জন প্রান্ত দিয়ে হেঁটে নদীর পুলের তলা দিয়ে এসে, ওপাশে নদীর ধারে ঘাসের ওপর গিয়ে বসল। সূর্য তখন অস্তগত। তার আভা পড়েছে জলে। ওপারে ঘন বনরাশি। পাখীরা সবে ফিরছে। খেয়াপারের আওয়াজ শুধু কানে এসে লাগছে।

সুকুমার শুভ্রাকে বললে, কেমন?—সুন্দর না পরিবেশ?

হ্যাঁ। শুভ্রা জবাব দিল।

সুকুমার বললে, এ-শহরে আরও কিছু বিউটিস্পট আছে। এরাই শহরের মানুষকে প্রাণের যোগান দেয়। বাঁচিয়ে রাখে।

শুভ্রা এমন বিউটীস্পট অনেক দেখেছে। এর চেয়ে অনেক সুন্দর। অনেক রমণীয়। কিন্তু এইসব বিউটিস্পটএ মন ওঠেনা তার। সে ঠিক এর মহত্ব খুঁজে পায়না। নির্জনতা? সেত ঘরে বসেই মিলতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন? সেত দেওয়ালে দেওয়া সেরা শিল্পীর আঁকা ছবি টাঙিয়ে দিলেই চলে। কি দরকার তবে এসবের? সুকুমারকে এমনি করে পাওয়া? সেত চার দেওয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে আরও সুবিধাজনক, সহজলভ্য। তবে? সেত শুধু এসেছে সুকুমারের মন রাখবার জন্যে। কাজেই বিউটিস্পটের কথা বাদ দিয়ে বললে, তবু আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

আপনার ওই গ্রাম ছেড়ে, শহর ছেড়ে, কলকাতায় যাওয়াই উচিত।

কেন?

হাজার হলেও কলকাতা রাজধানী। রাজধানী মানেই সব কিছুর সুযোগ সুবিধা, সবচেয়ে বেশি মেলে ওখানে। আপনার সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা, যথার্থ মর্যাদা পাবে। সে সুযোগ দিতে পারবে না ওই গ্রাম, আর এই মফঃস্বল শহর।

কথাটা যুক্তিযুক্ত। সুকুমার প্রতিবাদ করতে পারল না। সকলেই কলকাতায় ছুটতে চায় এই জন্যেই। কিন্তু সুকুমার কোন ভরসায় যাবে? তাই শুভ্রার কথায় হেসে উঠল সে।

শুভ্রা বললে, হাসছেন যে ?

সুকুমার বললে, আকাশ কুসুম আলোচনা শুনে।

আকাশ কুসুম ?

তা ছাড়া কি ? রাজধানীর মানুষ হওয়া কি সহজ ? তার তকমা চাই। রাজার হাতের ছাপ মারা পাঞ্জা চাই। নইলে ঢুকতে দেবে কেন ? থাকতে দেবে কেন ?

একি হেঁয়ালি ? —শুভ্রার মনে হচ্ছিল।

সুকুমার বললে, যা দিনকাল। দেশ জুড়ে বেকারত্ব। কলকাতায় যাব কোন অবলম্বন নিয়ে ? একটা গোটা সংসার কাঁধের ওপর।

চাকরী। চাকরী একটা কিছু জোগাড় করে নিতে পারবেন না ?

অত কি সহজ ?

কেন ? অত ভাবনার কি আছে ? আমার বাবার পরিচিত কতজন আছে। চাকরী একটা হয়ে যায়, যদি আপনি যেতে রাজী থাকেন। তারপর যা করবার সেত আপনার—।

তখন পৃথিবীতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে শুভ্রা যুক্তি দিল। সুকুমারকে উদ্বুদ্ধ করল। সুকুমার হঠাৎ জবাব দিতে পারল না।

শুভ্রাই আবার বললে, প্রথমে যদি চাকরী নাই জোটে আমাদের ওখানেও থাকতে পারেন। অকারণে নয়। আমার একজন গার্জেন টিউটর হিসাবে। তার জন্যে, এ চাকরীতে যা মাইনে পান তাই পাবেন। প্রস্তাবটা দ্রুত পেশ করেই শুভ্রা থেমে গেল। নদীকিনারে জলের ছলছল শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

সুকুমার এর রহস্য ঠিক বুঝে উঠল না। শুভ্রার গার্জেন টিউটরের মানে ? অর্থ দেখিয়ে করুণা করতে চায় ? বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরেই সে প্রশ্ন করল, গার্জেন টিউটর মানে ?

শুভ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ভুল বুঝবেন না। গার্জেন টিউটর চাই। আপনি নাহলেও একজনকে আমার দরকার। বাবার ইচ্ছে আমি দেশ বিদেশে ঘুরি। —সমস্ত পৃথিবী। তার আগে মোটামুটি ভাবে

সাধারণ বিচার বুদ্ধি, জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন দরকার। তার জন্যেই একজন টিউটর দরকার। অবশ্যই তিনি আমার নির্বাচিত হবেন। নাহলে গুরুর প্রতি শিষ্যের আস্থাহীনতার সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম, আপনি যদি রাজী হন....তারপর আপনাকে নিয়েই পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়ে পড়তে পারি।

কি বলছে শুভ্রা ? সুকুমার দিশা খুঁজে পায় না। কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলকাতা, কলকাতা ছেড়ে পৃথিবী....। সুকুমারের মনে কয়েকটি মুখ জেগে উঠল। পরিচিত মুখ। তারা বিদেশ ঘুরে এসেছে। অনুপমবাবু। বেঢপ চেহারার ভদ্রলোক। কোন রকমে বি. এস. সি পাশ করে এখানে কেরাণীগিরির বেশি কিছু জুটছিল না। বাপের পয়সা ছিল। আমেরিকা চলে গেলেন। বছরখানেক পরে ফিরে এলেন কি এক ডিগ্রী নিয়ে। মোটা মাইনের সরকারী চাকরী জুটে গেল অমনি। শুধু জীপ হাঁকিয়ে ঘোরেন। চেহারায় মানায় না বলে আর অতিরিক্ত ঘামেন ব'লে ধুতি পাঞ্জাবিই পরেন। কিন্তু বিদেশ ঘোরার চিহ্নস্বরূপ একটা লম্বা পাইপ মুখে লাগিয়ে রাখেন সর্বদা। পরিচিত মহলে সুযোগ পেলেই একবার বলে নেন, ফরেন গিয়েই এ অভ্যাসটা আমার হল। পাইপই আমার আমেরিকা।

সুকুমারের আরও মনে পড়ল অনন্তকে। এইত দিন কতক আগে তার সঙ্গে দেখা। কলেজের সহপাঠী ছিল। আই. এ. পাশ করে কলকাতার এক বিদেশী দোকানে চাকরী নিয়েছিল সেল্‌স্‌ম্যানের চাকরী। সেখান থেকে কোম্পানী তাকে ভাল করে দোকানদারী শিখবার জন্যে তাদের হেড অফিসে বিলেতে পাঠিয়েছিল। কিছুদিন আগে সে দেশে ফিরেছে। পথে দেখা। সুকুমারই প্রথম সম্ভাষণ করল। আর অনন্ত কেমন একটা উদাসীন হাসি হেসে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পাশ কাটাল। সুকুমার অপ্রতিভ হয়েছিল। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতেই আরেক বন্ধু উমাপদ বললে, অনন্ত এখন অন্য মানুষ। সামনের সপ্তাহে বিয়ে। এম. এ. পড়া মেয়ে। সুন্দরী। সম্ভ্রান্ত ঘর। যৌতুকও পাচ্ছে অনেক টাকা। তাও কত সাধ্য সাধনা করে দিচ্ছে।

সে মেয়ের এক জায়গায় বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল সে ছেলে কোথায় যেন সাব-ডেপুটি। এম. এ. পাশ। কিন্তু মেয়ের বাবা সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে অনন্তকেই ধরলেন। অনন্ত আবার এক বছরের জন্যে দোকানদারীর ট্রেনিং নিতে বিলেত যাচ্ছে। বৌকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যাবে। মেয়েরও নাকি বিলেত ঘুরবার খুব সখ। কাজেই অনন্ত এখন বীর। সে কথা বলবে কেন তোমার-আমার সঙ্গে? কবে কার সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছিল মানে কি আমরা তার সমান স্তরের লোক?

সেই বিলেত? অনন্তর বিলেত, অনুপমবাবুর আমেরিকা? হ্যাঁ, সুকুমারও ঘুরতে চায়। তবে ওঁদের মত মন নিয়ে, সে ঘুরতে চায় না। সে যাবে এক দেশের মানুষ যেমন অন্য দেশ ঘুরতে যায়। মিশবে, জানবে, বুঝতে চেষ্টা করবে তাদের। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলা-মেশার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আনবে। ভেঙে আনবে সংকীর্ণ গণ্ডীর আপদ বালাই। ভাবতে ভাবতে সুকুমার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ক্রমেই কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ছিল উঁচুতে, আরও উঁচুতে।

শুভ্রা পাশে বসে জবাবের অপেক্ষা করছিল। রাত্রি বেড়ে উঠছে! শুভ্রা আবার প্রশ্ন করল, কি হল, জবাব দিলেন না যে?

সুকুমার চমকাল। এ্যাঁ—

বলছেন না—রাজী কি না?

বলতে হবে?

বা-রে!

ঠিক সেই সময় পাশের নির্জন পথের ওপর দুজন পুরুষের অট্টহাস্য ফেটে পড়ল। সুকুমার সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

কি হল? শুভ্রা প্রশ্ন করল।

উঠুন।

কেন?

রাত হয়ে গেছে। এখানে ভদ্রলোকদের পক্ষে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। রাতের পর্দা নিশাচরদের জন্যেই। চলুন ফিরি।

শুভ্রা উঠল। এখনই ফিরবেন? চলুন না আর কোথাও বসি।

সুকুমারও তাই ভাবছিল। দুজনে এসে আবার কলেজের মাঠে বসল। প্যাভেলিয়ানটার একটু দূরে।

আবার শুভ্রা সেই প্রসঙ্গ তুলল। কি হল? আমার প্রস্তাবে আপনার মত আছে? বিশ্ব-পরিক্রমায় যাবেন? না এই পচা মামুলি গ্রাম নিয়ে মজে থেকে নিজেও হেজে পচে জীবনটাকে শেষ করে দেবেন? বলুন কে না চায় নিজের উন্নতি? আপনি যদি তা না চান —তবে জানিনে আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কেমন। বলুন—রাজীত?

তা—তবু কেমন ইতস্তত করছিল সুকুমার। শুভ্রা বলে উঠল, ওসব মেয়েলি ভাব রাখুন। বলুন যাবেন কি না, সোজা কবে।

সুকুমার থতমত খেয়ে বললে, যাব।

যাবেন? যাবেন—ঠিক—যাবেনত? বলতে বলতে শুভ্রা মুহূর্তে উল্লাসের মধ্যে নিজেকে হাবিয়ে ফেলল। একটু পবেই সুকুমারের, কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল। তার কথার সুব, স্বব, ভঙ্গীও কেমন পাল্টে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সত্যি—সত্যি করে যাবেত? বল, বল, সত্যি···।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুকুমার বিহ্বল। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠতে লাগল।

রাত দশটা নাগাদ কলোনী অফিসারের বাসায় ফিরল ওরা। শুভ্রার দিদি বললেন, খুব বেড়ান হল। উনি খেতে বসবেন একসঙ্গে বলে অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্যে।

কলোনী অফিসার হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, তাতে কি। ঠিক আছে। গবমের রাত দশটা—বেশি নয়।

খেতে বসে শুভ্রা বললে, জান দিদি, সুকুমার বাবু আমার গার্জেন টিউটর হয়ে কলকাতায় যেতে রাজী হয়েছেন। তারপর আমার সঙ্গে বিদেশেও বেড়াতে যাবেন।

তাই নাকি? শুভ্রার দিদি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। খুশীর ঝোঁকে অনেকটা মুরগীর রোষ্ট সুকুমারের প্লেটের ওপর চাপিয়ে দিলেন।

সুকুমার হাঁ হাঁ করে উঠল। কলোনী অফিসার হেসে মোলায়েম স্বরে বললেন, ঠিক আছে ভায়া। খেয়ে নিন্। বিদেশে গেলে এই-সবের ওপরেই থাকতে হবে। যান, শুভ্রার সঙ্গে একবার ঘুরে আসুন ও দেশগুলো। কি হবে এদেশে পচে মরে? দেখুন যে-বাঙালী ঘর ছাড়তে পেরেছে সেই মানুষ হয়েছে। শুধু বাঙালী কেন, সব জাতির পক্ষেই এ পরীক্ষিত সত্যি। কাজেই সুযোগ যখন পাচ্ছেন—

এগারটার পর সুকুমার বেরিয়ে এল কলোনী অফিসারের বাসা থেকে। শুভ্রা দরজার কাছে এসে বিদায় দিল, একটু আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে। কি আশ্চর্য শিহরণ। সেই সঙ্গে বিচিত্র স্বপ্ন সাধ-এর মিশ্রণে সুকুমারের মনে যেন এক আনন্দের ককটেল বয়ে যেতে লাগল।

রাস্তায় নেমে সেই আনন্দেই সুকুমার পথ হাঁটছিল। আর মনে মনে আবৃত্তি করছিল রবীন্দ্রনাথকে ঃ

'সাত কোটি সন্তানেরে—হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।'

তন্ময় সুকুমার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কাছে এসে পড়ল। কয়েক পা গেলেই বাড়ির দরজা। হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবেই, সেই সময় কে যেন ডেকে উঠল, স্যার—

কে স্যার? কিসের স্যার? কোথায় স্যার? কাকে ডাকছে? সুকুমারের মনে হল সেত একটি যুবক। যৌবনের তাড়নায় উন্মত্ত। তবে? থমকে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিশ্লেষণী প্রবাহ বইল চিন্তার। এ-ডাক, বুঝি কালের অন্তরাত্মার ডাক। যুগ যুগ ধরে সে উন্মত্ততাকে রুখে আসছে অবিরাম ভাবে। সংযমকে মুক্ত করে দৃঢ়বদ্ধ জীবন-ছন্দ গড়ে তুলছে পৃথিবীর!

কে, কে? সুকুমার বিহ্বলের মত চেঁচিয়ে উঠল। অমনি তিনজনা সামনে এসে দাঁড়াল। শ্রীমন্ত আইচ, সাধুচরণ, গৌরীশংকর। তারা হাত তুলে নমস্কার করতেই সুকুমার পিছিয়ে গেল দু'পা। ভয়েই।

অপরাধীর ভঙ্গীতে কুঁকড়ে উঠল। ওর মনে হতে লাগল, তিনজন রুদ্র কাপালিকের উদ্যত খাঁড়ার সামনে সে যেন একটা বলির পাঁঠা দাঁড়িয়ে আছে। নিরুপায়, নিঃসহায়। কোন কথা বলতে পারল না।

সাধুচরণ বললে, হুজুর, স্যার, আমাদের ছেড়ে চলে এলেন। এখন আমরা কি মরব? বলুন—আপনার দরজায় মাথা ঠুকে—সাধুচরণ কেঁদে ফেলল।

কোথায় শুভ্রা? কোথায় তার সাহায্য আর বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাবলীলা? সুকুমারের চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল বন্দীপুরের কলোনী, তার মানুষগুলোর অন্ন নেই, বস্ত্র নেই অর্থ নেই, আশ্রয় নেই। তাদের জন্যেই সে শহরে এসেছিল। এসে? বিলাস—বিলাসের পরিণতি? এই অসহায়তা, এমনি মূক বধির হয়ে যাওয়া, দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাওয়া, পলায়নী প্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ....। জোর করে নিজেকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল সুকুমার। বললে, লোন এখনও মেলেনি।

না, মিলুক। গৌরীশংকর বললে, আপনি কলোনীতে ফিবে চলুন। আপনার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। তাদের সব বলবেন।

সুকুমারের মনে আঘাত লাগল। তার মানে? জবাবদিহি করতে হবে। কেন? পরক্ষণেই মনে জবাব উঠল, সে যে বেতনভোগী কর্মচারী। জীবিকার বিনিময়ে তুলে নিয়েছে গুরুদায়িত্ব।

সুকুমাব বললে, আচ্ছা, তোমরা যাও। আমি যাব।

না, না স্যার। গৌরীশংকর প্রতিবাদ জানাল। আমরাও যাব না তাহলে। কলোনীতে গিয়ে কি বলব? খিদেয় মানুষ সব রাক্ষস হয়ে আছে। ছিঁড়ে খাবে। কাল সকালে আপনাকে নিয়েই যাব।

শ্রীমন্ত আইচ বললে, হ্যাঁ, এ রাতটুকু এই দরজাতেই বসে থাকব।

সুকুমার আর দাঁড়াতে পারল না। কোন রকমে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর টলতে টলতে গিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে।

সকালবেলা সুকুমার বন্দীপুর যাত্রা করল। সঙ্গে শ্রীমন্ত আইচ,

সাধুচরণ, গৌরীশংকর।

কলোনীর মানুষগুলো অপেক্ষাতেই ছিল। ওরা কলোনীতে প্রবেশ করতেই চারদিক থেকে পঙ্গপালের মত ছুটে এল, ঘিরে ধরল।

লোন—টাকা—হয়েছে? পাওয়া গেছে?

শ্রীমন্ত আইচ বললে, না। আজও লোনের সাড়া নেই। তাই আমাদের মালিককেই ধরে আনলাম। লোনের কোন ব্যবস্থাই হয়নি এখনও।

হয়নি? মুহূর্তে তুবড়ির মুখে যেন আগুন লেগে গেল।

বুভুক্ষা—অসহায়তার প্রকাশ কি নির্মম। মানুষের যুগ যুগ সাধনায় অর্জিত মনুষ্যত্ব, সভ্যতা-ভব্যতাকে কত সহজে পরাজিত করে। এদেরই সুকুমার একদিন ধুবুলিয়া থেকে এনেছিল। এরাই সুকুমারকে মান্য করেছে। আজ? তারা উগ্র চীৎকারে কলোনীর মাঠ ভরে তুলল।

লোন আজও এলো না কেন? আমরা তবে খাব কি? আমরা কেমন করে বাঁচব? জবাব চাই—জবাব।

সুকুমারের নাকের কাছে ঘুষি বাগিয়ে বলে উঠল, ওঃ অফিসার.... ভাত দেবার ভাতার নয়—কিল মারবার গোঁসাই। অফিসার.... পাবলিকের চাকর....জবাব চাই।

ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কেঁদে ফেলল জ্বালায়। অভিযোগের সুরে বললে, হুজুর, আমরা কি মানুষ না? প্রাণ নেই, খিদে নেই? তবে—তবে? হুজুর—

সুকুমার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অক্ষম, অসহায়। শেষ পর্যন্ত বিপন্নের ভঙ্গীতে হাত দুখানা জোড় করে ধরল উদ্বাস্তুদের সামনে।

শরীরটা খারাপ। ক্লান্ত। আমাকে যেতে দাও এখন। তারপর সুকুমার পালিয়েই এল এক রকম চার পাশের কটু মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে।

বেশ। কলোনী অফিসার না হয় ফিরে এল কলোনীতে। তাতে কলোনীর কি সুবিধা হল? লোন, অন্ন, অর্থ?

সাধুচরণ তাঁবুর মধ্যে গিয়ে দেখল, তার বৌ অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তার উপোস চলছে কদিন। যা ভাঁড়ারে ছিল তাতে হয়ত কদিন

চলত। কিন্তু পাশেই বামুন পরিবারটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মরছিল। তাদের সাহায্য করতে গিয়ে নিজেরা দেউলে হয়ে গেছে। কিছুদিন থেকে সারা কলোনীতেই এই দেউলেপনার কাহিনী গড়ে উঠছে শুধু। সাধুচরণ বৌকে বাধা দিয়েছিল। নিজেকে বাঁচিয়ে তবেত দান। অন্যকে বাঁচান পুণ্য কাজ। কিন্তু তাব জন্যে নিজেকে মারা পাপ। কারণ নিজের আত্মা পবের আত্মায় ভেদ নেই।

সাক্ষাৎ মৃত্যু আর অসহায়তাব মুখে এসব তত্ত্ব মানতে পারেনি সাধুচরণের বৌ। ছোট কচি বাচ্চারা মরবে আর সে বুড়ো মাগী বাঁচবে কোন লজ্জার মাথা খেয়ে? তাই দেউলের দায়ে পড়েছে ওবাও।

উপোস তিন রকম। শাস্ত্রীয় অর্থাৎ দেহরস শুকানোর উদ্দেশ্যে। প্রতিবাদে সত্যাগ্রহী হিসাবে। আর তৃতীয় হচ্ছে, বাধ্যতামূলক। —নিরুপায়তা যার উৎস। সে বড় মারাত্মক। কারণ তার পিছনে কোন আর্দশ, কোন শক্তি নেই।

সেই উপোসই এখন কলোনীর ঘবে ঘরে। সাধুচরণের বৌ কেঁদে ফেলল, আর বাঁচব না। যাওয়াই ভাল। এ জন্মেব পাপ চুকে যায়।

সাধুচরণ শিউরে উঠল। ও মরে গেলেত লোন পাওয়া যাবে না আর? একা, বৌ না থাকলে লোন পাবার আইন নেই। না। সাধুচরণ একে মরতে দিতে পারে না কিছুতেই।

এক নিবিড় উত্তেজনা নিয়ে সে বাইরে আসতেই কান্নার আর্তনাদ ভেসে এল কানে। জগন্নাথ মণ্ডলের যে ছেলেটা সদ্য আমাশয় থেকে ভুগে উঠেছিল, খাদ্যাভাবে মারা গেল এক্ষুনি।···

সুকুমার কলোনী থেকে পালিয়ে এসেছে বটে। কিন্তু রেহাই নেই তবু। বিবেকের কাছ থেকে পালাবে কেমন করে? কোথায় পালাবে? কৃষ্ণনগর? কলকাতা? ভারতবর্ষের বাইরে? বিশ্ব-পরিক্রমায়? জ্ঞান বুদ্ধি, সুযোগের সাহায্যে অনেক অনেক উঁচু, হয়ে যাবে?

কিন্তু যে এই সামান্য জীবনের, এই সামান্য ছোট্ট পরিবেশের এই দায়িত্বটুকু পালন করতে পারে না, পালিয়ে যেতে চায়, সে কি করবে তার বৃহত্তর জীবনে? কর্মই কর্মের প্রেরণা জোগায়। বর্তমান ভবিষ্যতকে

প্রেরণা দেয়। আজকের পলায়নীবৃত্তির বীজইত লালিত হয়ে কালকে মহীরুহ হয়ে উঠবে।

না। সুকুমার অপরাধ স্বীকারে প্রস্তুত। প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী। অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু তার জন্যে কি রামবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে?

ভূপালবাবু যুক্তি দিলেন, অবস্থা জটিল। এতগুলো মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তারা যদি খাদ্য না পায়, সাহায্য যদি না পায়, তাহলে শুধু সরকারী লোকের ক্ষতি করবে না। গাঁয়ের বুকেও লুঠতরাজ চালাতে পারে। খুনখারাপী হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজেই গাঁয়ের মঙ্গলের জন্যেই সকলে মিলে এক জায়গায় বসা দরকার। ভাবা দরকার, আপাততঃ কিভাবে এদের সামলে রাখা যায়, কি সাহায্য করে।

সুকুমার ভূপালবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তাই করুন ভূপালবাবু।

উপেন শিকদার শুনে টুনে চেঁচিয়ে উঠল, বলেছিলাম তখন,—এ পোড়া দেশে, এ জায়গায় আমরাই ধুঁকে মরার দল। এর মধ্যে আর রিফিউজীদল এনো না। কলোনী কোর না। তখন শোনা হল না রামচন্দরের। এখন কেমন ভুগান্তি হচ্চে!

ভূপালবাবু বললে, কিন্তু উপায়ত নেই উপেনদা। একটা কিছু হিল্লে করতেই হবে, গাঁয়ের শান্তি রাখতে গেলে।

মরুক গাঁ। বেঁচে থেকে আর সুখ নেই। এখন মরাই ভাল। ওই রামচন্দরের জন্যে ছয়লাপ হল গাঁ।

সুকুমার বললে, উপেনদা, এখন আর অভিমান করবেন না। একটু চেষ্টা করুন যাতে উপোসী মানুষগুলো বাঁচে। আপনারা না হলেত—

উপেন শিকদার বললে, সে সভাত দিনে হবে না। সন্দেবেলা। বলচি গে সকলকে। খবর পাঠিয়ে দিচ্চি।

সন্ধ্যাবেলাতেই সভা বসবে গ্রামের লোকের। ভূপালবাবুর বৈঠকখানাতেই সভা হবে। সুকুমার তাই বিকেলবেলা ঘরেই বসে

ছিল। কলোনীর এক ছোকরা ছুটে এল ওর কাছে। শিগ্‌গির আসুন স্যার। কলোনীতে চোর ধরা পড়েছে।

চোর? কলোনীতে চোর?

সুকুমার কোন কিছু জিগ্যেস করবার আগেই ছোকরা বলে গেল। আসুন স্যার, আপনাকে সব ডাকছে। শিগ্‌গির।

সুকুমার কিছুই বুঝল না। অনুমান করতেও পারল না। জামাটা গায়ে চাপিয়ে পথে নেমে ছুটতে আরম্ভ করল কৌতূহল নিয়ে। কলোনীতে এসে সে অবাক হয়ে গেল। চোখকে বিশ্বাস হয় না। সাধুচরণের হাত দুখানা পিচমোড়া করে বাঁধা। তাকে নিয়ে কলোনীর মানুষের জটলা। মাঝখানে রামবাবু দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছেন।

ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে। সাধুচরণ ধার্মিক। তাই মন্দিরের দেখাশুনার ভার তার ওপর ছিল। সেই সুযোগে সে মন্দিরের মৃদঙ্গ একটা চুরি করে বন্ধক রাখতে গিয়েছিল উষা গ্রামের রহিম সেখের কাছে। সে ধরিয়ে দিয়েছে।

রামবাবু উত্তেজিত। বলছেন, শালা চোর—

না, না, হুজুর—সকাতরে সাধুচরণ বলছে, আমার দোষ নেই। কাল ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেছি। মন্দিরের ৺গোপাল নিজে আমাকে বললেন, তোদের এত কষ্ট—ভাবছিস কেন, তোর হাতেত দুখানা খোল আছে। এখন বোশেখ মাস নয়। ও দুখানা কাজে লাগে না। একখানা বন্ধক দিয়ে টাকা এনে খেয়ে বাঁচ। হিল্লে হোক। লোন পেলে খালাস করে দিস্‌। তাই....তাই আমি—

চুপ শালা। রামবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। স্বপ্ন শেখাতে হবে না। স্বপ্ন দেখার ওষুধ আমার জানা আছে।

সুকুমার ভীড় ঠেলে সামনে যেতেই সাধুচরণ এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। —হুজুর, সত্যি স্বপ্ন দেখেছিলাম। পষ্ট। আমাকে যে গোপালঠাকুর বললেন, যা, পাপ নেই এতে—পেটের জ্বালা, বড্ড জ্বালা।

আবার—চুপ, চুপ শালা শয়তান। রামবাবু আবার হুংকার দিয়ে

উঠলেন। ধর্ম নিয়ে পাষণ্ডগিরি। ওর পাপে ডুবে মরবে সারা কলোনী। মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়াতে হবে। ভগবানের নাম দিয়ে চুরি....স্বপ্ন দিয়েছেন ওকে? চোরকে? ও মুখ পুড়ে যাবে যে—ওর ছায়াতেও পাপ। শালা সাধু—ওকে চরম শাস্তি দেওয়া দরকার।

কারো মুখে কথা নেই। বিকেলের বিদায়ী সূর্যের আভা মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লান্ত করুণ পরিবেশ। সুকুমার ভাবছিল, হাবুল কর্মকার স্বপ্ন দেখেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করল, আর সাধুচরণ স্বপ্ন দেখেই খোল চুরি করল। এ দুয়ের মধ্যে কোন নিগূঢ় যোগ আছে কিনা কে জানে। তবে সাধুচরণের খোল চুরির স্বপ্নের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় হয়ত ফ্রয়েডের স্বপ্ন তত্ত্বের মধ্যে।

রামবাবু বললেন, ওকে জরিমানা দিতে হবে। দশ টাকা। ওই টাকা নিয়ে ৺গোপালদেবের ভোগ হবে একদিন। তারই প্রসাদ আর শান্তিজল সকলের খাওয়া দরকার এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে।

নবীনের ভাই জীবন অমনি বলে উঠল, দাও শালা টাকা। নইলে বাঁধন খোলা হবে না। কারো পকেট-মারা নয়। ঘরে ঢুকে চুরি নয়। —একেবারে ধর্ম নিয়ে অধর্ম? তাঁবুতে উঠতে দেওয়া হবে না। মুখে জল পর্যন্ত উঠবে না। বৌ কেঁদে কেঁদে গলায় দড়ি দেবে। আত্মার সদ্গতি হবে না।

সামনেই ঘোমটার আড়াল দিয়ে সাধুচরণের বৌ দাঁড়িয়ে। কালো মিশমিশে রঙ। প্রৌঢ়া অসহায়া। কাঁদছে। নানান জেলার মানুষ নিয়ে কলোনী। কে কার? তার ওপর রামবাবুর বক্তৃতা। দশ টাকা চাই। কিন্তু টাকা কোথায় পাবে সাধুচরণ? টাকা থাকলে কি আর—

সাধুচরণ আবার আছড়ে পড়ল সুকুমারের পায়ের ওপর। হুজুর —আপনি মা-বাপ—হুজুর—

সুকুমার দুপা পিছিয়ে গেল! একজন প্রৌঢ় একজন তরুণের পায়ে পড়ছে, এটা পাপ নয়? সুকুমার বলে উঠল, ছেড়ে দাও ওকে।

কি—কি—রামবাবু যেন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, চোরকে আস্কারা দিতে হবে? পেটের জন্যে ধর্মকেও মানবে

না যে মানুষ তাকে ক্ষমা করবে মানুষে ?

সুকুমারেব সঙ্গে রামবাবুর বাক্যালাপ নেই। সুকুমার ক্ষেপে উঠল মনে মনে। এ কলোনীর আইনতঃ মালিক কে ? কিন্তু সে-ই বা কি করতে পেরেছে এইসব অসহায় মানুষগুলোর জন্যে ? পেটের জ্বালায় সাধুচরণের পদস্খলন সত্যি ঘটনা। লৌকিক ধর্মকে অতিক্রম করেছে জীবন-ধর্ম। তবু সুকুমার পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারল না। তার ইচ্ছা সাধুচরণকে মুক্তি দেয়। কিন্তু পরিবেশ উত্তেজনায় আচ্ছন্ন। তাই পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বার করে ফেলল। কে নেবে জরিমানার টাকা ?

হুজুব—সাধুচরণ কৃতজ্ঞতায় সুকুমারের পায়ের ওপব মুখ ঘষতে লাগল।

কে নেবে টাকা? কলোনী অফিসার টাকা দিচ্ছেন। সবাই হকচকিয়ে গেল। রামবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, একেই বলে আস্কারা। অধর্মের সমর্থক। ঝাণ্ডাওয়ালার দল। বুঝে নাও সব।

সুকুমারও উদ্বাস্তুদের লক্ষ্য করে বলে উঠল, তোমাদেরওত খাদ্য ফুরিয়েছে। কি করবে এখন সব ? জমিদারবাবু কি খাদ্য দেবেন ? জিগ্যেস কর দেখি।

জোড়া জোড়া চোখের দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল রামবাবুর ওপর। রামবাবু উত্তেজিত। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কি ভাবলেন একটু। তারপরেই জোবের সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ দেব। এ কলোনীকে বাঁচাতে পারে একমাত্র রাম মণ্ডলই। বল তোমাদের কার ঘরে চাল বাড়ন্ত ?

সবারই ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বেশ। মাথা উঁচু করে উচ্চকণ্ঠে রামবাবু ঘোষণা করলেন, খোলা বাজারের চালের দোকান আজই খুলেছি। বিক্রী আরম্ভ হয়নি। যাকগে। তোমরা দুবস্তা চাল নিয়ে এসো আমার আড়ৎ থেকে। আরও জোরে চেঁচিয়ে তিনি বললেন, খয়রাতি করলাম। খয়রাতি—

ডুবস্তা চাল খয়রাতি। সে কি কম শোকাবহ। শুধু ওই সুকুমারবাবুর জন্যে।

ঠাকুরবাড়িতে নিজের দলবলের সামনে দাঁড়িয়ে রামবাবু সুকুমারের বিরুদ্ধে আস্ফালন করছিলেন। সে সময় অরুণ ঘোষ বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই খুকু প্রশ্ন করল, কি হয়েছে অরুণদা?

অরুণ বললে, আজ কলোনীতে মহাকাণ্ড হয়ে গেল।

কি রকম?

কলোনীর মন্দিরের একখানা খোল রহিম স্যাকের বাড়ি বন্দক রাখতে গিয়েল সাধুচরণ শালা।

তারপর।

ধরা পড়েচে। আমাদের বাবু বুলল, দশ ট্যাকা জরিমানা নাগবে। সবাই এককাট্টা। কেন্তুক ওই যে আমাদের অফিছারবাবু—

খুকুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আরও উৎকর্ণ হল।

অরুণ ঘোষ বললে, সব্বনাশ করল উনি। শালা চোর পা ধরতেই গলে গেল। নিজের পকেট থেকে ট্যাকা বার করে বুলল, এই নাও। একটু অবজ্ঞা জড়িয়ে অরুণ ঘোষ বললে, আমাদের কত্তাবাবু বুলচে, ও হাকিমী করতে পারবে ক্যানে? মানসের চোকের জল দেখলে নরম হয়ে যায় যে মানুষ সে বিচার করবে ক্যামন করে? মেলচ্চ শয়তানত না খেয়ে মরবেই। মহাপাতকী সব। তাদের জন্যে পরাণ কাঁদে....।

কাঁদে? চিঠির জবাব দেয় না যে তারও পরাণ কাঁদে? কি এক আশ্বাসে খুকু ভরে উঠল। সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরে একখানা কৃষ্ণের ফটো আছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গলায় আঁচল তুলে দিল। হাত দুটো কপালে ঠেকাতেই চোখ দুটো বুজে এল। ঠাকুর—ঠাকুর। মনে মনে বলতে লাগল।

রামবাবু ডুবস্তা চাল বার করে দিয়েছেন। উদ্বাস্তুরা কলোনীতে নিয়ে এসে ভাগ-বাঁটোয়ারা আরম্ভ করল। সে চাল সাধুচরণ নিল না। আর নিল না গোপীনাথের মা। গোপীনাথের মা বললে, না। ও চাল নেব না। দরকার নেই আমাদের।

দরকার যথেষ্টই আছে। তবু না নেওয়ার কারণ জানে পাশের তাঁবুর—কেউ কেউ। সবচেয়ে ভাল জানে নবীন জীবনরা। ওদের তাঁবুর সঙ্গেই ছিল গোপীনাথের মা। একদিন কি মতিচ্ছন্ন হল, সোজা নবীনের বৌকে আক্রমণ করল।

হা বৌ, তোমার একটুও লজ্জা ঘেন্না হয় না? হোলই বা জমিদার, বড়লোক। পুরুষ মানুষত—পরপুরুষ। রাতদিন হাঁ করে বৌঝির মুখের সামনে বসে থাকবে কেন? তোমার স্বামী-দেওর না হয় বলতে পারে না। কিন্তু তুমি? তুমি কি করে ওর সামনে এসে বস? ছিঃ ছিঃ।

অপমানে আরক্ত হয়ে উঠেছিল নবীনের বৌ। তাঁবুর মধ্যে বসে বসে কাঁদছিল। নবীন এসে প্রশ্ন করেছিল, আবার কান্নার কি হল? মন খারাপ করছে, মা-ভাইদের সন্ধান পাওয়া গেল না ব'লে? দেশের জন্যে?

নবীনের বৌ কেঁদে কেঁদে গোপীনাথের মার কথা বললে।

শুনে নবীন খেঁকিয়ে উঠল, ওরা বলবার কে? ওদের কি ঘাড়ে চেপে আছি আমরা?

তাঁবু থেকে বেরিয়ে সোজা রামবাবুর কাছে গেল, দেখুন, আপনি আমার তাঁবুতে যান, তাই নিয়ে গোপীনাথের মার কি সব বিশ্রী কথা-বার্তা। বৌটা ছেলেমানুষ। শুনে কেঁদে খুন। অনেক কষ্টে আপনার আশ্রয়ে এলাম। তাও....

রামবাবু দাঁতে দাঁত চাপলেন। সুকুমার তখন কৃষ্ণনগরে। কাজেই পরদিনই রামবাবুর আদেশে গোপীনাথদের অন্য তাঁবুতে উঠিয়ে দেওয়া হল। দূরে। সেই অপমানের প্রতিবাদেই রামবাবুর চাল নিতে রাজী নয় গোপীনাথের মা। নিল না।

রাতে গৌরীশংকর তার স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা শুনল। পরদিন সকালে উঠেই সুকুমারের কাছে ছুটে এল।

ভূপালবাবু, উপেন শিকদারের চেষ্টা সত্ত্বেও সভা বসেনি। কেউ জোটেনি সভায়। তার জন্যে সুকুমারের আর দুঃখ নেই। রামবাবুর কাছ থেকে দুবস্তা চাল বেরিয়ে এসেছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো খেতে পেল। এতেই সুকুমার খুশী।

কিন্তু গৌরীশংকর এসে ভাবিয়ে তুলল। এখন কি হবে স্যার? একটা পরিবার উপোস করে মরবে?

সুকুমার চিন্তিত হল। গোপীনাথের মা—এই কলোনীর মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতা। সুকুমার তার সম্বন্ধে অনেক ভেবেছে। কলোনীর অনেক উপকার হবে ওঁর দ্বারা। কিন্তু....।

গৌরীশংকর বললে, স্যার, উপোস করবে ওরা, অথচ কাউকে বলবে না। আপনি কিছু সাহায্য না করলেত বাঁচবে না। কিছু দিন।

সাধুচরণের জরিমানার টাকাটা আর লাগেনি। তার পাঁচ টাকা সাধুচরণ নিয়েছে উপোস বাঁচাতে। বাকী পাঁচ টাকা গৌরীশংকরের হাতে তুলে দিল সুকুমার। বললে, তোমরা কলোনীর যুবক। দেখো ওদের একটু।

নিশ্চয়।

গৌরীশংকর কলোনীতে গিয়ে সুকুমারের এই দানের কথাটা ফলাও করে ঘোষণা করে দিল, কারণ দানটা সেই আদায় করে এনেছে।

সে টাকা গোপীনাথের মা নিল। রামবাবুর দোকানেই ছেলেকে চাল কিনতে পাঠাল।

আষাঢ় মাস। আকাশে বর্ষার ঘনঘটা। কনট্রোল আর প্রকিওরমেণ্টের যুগে সকলের ঘরেই চাল বাড়ন্ত। তার ওপর বর্ষায় কাদায় গ্রামের পথ দুর্গম। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায়। চাষী-মজুরের কাজ বন্ধ। অর্থ আর খাদ্যের হাহাকার গ্রামে গ্রামে। সেই সময়ে খোলাবাজারের লাইসেন্সধারী রামবাবুর চড়াদামের চালের ব্যবসা সুরু। প্রতি বছরেই অর্থোপার্জনের এই একটা মরশুম তাঁর। মোটা মুনাফা হয়।

এবারেও তাঁর ব্যবসা সুরু হয়ে গেছে। বুভুক্ষু, বিপন্ন মানুষ ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে ছুটে আসছে তাঁর খদ্দের হয়ে। জোর কেনাবেচা চলেছে। তাই সর্বক্ষণই রামবাবুকে ঠায়ে বসে থাকতে হয়। সার-বেঁধে খদ্দের দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে গোপীনাথ ধামা-হাতে এসে দাঁড়াতেই, রামবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর চাল নেয়নি গোঁসা

করে। কিন্তু চাল কেনার টাকা পেল কোথায় ?

গোপীনাথ চাল কিনল। পাঁচ টাকার নোট বার করে দাম দিল। চলে গেল।

রামবাবুও আর বসে থাকতে পারলেন না দোকানে। প্রায় পিছন পিছনই কলোনীতে ছুটে এলেন।

মানুষমাত্রই স্বার্থের দাস। অবস্থার দাস। রামবাবুর খয়রাতি চাল পেয়ে ক্ষুধিত মানুষ তাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ সুকুমার গোপীনাথদের অর্থ সাহায্য করায় অনুকূল হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। তাঁর গুণ বিচারে কলোনী উচ্ছ্বসিত।

রামবাবু আক্রোশে ফুলে উঠলেন। জ্বলে উঠলেন প্রতিহিংসার আগুনে।

শত্রু সুকুমার সুযোগ পেয়ে যাবে বেশি, তার জয় হবে, এ হতে পারে না। রামবাবু ছুটে গোপীনাথদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাকতে আরম্ভ করলেন, মা—মা কোথায় ?

গোপীনাথের মা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে লজ্জায় জড়োসড়ো। জমিদারবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে মা বলে ডাকছেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না গোপীনাথের মা। রামবাবু এগিয়ে এসে থপ করে বসে পড়লেন পায়ের কাছে।

মা। গোপীনাথ আমার ছোট ভাইএর মত। আমার ওপর আপনি রাগ করেছেন। কিন্তু আপনার ভালোর জন্যেই এখানে উঠিয়ে দিয়েছি। নইলে বর্ষাকালে কষ্ট পাবেন যে। বলুন মা, ক্ষমা করলেন আমাকে ?

গোপীনাথের মা বিব্রত। নিরুপায়। রামবাবু আপোষ করে ফেললেন। কিন্তু এখানেই থামবার পাত্র নন তিনি। বিপদের সম্ভাবনার মূল উপড়ে দেবার তাঁর নীতি। শুনেছেন, সুকুমার এখানে ইস্কুল খুলবে বলেছে। গোপীনাথের মাকে শিক্ষয়িত্রী করে দেবে। সেলাইএর কল কেনার লোন দেবে। গোপীনাথের পড়ার ব্যবস্থা করে দেবে।

রামবাবু দুবেলা গোপীনাথের মার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলেন।

ক’দিন পর সুকুমার শুনল, গোপীনাথের মা কলোনী থেকে উঠে যাচ্ছে। রামবাবুর বড়ারে ব্যবসা আছে। সেখানে গোপীনাথ চাকরী পাচ্ছে। মা-ছেলেকে বাসা করে দিচ্ছেন রামবাবু।

সংবাদটা সুকুমারকে আহত করল। কলোনীতে এখনও লোন এল না। এখনও বসবাসই শুরু হলনা অথচ একটি পরিবার চলে যাবে? সুকুমারও গোপীনাথের মার কাছে গেল। প্রয়োজন হলে বোঝাবে।

তাতেও কোন ফল হল না। দুর্ভাবনাময় যুক্তিগুলো গোপীনাথের মার মগজে রামবাবু বেশ জমিয়ে দিয়েছেন। গোপীনাথ ছেলেমানুষ। লোন পেলেও ব্যবসা তার দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যবসা করলেও তা জমবে কি না ঠিক নেই। জমলেও কবে, কত দিনে? চাষ করতে গেলেও অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়ে তবেত বেঁচে থাকা? তার চেয়ে চাকরী—বাঁধা মাইনে।

গোপীনাথেব মা বললে, গোপীনাথ চাকরীই করবে। আমরা উঠেই যাবো। রামবাবু বলেছেন আমাদের লোন সেখানেই নিয়ে দেবেন।

সুকুমার পারল না। পরাজিতের মত বেরিয়ে এল। ওদের তাঁবু থেকে। শুধু সততা আর সহৃদয়তার দ্বারাই সব কাজ হয় না।

গোপীনাথরা কলোনী ছেড়ে চলে গেল।

যেতে হয়ত সকলকেই হবে। লোন যদি না আসে, টাকা যদি না পায়, তবে কি করে সব বাঁচবে এখানে? বাঁচার জন্যে ত কলোনী। কিন্তু ওরা ত গেল একটা হিল্লে নিয়ে। বাকী সব ওরা অমন একটা আয়ের পথ পাবে কোথায়? যাবেই বা কোথায়? গিয়ে কি করবে?

গোপীনাথরা চলে যাবার পর কলোনীতে এমনি একটা চিন্তা ছড়িয়ে পড়ল। খয়রাতির চালের ওপর নির্ভর করে কদিন চলতে পারে? তাই সবাই পথ খুঁজতে ব্যস্ত।

সব চেয়ে সহজ পথ জেলেদের। দেশ থেকে পালিয়ে আসবার সময় শুধু জালগুলো আনতে পেরেছিল। এখানে সেগুলো আবার ঝেড়ে বার করল। দিনের বেলা চেষ্টা করে জোগাড় করে আনল তালের ডোঙা গোটাকয়েক। তৈরী হ’ল সব উপার্জনের জন্যে।

তারপর রাতের অন্ধকারে, চুপিসাড়ে গিয়ে সামনের বিলের জলে নেমে পড়ল। কি আনন্দ। অনেকদিন পরে আবার তারা পুরনো অভ্যাসকে ফিরে পেয়েছে। ডোঙা চেপে, জাল নিয়ে বিলের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু জাল ফেলা কাজ। নিশুতি রাত। বিলের জলে শুধু ঝুপঝুপ শব্দ ওঠে।

প্রথমে মোড়ল সুধাংশু হালদার যুক্তিটা দিলে সবাই চিন্তিত হয়েছিল। বিলে জাল ফেলবে কি করে? উষা গ্রামের রহিম সেখ বিল ইজারা নিয়েছে। তার কাছ থেকে আবার খাজনা করে নিয়েছে এ দিগরের একদল জেলে। তাদের ফাঁকি দিয়ে, চুরি করে কি তারা মাছ ধরবে? সুধাংশু হালদার বলেছিল, তাতে কি হয়েছে? ওসব কথা ভেবে পেটের জ্বালায় মরবি নাকি?

কিন্তু চুরি করে ধরা পড়লে?

কি হবে?

কলংক, অপমান—ওই সাধুচরণের দশা।

কি হয়েছে সাধুচরণের? ও একলা ছিল, তার ওপর ধর্মখোল চুরি করেছিল, তাই রামবাবু হাত-পা বাঁধতে পেরেছিল। কিন্তু শেষ অবধি ওরই বা কি হোল? দেখলে না অফিসারবাবু কি করল? কেন? পেটের জ্বালায় চুরি করায় পাপ নেই বলে। এতো আমরা চিরকাল করছি নে। লোন এলেই খাজনা দিয়ে দেব।

যুক্তি মন্দ নয়। সুধাংশু হালদারের কথা মত তাই জাল নিয়ে বিলে নেমেছিল। রাতে। মাছ মন্দ উঠল না। কিন্তু ভাবনায় পড়ল মাছ বিক্রী নিয়ে। এ অঞ্চলের কোন গ্রামে এ মাছ বেচা চলবে না।

সাব্যস্ত হল কৃষ্ণনগর বাজারে যাবে। নয়ত পাড়ায় পাড়ায় বেচে আসবে।

তাই ভালো। অন্ধকার থাকতে থাকতে, ঝুড়িতে চেকেঢুকে মাছ নিয়ে কলোনী থেকে বেরিয়ে পড়ল সবাই।

শুধু নিরাপদ হালদার গেল না। বুড়ো বয়স, তার ওপর অথর্ব হয়ে পড়েছে আজকাল। উপোস করে দেহটাও আর চলতে চায় না।

সে বললে, বাবাসকল আমি এখানেই থাকি। এই কলোনীর মধ্যে আর গাঁয়ের ভদ্দর লোকদের বাড়িতে চুপ করে বেচে আসব। আপত্তি তুলছিল কেউ কেউ। কিন্তু বৃদ্ধের কাকুতিতে সবাই থেমে গেল। কলোনী থেকে বেরিয়ে গেল।

সকালবেলা নিরাপদহালদার কলোনীতেই মাছ বিক্রী আরম্ভ করল।

নবীনরা কিনল। রামবাবুর দৌলতে ওদের অভাব নেই। শ্রীমন্ত আইচ কিনল। হরিমোহন দাঁর সঙ্গে সে একসঙ্গে ব্যবসা করে। হরিমোহন দাঁও কিনলেন। কিন্তু দাম চাইতেই তিনি ফুঁসে উঠলেন, দাম? আরে ডাক্তার উপকারী মানুষ। তাকে দান করলে পুণ্যি হয়।

নিরাপদ বললে, বাবু পেটের জ্বালাতেই এসব করা। দেখছেনত আমাদের দশা।

তবে আমিও বলি। কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ বান ছুঁড়লেন। দামত চাচ্ছ! মাছত বেচ্ছ। ওর দাম দিয়েছ? বিলের খাজনা?

নিরাপদ হালদার যেন মরে গেল সেই মুহূর্তে। মুখে কথা নেই। হরিমোহন দাঁ জলজ্যান্ত মাছগুলো হাতে নিয়ে খুব খুশী। নিরাপদ হালদারকে পরাজিত করে মাছ নিয়ে বাসার দিকে ছুটলেন।

মাছ রেখেই আবার বেরিয়ে এলেন। খুব খুশী তিনি। বিনা পয়সায় টাটকা মাছ পেয়েছেন। স্রেফ কথার মারপ্যাঁচে। এতো গৌরবের কথা। গৌরবের কথা ঘোষণাতেই আনন্দ।

এ দিগরের তিনি ছোট ডাক্তারবাবু। গাঁয়ে গাঁয়ে রোগী দেখা কাজ। সেই সঙ্গে আপন কৃতিত্বের কাহিনীও প্রচার করে আসর মাৎ করে দিয়ে এলেন। কাহিনী গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ থেকে মুখে।

সুধাংশু হালদারের দল বেচে কিনে কৃষ্ণনগর থেকে ফিরল। বাজারে যেতে সাহস হয়নি। পাড়ায় ঘুরেই বেচেছে। তাতেও লাভ হয়েছে। হাতে দু-পয়সা এসেছে। এমনি গেলে এলে, না আসুক লোন কিছুদিন, তবুও না খেয়ে মরবে না। রামবাবুর খয়রাতি চাল নেবেনা। নিজের পথ নিজেরাই দেখে নিতে পারবে।

আবার রাত এল। নিশুতি রাতের অন্ধকারে সুধাংশু হালদারের দল গিয়ে আবার বিলের জলে নামল। ডোঙায় চেপে বিলে জাল ফেলল। শব্দ হল ছপ্ ছপ্।

অমনি অকস্মাৎ চারদিক থেকে বিলের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল চারটে টর্চের আলো। হুংকার উঠল, কোন্ শালারে—

পালাবার উপায় নেই কারো। জলে ডোঙায় বসে আছে সব।

ডাঙা থেকে তারা হাঁকল, ফিরে আয় সব ডাঙায় শিগ্ গির।

জেলেরা জাল তুলে নিয়ে ডাঙায় ফিরে এল। ডাঙায় উঠতেই আগন্তুকরা ঘিরে দাঁড়াল।

নীল পোষাক আর পাগড়িপরা চৌকিদারও আছে তার মধ্যে। চৌকিদার নির্দেশ দিল, সব কলোনীর মধ্যে চল।

চৌকিদার কলোনীতে গিয়ে সকলকে ডাকল। ঘুম থেকে ডেকে তুলল। পুরুষরা, মেয়েরা, কিছু শিশুও তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল।

কি হয়েছে ?

জেলেরা চোরদায়ে ধরা পড়েছে।

চোরদায়ে! জেলে পরিবারের বৌ-ঝিরা শিউরে উঠল। কেঁদে উঠল কেউ কেউ।

উদ্বাস্তুরা এসে চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সাধুচরণও উঠে এসেছিল। চুরির কথা শুনে সে পিছিয়ে গেল। আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

চৌকদারের সঙ্গে বিলের ইজারাদার এসেছে কজনা। তাদেব একজন সকলকে লক্ষ্য করে বলল, এরা চোর। যে বিল আমরা ঘরের পয়সা খরচা করে ইজারা নিয়েছি, এরা সেই বিল থেকে মাছ তুলে বেচে বেড়াচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি চুরি করছে। হাতে হাতে ধরেছি। এখনও ভিজে জাল পড়ে আছে। আমরা ওদের থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

সুধাংশু হালদার জেলেদের দলপতি। তার বুড়ীবৌকে ঘিরে আর সকলের বৌ-রা দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে কাঁদছে।

সুধাংশু হালদারের বুড়ীবৌ শ্রীমন্ত আইচ, গৌরীশংকরের কাছে এগিয়ে এল। মিনতি করতে আরম্ভ করল, তোমরা একটু দেখ বাপু।

—থানা কাছারিতে গেলে যে মরে যাব আমরা।

সে ফিস্‌ফিসানি কথা সুধাংশু হালদারের কানে যেতেই সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বুড়োমানুষ। পোড় খাওয়া জীবন। পূর্ববাংলার নদীতে দু'কূল ভাসান জলে জলে নৌকা বেয়ে জীবন কেটেছে। ঝড় ঝঞ্ঝা প্লাবনে—সংকটের মধ্যে পড়েছে বার বার। দুর্যোগের মধ্যে তবু কখন হাল ছাড়েনি। সেই দুরন্ত প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করা শক্ত মানুষ আরও যেন শক্ত হয়ে উঠল। বৌকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, কাঁদিস কেনে খ্যান্তর মা? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে না? দুঃখকে ভয় পাস নাকি? কি হয়েছে? পেটে ভাত নেই, ঘরে অন্ন নেই, কাম-কারবার কিছু নেই। সরকারী লোন আসার কথা দিয়ে বাবুরা চুপ। এখন আমরা কি করবো? আমরা এখুনি খুন খারাপী করলেইত বিচার হবে, ফাঁসি হবে। কিন্তু আমরা যদি আজ শুকিয়ে মরি ত সরকারী বাবুরা কেউ ফাঁসিতে উঠবে? তাহলে আইনটা কুথায়। আমরা মরব নাকি না খেয়ে? প্রাণের জ্বালায় চুরি করেছি। হয়েছে কি? থানায় নেবে আমাদের? নিক্‌না। তোরাও চলে আয় সব তাঁবু থেকে। সবাই মিলে গিয়ে থানায় উঠি। খাওয়াত পাব। পেটের জ্বালাত ঘুচবে।

চৌকিদার ইজারাদার অবাক। এমন দুঃসাহসের কথা কেউ বলতে পারে? ঘাবড়ে গেল একটু। একজন ইজারাদার অবস্থা বুঝে চেঁচিয়ে উঠল, শুনলেনত আপনারা? সরকার কি করেছে না করেছে জানিনে। আমরা সাধারণ লোক। আমাদের ক্ষতি করা কি অন্যায় নয়? অপরাধ নয়? আপনারাই বলুন?

কে বলবে? অনেকেই উভয় সংকটে পড়েছে। জেলেরা চুরি করে মাছ ধরেছে। বেচে পয়সাও করেছে। কিন্তু সে পয়সা একা ঘরে তোলেনি। ভাগ দিয়েছে কলোনীর অনেক পরিবারকেই। সে পয়সায় অনেকেই খেয়ে বেঁচে আছে।

শুধু শ্রীমন্ত আইচ পয়সা দিয়ে মাছ কিনেছে। সে চোর নয়। সুস্থ সমাজের মানুষ। সেই প্রথম কথা বলল, সত্যিই এটা অন্যায়।

চুরি করা মানেই অন্যের ক্ষতি করা। তাইত কাছে পয়সা কম থাকলেও নগদ পয়সায় মাছ কিনলাম ওদের কাছে। ওরা অত মাছ বেচল। কাজেই বিলের ন্যায্য খাজনাটা দেওয়াই উচিত ছিল।

বলুন। আপনারাই বলুন। ইজারাদার গলায় জোর দিল। সুধাংশু হালদার নিস্তেজ হয়ে গেল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকেই একজন বিপক্ষে গেল।

একজন চৌকিদার বললে, বাপু ঝামেলায় কাজ কি? ধরা যখন পড়েছ মিটিয়ে নাও সব। সেই ভাল, শ্রীমন্ত আইচ মত প্রকাশ করল।

ইজারাদার রাজী। বেশ। খেসারত দিক। জরিমানা।

জরিমানা? জেলেরা বললে, পেটের দায়ে ওকাজে নেমেছিলাম। দিতে থুতে পারবনা কিছু।

তাহলে?

চৌকিদাররা বললে, রামবাবুকে ডাক তাহলে।

নবীনের ভাই জীবন ছুটল। গৌরীশংকর বললে, তাহলে সুকুমার বাবুকেও ডাকি। আমাদের অফিসার বাবুকে।

না, না। চৌকিদাররা বাধা দিল অমনি। ওসব বাড়াবাড়ি যদি করতে চাও তাহলে কিন্তু মীমাংসা আর হবে না। থানায় যেতে হবে। রামবাবু বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বলে ডেকেচি।

গৌরীশংকর থেমে গেল মীমাংসার কথায়। জীবন ফিরে এল। একা। রামবাবু আসবেন না। চোরকে থানায় পাঠাতে বলেছেন।

সুধাংশু হালদার আবার রুখে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা থানাতেই নিয়ে চল আমাদের। যা হয় হবে।

তুমি থামত। তোমার বক্‌বকানি রাখ। গৌরীশংকর ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশু হালদারের বৌ বলে উঠল, সত্যি, তুমি বুড়োমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। খামকা বক কেন গো?

চৌকিদার একজন হাসতে হাসতে বললে, ভীমরতি গো, বুড়োর ভীমরতি।

পরিবেশ সহজ হয়ে উঠছে। গৌরীশংকর বললে, তাহলে যখন

করেই ফেলেছ অন্যায়, কি আর হবে, মীমাংসা করাই ভাল।

বেশ। ইজারাদার বললে, আমরাত রাজী। খেসারত দিক।

গৌরীশংকর বললে, সেত মুস্কিল। খেতে পাচ্ছে না। লোন আসেনি। দেবে কোত্থেকে?

একজন চৌকিদার বললে, ওদের মেয়েদের গায়ে গহনাগাঁটিও নেই? সে আবার কেমন হিঁদু। ছোটলোকেরও ত থাকে। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ বাপু লুকিয়ে ভোগান্তি বাড়িও না।

না, না। নেই। হাত তুলে, ঘোমটা খুলে, অনাবৃত নিরাভরণ গ্রীবা দেখিয়ে দিল মেয়েরা। শুধু শাঁখা আর নোয়া ছাড়া কিছু নেই, তাদের হাতে।

তবু বিনা খেসারতে ছাড়া যায় না কিছুতে। তাহলে আরও আস্কারা পেয়ে যাবে চোরের দল। খানিকটা শাস্তি দেওয়া দরকার।

শ্রীমন্ত আইচ শেষ পর্যন্ত যুক্তি পেশ করল, আপাততঃ ওদের জাল-গুলো বাজেয়াপ্ত করে নিতে। পারলে টাকা দিয়ে খালাস করে আনবে।

না। কখ্খন না। তা হতে দেব না। আমাদের থানায় নিয়ে চল তার চেয়ে। সুধাংশু হালদার দুহাতে জাল জড়িয়ে ধরল। কিন্তু নিরাপদ হালদার আর অন্যান্যরা ওকে বাধা দিল। হাত ছাড়িয়ে দিল জাল থেকে। যাক্, জাল নিয়ে যাক্।

নিয়ে যাবে? সুধাংশু হালদার আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল, তোরা বেইমান, শয়তান—শালারা—তোরা জালজেতের কলংক। প্রাণের ভয়ে হাতের অস্তর—জাল ছেড়ে দিস্ শালারা—

নিস্ফল আক্রোশ সুধাংশু হালদারের। সবাই মিলে ওকে ধরে টানতে টানতে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুরে দিল।

সকাল বেলা সুকুমার সংবাদটা শুনল। শুনে আর কলোনীতেই গেল না। ভূপালবাবুর বৈঠকখানায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে হা-হুতাশ করতে লাগল।

সংবাদটা শুধু সুকুমারের কাছেই আসেনি। গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর তার ফল স্বরূপ

দুপুর বেলা কলোনীতে ঝাণ্ডাওয়ালার দল এসে হাজির হল। তারা সার বেঁধে এসে কলোনীর সামনে দাঁড়াল। গোবিন্দলাল বক্তৃতা দিল। আমরা এ অঞ্চলের লোকেরা আগেই বলেছিলাম, এখানে কলোনী করা ঠিক হবে না। উদ্বাস্তু এনে লাভ নেই। এখানকার লোকই মরছে তিল তিল করে। এর মধ্যে আবার নতূন মানুষ আনা। কিন্তু রামবাবু জেদ করে আনলেন সব।

কথাগুলো উদ্বাস্তুদের মনে ধরল। তারাও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে গিয়ে অনেকেই শুনেছে এমন কথা। দেশের লোক স্বার্থের কথা তুলেছে। বলেছে, আপনাবাত আমাদের ভাগ নেবেন, আবার সরকারী লোন নেবেন। কিন্তু আমবা? আমরা কি বাড়ি কামড়ে পড়ে থাকব? কি করব? নাম ভাঁড়িয়ে কোন ক্যাম্পে গিয়ে ঘুরে রিফুজী নাম নিয়ে এলেও হ'ত। কোথাও আবার ছড়া বানিয়েছে ঃ—

(ও ভাই) বাঙাল এল দ্যাশে
কাঙাল হয়ে ছেলাম বসে
অবশ্যাবে
চলে যেতে হবে এবাব
যমের দ্বাব-দ্যাশে,
ভাগবসাতে এল বাঙাল
নিত্য ভোগের গ্রাসে।

গোবিন্দলাল বললে, রামবাবু যাই বলুন, এসে যখন গেছেন আপনারা, তখন আপনাদের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আমাদের ওপবেও এসে পড়েছে বৈকী। আপনাবা সেদিন আমাদের দলে যোগ দিলে আর এসব দুর্গতি, হোত না।

একটু থেমে গোবিন্দলাল আরও জোরের সঙ্গে বললে, এখনও সময় আছে। আমাদের দলে যোগ দিন। এখানে শাখা খুলুন। আমাদের ধ্বনি হচ্ছে, জাল যার জল তার। গভর্ণমেণ্ট খাজনা নেবে জেলের কাছে। টাকা থাকলেই মধ্যবর্তী মালিক হয়ে মুনাফা লুটে কেউ শোষণ করতে পারবে না জেলেদের। এই যে রহিম শেখ—সে আবার চড়া দামে

এ বছরের জন্যে বিলটা ইজারা দিয়েছে এক ভুয়ো মৎস্যজীবী দলকে। তাদের মধ্যে জেলে আছে দু-একজন। বাইরের লোকই বেশি। আপনাদের রামবাবুইত তাদের মধ্যে প্রধান।

মজার মজার সংবাদ শুনে উদ্বাস্তুরা আরও ঘিরে ধরল গোবিন্দলালদের। গোবিন্দলাল বললে, আপনাদের জাল উদ্ধারের ব্যবস্থা আমরা করছি। আর একটা ফাণ্ডের কিছু টাকা এনেছি। গাঁয়ের সাধারণ মানুষের দেওয়া সাহায্য। এই নিন। পরিবার পিছু ভাগ করে নিন।

সাহায্য। তার ভাগ নিতে জেলে ছাড়া অন্যান্যরাও ছুটে এল। হাত পেতে দাঁড়াল। শ্রীমন্ত আইচ সাধুচরণও সরে থাকল না। শুধু গৌরীশংকর এল না। সাহায্য নিল না।

গোবিন্দলাল বললে, এইবার আপনারা একটা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলুন।

অমনি সবাই দূরে সরে গেল। শ্রীমন্ত আইচ, সাধুচরণও পিছিয়ে গেল। এগিয়ে এল সুধাংশু হালদার। বললে, হ্যাঁ, আমরা দল খুলব। বলুন কি করতে হবে। জেলেদের উদ্দেশ্যে বললে, যদি বাঁচতে চাওত ইনাদের কথা শোন। নইলে জাল আর ফেরৎ পেতে হচ্ছে না। এইত কাল রাতে অমন অপমানটা হলে সব। কে এল তোমাদের সাহায্য করতে? বিপদ-আপদে বন্ধু চেনা যায় বুঝলে? শুনলেতো সব রামবাবুর গুণের কথা; আর আমাদের অফিসার বলতেত মুখ দিয়ে ঝোল পড়ে—মরলে কি বাঁচলে দেখতেও এলনা একবার। শুধু মাইনে নিচ্ছে মাস মাস ধরে আর আমাদের কলা দেখাচ্ছে।

জেলেদের দল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। গোবিন্দলালের দল হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করল সুধাংশু হালদারের বক্তৃতাকে। সঙ্গে সঙ্গে জেলেদের সংগঠন গড়ে উঠল লালঝাণ্ডা সামনে রেখে ঘোষণা করল সংঘবদ্ধতার কথা। গোবিন্দলালের-দল উল্লাসে ধ্বনি দিয়ে উঠল—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

এখানেই শেষ নয়। সংগঠন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশু হালদার দাবী জানাল, আমাদের এ-দলের কাজ এখনই আরম্ভ করতে হবে।.. চল

সব। অফিসারের ঘরের সামনে যাই। দাবী জানাতে হবে।

ঠিক কারো আপত্তি করার মুহূর্ত নয় সেটা। অত ভাববার অবকাশ নেই। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, চল চল। সুধাংশু হালদারের পিছন নিল। সদ্য নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত জেলে সমিতি। নবজীবনের দামালপনায় অস্থির।

সুকুমারের আস্তানার সামনে মোড়ের মাথায় গিয়ে ধ্বনি দিয়ে উঠল, ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ। আমাদের লোন এখনি এনে দিতে হবে। নইলে চাকরী ছাড়তে হবে।

রাস্তা থেকে সুকুমারের ঘরের দিকে এগিয়ে এল সুধাংশু হালদার, নিরাপদ আর গোবিন্দলাল।

সুকুমার ঘরেই ছিল। বেরিয়ে এল। গোবিন্দলাল সামনে এসে বললে, বলেছিলাম আসব। এই এলাম। সুকুমার ম্লান হাসল। বসতে বলল। বসে গোবিন্দলাল বললে, কি করছেন এসব? লোন আসবে না এরা মরবে?

সুকুমার বললে, অভিযোগ সত্যি। আমিও বিব্রত এজন্যে। কিন্তু আমার ক্ষমতা কতটুকু?

গোবিন্দলাল বললে, তা বললেত হবে না। দায়িত্ব যখন নিয়েছেন, তখন ত্রুটি ঘটলে প্রতিবাদ আর অপবাদ সইতে হবে। এমন কি নিন্দাবাদেরও চূড়ান্ত হবে। কিন্তু সেকথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা এদের কি হবে? মরবে নাকি মানুষগুলো?

সুকুমারের পক্ষে জবাব দেওয়া মুস্কিল। এর জবাব দিতে যদি পারত তাহলে তার আগেই জবাবদিহি করবার অবস্থা সৃষ্টি হতে দিত না। সুকুমার বললে, আমি চেষ্টা করছি। দেখি দু-একদিন পর যদি না হয়, চলে যাব। এ দায়িত্ব ছেড়ে দেব।

হ্যাঁ। সেই ভাল। অক্ষম হলে সরে পড়াই ভাল। বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যজন ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়। বলেই গোবিন্দলাল উঠে গেল দলবল নিয়ে।

গোবিন্দলালের এমন কঠোরতম উক্তি সহ্য করা যেকোন সচেতন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেন বুকের ওপর হাতুড়ি মেরে গেল। সুকুমার

ঘরে গিয়ে ঢুকল। কান্না পাওয়ার দশা। কেন এমন করে পড়ে পড়ে মার খাবে সে? সম্মিলিত ত্রুটির বোঝা কেন সে একা মাথায় নিয়ে বইবে? জীবিকার বিনিময়ে? তাহলে কেন সে আত্মত্রাণের চেষ্টা করবে না? এতদিন তার মনে হয়েছে বটে, যে বর্তমানকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না,সে বৃহত্তর ভবিষ্যতেই বা দাঁড়াবে কি করে? যে সামনের দুর্যোগকে ভয় পায় সে কেমন করে এগিয়ে যাবে? কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আকাশে বাতাস যেখানে হাল্‌কা হয়ে ঝড় তোলে, আকাশতরীর কাজ হচ্ছে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার। সুকুমার ভাবল, সে তাই করবে। এ চাকরী ছেড়ে চলে যাবে কলকাতায়। শুভ্রার গার্জেন টিউটর হয়ে। হ্যাঁ তাই যাবে। না বলে চলে এসে শুভ্রাকেত চিঠি দিয়েছে। এবার গিয়ে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলবে। সুকুমার সিদ্ধান্ত করে ফেলল। সেইমত বিকেলবেলা কৃষ্ণনগর রওনা হয়ে গেল।

আষাঢ়ের বর্ষা নেমেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। এর খ্যাতি যুগে যুগে বহু কাব্যের সাহিত্যের পাতায় পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে।

সেই বর্ষার মধ্যে এখানে জরাজীর্ণ তাঁবু, কলোনীর। তার মধ্যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কপর্দকহীন আশাহত মানুষ বসে বসে ভিজছে। ঠকঠক করে কাঁপছে। শিশুরা কাতরাচ্ছে। অঝোর ঝরণ বর্ষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের দুর্গতিও ঝরছে। হতাশা আর অসহায়তা মৃত্যুদূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রামবাবু দেখলেন, জেলেদের তাঁবুর সামনে লালঝাণ্ডা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। রামবাবুর চোখে জল নামার পরিবর্তে আগুন জ্বলে উঠল। নবীন জীবনদের তাঁবুর সামনে ছুটে গেলেন। সেখান থেকে শ্রীমন্ত আইচ অবধি সকলের দরজায় দরজায়। সকলকে ডেকে তিনিও খুলে ফেললেন একটা প্রতিপক্ষ দল। একটা পাল্টা সংগঠন। নাম দিলেন, বন্দীপুর বাস্তুহারা সংঘ। সভাপতি রামবাবু। যুগ্মসহ-সভাপতি হরিমোহন দাঁ আর হাবুল কর্মকার। সম্পাদক শ্রীমন্ত আইচ।

গৌরীশংকর, আরও কয়েকজন নিরপেক্ষ থেকে গেল। সাধুচরণও

চোরদায়ে ধরা পড়ার পর থেকেই উদাসীন হয়ে গেছে। সাতে পাঁচে নেই আর। আপন মনে থাকে। সেও নিরপেক্ষ।

সুকুমার কৃষ্ণনগর গিয়ে শুনল, শুভ্রা কলকাতায় চলে গেছে। তারই জন্যে। তার চিঠির কারণে।

চিঠির কারণ!

কলোনী অফিসার বললেন, হ্যাঁ। আপনি অমন করে চলে যাওয়ার পরই ক্ষেপে গেল। জলসা আর হলনা। ও আর থাকতে চাইল না। অথচ চেঞ্জে এসেছিল। তাড়াতাড়ি চলে গেলে ওর বাবা কি বলবেন? আমাদেরই দুর্নাম রটবে। তাই আটকাতে চেষ্টা করলাম অনেক করে। কিন্তু আপনি কি সব হেঁয়ালি চিঠি দিয়েছেন।

হেঁয়ালি চিঠি! সুকুমার ভাবল। সেত লিখেছিল, সংকটাবর্তের মধ্যে পড়ে এখানে চলে এসেছি। এখনও সেই আবর্তের মধ্যে পড়ে আবর্তন করতে হচ্ছে। বাস্তব অতি কঠোর। নিষ্ঠুর। একে এড়ানোর পথ পাওয়া দুষ্কর। নিরুপায়তাই সম্বল। ভবিষ্যৎ তো চিরদিনই অন্ধকারে লীন। কাজেই পরিণতি জানিনা। এ হেঁয়ালি? এতো সত্যি।

কলোনী অফিসার বললেন, কি যে কাণ্ড করেন। কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না শুভ্রাকে। কোন ব্যাখ্যাই তার মনে ধরল না। বাংলায় অনার্স পড়ে। কাজেই তার মতে তার ব্যাখ্যাই ঠিক। রেগেমেগে কলকাতায় চলে গেছে পরদিনই। কলোনী অফিসারের মনে পড়ল খুকুর আরও অনেক কথা। ওর দিদিকে বলে গেছে, অমন ছেলের জন্যে অত করবার দরকার ছিলনা। অমন ছেলে কলকাতায় পথে পথে ঘোরে। কতজন বেকার।

সেকথা প্রকাশ করা যায়না। তবে তারই সুর রেখে কলোনী অফিসার সুকুমারকে বললেন, আপনার চিঠির দোষেইতো গেল।

সুকুমার কথা বলতে পারলনা। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সে ছুটে এসেছে। শুভ্রার যুক্তিমত সব ব্যবস্থা করবে। তারপর কলকাতায় চলে যাবে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়বে আরও অনেক—অনেক দূরে। কিন্তু

শুভ্রা চলে গেল ? তার চিঠি পড়ে ? শুভ্রা তবে এত অগভীর ? অসহিষ্ণু, চঞ্চলা ! মুহূর্তে সুকুমারের পরিকল্পনার পুষ্পক রথ মাটিতে ভেঙে পড়ল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল যেন। পায়ের তলায় কঠোর বাস্তব ছাড়া আর কিছু নেই। বাস্তব—বন্দীপুর কলোনী—তার চাকরী, লোনের ব্যবস্থা করা। সেই আবর্তের মধ্যেই জীবনকে ছড়িয়ে দেওয়া, জড়িয়ে ফেলা।

লোন চাই। লোন। শুভ্রার কথা পড়ে থাক তাহলে। সুকুমাব লোনের কথা উত্থাপন করল। লোন না হলে কলোনী হবে মানুষের গোরস্থান।

কলোনী অফিসার ম্লান হাসলেন। যেন অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছেন। টেনে টেনে বললেন, ওতে ভয় পান কেন ? বিপদ মানুষ মাত্রেরই আসে। তাকে সহিষ্ণুতা নিয়ে অতিক্রম করাই মানুষের কাজ।

ছেঁদো বুলি। সুকুমার অসহিষ্ণু ভঙ্গী প্রকাশ করল।

কলোনী অফিসার বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, আপনার এতো কি মশাই ? আপনার মত চাকরী আমরাও করছি। ববং কলোনী বসাচ্ছেন ওখানে রামবাবু। তাঁর দায়িত্ব আছে। নেতৃত্বের মোহ আছে।

সুকুমার বললে, তাহলে রামবাবু থাকলেইত হত। আমাকে আপনাকে এতো মাইনে দিয়ে রাখবার কি দরকার হয়েছিল স্যার ?

কথাটা বলেই কিন্তু সুকুমার অপ্রতিভ হল। অন্যায় করে ফেলেছে। ওপরওয়ালার প্রতি কটাক্ষ হেনেছে। ইন্‌সাবর্ডিনেশন্।

কলোনী অফিসার প্রথমে কিছু বললেন না। একটু পরে শান্তভাবে বললেন, বিকেলের দিকে আসবেন।

সুকুমার অপরাধীর মত চুপ করে বেরিয়ে এল। দুপুরে ভাবল, বিকেলে আর যাবে না। আর যাবেই না। কোথাও না। কলোনী আফসারের বাসাতেও না। বন্দীপুরেও না। এ চাকরীই ছেড়ে দেবে। অন্য একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

বিকেলবেলা কিন্তু সুকুমার অফিসারের বাসায় গেল। কলোনী অফিসার বসালেন সুকুমারকে। চা খাওয়ালেন। তারপর তুললেন

লোনের কথা। না। লোন এখনও অনিশ্চিত।

সুকুমার বললে, তাহলে ?

আপাততঃ একটা মতলব বার করেছি। ওদের কিছু টাকা অগ্রিম দেওয়া যেতে পারে। লোন পেলে কেটে নেওয়া হবে।

সেও ভাল।

বাড়ির ঋণ থেকে বাদ যাবে কিন্তু এ টাকা।

সুকুমারের মনে কলোনীটা ভেসে উঠল। তারা বাঁচলে তবে ত বাড়ি। বললে, তা হোক। এখনত বাঁচুক। বাড়ি হবে'খন। ধারই দিন এখন।

বেশ লিখে দিচ্ছি।

লিখে ?

হ্যাঁ। রামবাবুর কাছে টাকা আছে। বন্দীপুরে থানার বে-সরকারী রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী তিনি। বর্ডার পার হয়ে যেসব উদ্বাস্তু হাঁটা পথে পালিয়ে এসেছে তাদের প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে চিঁড়ে-গুড় আর নগদ কিছু পথ খরচা দেবার খাতের টাকা। তার থেকে পরিবার পিছু পঞ্চাশ টাকা মত ধার দেওয়া যেতে পারে এখন।

চিঠি লিখে দিয়ে কলোনী অফিসার বললেন, যান্। আর উত্যক্ত করবেন না দয়া করে।

শুভ্রার গার্জেন টিউটার হওয়া গেল না। বিশ্ব-পরিক্রমার আশা হারিয়ে গেল। লোনও মিলল না। তবু পঞ্চাশ টাকা করে পরিবার পিছু দেওয়া যাবে এখন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ওদের রক্ষা করা যাবে। সেই আনন্দেই খুশী হয়ে উঠল। বিদায় দেবার সময় কলোনী অফিসার কটু মন্তব্য করলেন। সুকুমার তবু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এল।

পরদিন সকালে উঠেই বন্দীপুর ছুটে গেল সে। কলোনীতে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। হয়েছে গো। একটুখানি ব্যবস্থা হয়েছে এবার তোমাদের

হয়েছে? বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মত সবাই ছুটে এল। হয়েছে? লোন এসেছে আমাদের?

না। লোন ঠিক নয়।

তবে?

আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। তারপর লোন এলে তার থেকে কেটে নেওয়া হবে।

তাই হোক। তাই ভাল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল। দিন, টাকা দিন আমাদের।

টাকা রামবাবুর কাছে আছে। এই চিঠি দিয়েছেন কলোনী অফিসার। দেখিয়ে টাকা নিতে হবে।

চলুন। এক্ষুণি চলুন স্যার। হুজুর, সব মরে গেলাম খিদের ভোঁচকানি লেগে।

রামবাবুর সঙ্গে সুকুমারের বিরোধ। অপমানিত হয়ে ঠাকুরবাড়ি ত্যাগ করেছিল সে। আজ কর্তব্যের দায়ে উদ্বাস্তুদের আগে আগে সেই ঠাকুরবাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল।

টাকা? কলোনী অফিসারের চিঠি পড়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন রামবাবু। টাকা ধার নেবে তোমরা? বাড়ি তৈরীর টাকায় চাল কিনে খাবে?

গৌরীশংকর বললে, বাঁচলেত বাড়ি ঘর। মরে গেলাম যে।

নমঃ গোষ্ঠির জগন্নাথ মণ্ডল বললে, হ্যাঁ কর্জটা দিয়ে দিন তাড়াতাড়ি। এখনও প্রাণটা ধুক ধুক করছে।

রামবাবু হাসলেন। টেনে টেনে বললেন, টাকা চাইলেই কি মেলে? দিতে বললেই দেওয়া যায়?

জগন্নাথ মণ্ডল আঁৎকে উঠল, পাব না এখন?

হেঁ-হেঁ-হেঁ। রামবাবু হাসলেন।

সুকুমারের বিশ্রী লাগল। বিরক্তিকর ব্যবহার রামবাবুর। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, টাকা পাওয়া যাবে না?

রামবাবু গম্ভীর হলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বললেন, না।

পাওয়া যাবে না? কেন? সুকুমার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

রামবাবু গম্ভীর হলেন, সরকারী টাকা নিয়ে কি রসিকতা করতে বসে আছি? তার হিসাব নিকাশ করতে হবে। তারপর।

তারপর? তাহলে কি মরে যাবে এরা?

আমি তার কি জানি?

কে জানবে? অফিসার চিঠি দিলেন। এতগুলো লোক অনাহারে, আর হিসেব আগে হোল? হিসেবটা পরে হোত না? সরকারী টাকার আপটুডেট হিসেব নেই? কবে হবে এ হিসেব?

গৌরীশংকর বললে, সাফ জবাব বলে দিন। পাব কি পাব না। আপনার হিসেবের হিসেব রাখতে চাইনে আমরা।

গম গম করে উঠল পরিবেশটা। চারদিকে ক্ষুধিত জনতা। রামবাবু সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে স্থকুমারকে বললেন, আপনি কি চান্? লুট করবেন নাকি আমার গুদাম?

স্থকুমার সংযত হয়ে বললে, টাকা চাই।

চাইলেই পাওয়া যায়? তার আইন নেই? সরকারী টাকার হিসেব দেখবো না?

হিসেব কবে হবে?

কাল। কাল সকালের আগে হবে না।

বেশ।

পেটে দারুণ খিদের জ্বালা। দুঃসহ। তবু শান্তি-শৃংখলার মর্যাদা রক্ষায় রামবাবুর ঠাকুরবাড়ি থেকে সব ফিরে গেল। কাল। কাল সকালেই সব আসা যাবে আবার।

ঠাকুরবাড়ি থেকে উদ্বাস্তুরা নেমে যেতেই রামবাবু হাবুল কর্মকারকে ডেকে পাঠালেন।

টাকা? টাকা চাইলেই কি মেলে? সরকারী টাকা গচ্ছিত আছে মানে কি ঘরে সিন্দুকে আছে? তিনি ব্যবসায়ী। ব্যবসাদারের ঘরে টাকা মজুত থাকে? যে রাখে সে বেকুব। চাঁদি মানেই তাকে জুতিয়ে নাও। সরকারী গচ্ছিত টাকায়ত চাল কিনেছেন তিনি।

হাবুল কর্মকার বিকেলে এল। রামবাবু বললেন সব কথা। ভর্ৎসনা করলেন একচোট—তখুনি বললাম সব টাকার খরচা দেখিয়ে দিতে। ঝামেলা চুকে যেত। তা না করে এই ফ্যাসাদ।

ফ্যাসাদ কিসের?

এখন অত টাকা কোথায় পাই? তাছাঁড়া সরকাবী টাকা হাতের মধ্যে এসে ফিরে যাবে?

দেখতে হয়। হাবুল কর্মকার বললে।

দেখতে হয় মানে? আজ রাতেই যাহয় করে ফেলতে হবে। রাতে কাজ করতে হবে। হিসেব নিকেশ সব।

ঠিক আছে। হবে।

হবে নয়। তোমারই দোষে আমার আজ এ দুর্গতি। কাজেই যাকরে হোক একটা হিল্লে করে দিলে তবে তোমার রেহাই।

আচ্ছা, আচ্ছা। হেসে হাবুল কর্মকার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এখন বাড়ি চললাম। রাতে খেয়ে দেয়ে আসব।

রাতে এসে হাবুল কর্মকাব সেই হিসেবে বসল। হিসেবের অর্থ হচ্ছে, সরকারী যে টাকা জমা আছে, সে টাকা কি করে খরচ দেখিয়ে দেওয়া যায় তারই আয়োজন করা।

বর্ডার পেরিয়ে যেসব পরিবার চলে আসছে—তাদের পথ চলতে এবং নিরাপদে চলতে সাহায্য হিসেবে পশ্চিম বাংলা সরকার টাকা আর চিঁড়ে-গুড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলের থানায় থানায় বে-সরকারী রিলিফ-কমিটির মাধ্যমে। উদ্বাস্তুরা আসবে। বিশ্রাম করবে। সাহায্য নিয়ে আবার যেখানে খুশী চলে যাবে। তাদের খোঁজ রাখার আর দায় থাকবে না এ কমিটির।

তারই ফলে কমিটির হাতে এসেছে অপূর্ব সুযোগ। সে সুযোগ নিতে রামবাবু সমেত তাঁর দলবল কেউ কোন ত্রুটি করেন নি। অনেক নিয়েছেন। আজ সে টাকা সুকুমার ধার চাওয়ায় রামবাবুর মাথায় খুন চেপে গেছে। সম্মানে লেগেছে। তাই হাবুল কর্মকার হিসেবে বসেছে। কাজেই রামবাবু প্রথমেই ফুলস্কেপ কাগজে দাগ টেনে মাষ্টাররোল

তৈরীতে লেগে গেলেন। ছক কাটা হল। তারপর হাবুল কর্মকার হিসেব করে দেখল। এখনও যে টাকা আছে ওখাতের দরুণ তাতে পঞ্চাশটি পরিবারকে পরিবার পিছু একশো টাকা করে দেওয়া যায়।

ঠিক আছে। —মাষ্টাররোলের ছকে ভূয়ো সাহায্যপ্রার্থীর নাম বসাতে আরম্ভ করল হাবুল কর্মকার আর রামবাবু। যা খুশী, যে নাম মনে আসে। রামবাবু অক্লান্তভাবে নাম বসিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ টাকাগুলো ব্যবসায় খাটছে। বার করা যায়না। তার ওপর সুকুমার জিতে যাবে, এটা অসহ্য। কাজেই খরচা দেখাতেই হবে।

হাবুল কর্মকার এক সময় বাধা দিল। থাক, আর নয়।

রামবাবু তাকালেন মুখ তুলে। হাবুল কর্মকার বললে, দেখি কত হোল। দেখে শুনে সে বললে, ঠিক আছে। আর ছ'জনের একটা পরিবার দেখালেই হবে।

হবে? সবকটা পূর্ণ হয়ে যাবে?

না। সব টাকা পূর্ণ হওয়া কি ভাল? এ্যাদ্দিন খরচা দেখান হোল না। এখন দেখাতে গেলেইত সন্দেহ করবে। হয়ত চেক করতে আসবে। সে এক হাঙ্গামা। তার চেয়ে একশ টাকার মধ্যে সত্তর টাকার খরচা দেখান হয়ে গেল। তিরিশ টাকা করে থাকল। এই তিরিশ টাকা করে নেবে কলোনীতে।

তিরিশ টাকা করে দিতে হবে?

হ্যাঁ। একদম না দিলেই সন্দেহ করবে। তুমি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, আমি মেম্বার। আর কিছুনা হোক, এই নিয়ে আমাদের অন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। তার চেয়ে ও তিরিশ টাকা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

রামবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, কিন্তু হাবুল, তুমি আরেকটা দিক দেখছ না। ব্যবসা থেকে এই টাকাগুলো বার করে দিতে হবে। এই টাকা হাতে পেলে ওরা হয়ত কেষ্টনগর কি অন্য কোথাও গিয়ে নগদ টাকার সওদা করবে। আমার দোকানে কিনবে না। ওরা ধারে খেলে আমার লাভ হত।

হাবুল কর্মকার হাসল। ওই তিরিশ টাকা কদ্দিন বাজাল বাউণ্ডুলেদের

কাছে? সব রাক্ষুসে পেট। সব এখানে এসে হামলে পড়বে। দুদিন চরে আসুক যেখানে খুশী।

রামবাবু তুষ্ট হলেন না। কথাও বললেন না। হাবুল কর্মকার বললে, এবার এল. টি. আইগুলো ঠিক করে ফেলা যাক।

হ্যাঁ।

এল. টি. আই। অর্থাৎ সাহায্য গ্রহণকারীদের সকলেই নিরক্ষর ছিল বলে বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের টিপসহি লাগাতে হবে মাষ্টার রোলে।

মাষ্টার রোলে সাহায্যপ্রার্থীদের নাম তোলার মতই ব্যবস্থা। রামবাবু আর হাবুল কর্মকার দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতের পায়ের কুড়িটা আঙুলের ছাপ নানাভাবে বসাতে লেগে গেলেন।

আর কেউ নেই আশেপাশে। কাউকে প্রকাশ করাও যায়না। কিন্তু শুধু দুজনেরই হাতের পায়ের ছাপ থাকবে? রামবাবুর মগজে বুদ্ধি খেলে গেল। উঠোনে কেলো কুকুরটা শুয়েছিল। তাকে টেনে তুললেন।

ও কি হবে? হাবুল কর্মকার বললে।

খুব ভাল হবে। রামবাবু বললেন।

হাবুল কর্মকার বললে, দূর।

রামবাবু বললেন, দেখইনা কি করি।

কুকুরের থাবার ওপর কালি মাখিয়ে মাষ্টাররোলের ওপর চাপ দিয়ে ছাপ লাগিয়ে রামবাবু হেসে উঠলেন, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হাবুলচন্দর—মেনো মেনো একটু—এখনো মরা হাতী সওয়া লাখ। বুঝলে হেঁ হেঁ হেঁ—।

তিরিশ টাকা করে দিতে হবে উদ্বাস্তুদের। টাকাটা যাতে হাতে হাতে দিতে না হয় তার চেষ্টা করতে রামবাবু সকালবেলা উঠেই কলোনীতে ছুটলেন।

রামবাবু? গতদিনের কথা ভেবে উদ্বাস্তুরা একটু আক্রোশ নিয়েই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। হিসেব হয়েছে আপনার?

হেসে রামবাবু বললেন, প্রায়। আজ দুপুরেই যা হয় হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলতে এলাম।

কি?

টাকা নিয়ে তোমাদের কি লাভ ?

লাভ ? মানে ?

হ্যাঁ। টাকাত চাল ডাল জিনিস পত্তর কেনা কাটার জন্য। সে সব আমি দেব। আমার দোকান থেকে ধার নাও সব। লোন এলে দিও। তোমাদের ভালর জন্যই বলছি। কাবণ কাঁচা টাকার দোষ খুব। হাতে পড়লেই হাত সুর সুর করায়। শেষে পস্তানিব একশেষ। ঠিক দিল্লীকা লাড্ডু—বুঝলে ? এ্যা—হেঁ-হেঁ-হেঁ।

উদ্বাস্তুবা বুঝল না। গৌরীশংকর বললে, আমবা নগদ টাকাই চাই দেশছাড়া হয়ে এসে অবধি সবকারী ডোল খেয়ে খেয়ে বুঝছি নগদ টাকা হাতে নেওয়াই ভাল। বুদ্ধি খোলে। যা হয় একটা কিছু করবাব ইচ্ছা হয়।

সবাই বললে, হ্যাঁ। তাই। নগদ টাকাই ভাল।

রুদ্ধ আক্রোশ নিয়ে রামবাবু ফিরে গেলেন।

দুপুর বেলা সুকুমাব দলবল নিয়ে ঠাকুব বাড়ি গেল। টাকাটা দিন।

রামবাবু বললেন, পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে না। তিরিশ টাকা হতে পাবে।

পঞ্চাশ থেকে তিরিশ। সুকুমার ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু সে কিছু বলবাব আগেই উদ্বাস্তুরা বলে উঠল, তিরিশ টাকাই নেব। —দিন।

বুড়োরা বললে, ও আমাদের কপাল গো। ভাগ্য।

সুকুমার নীরব। উদ্বাস্তুরা বললে, দিন। তিরিশ টাকাই দিন।

রামবাবু বললেন, দিন বললেই কি হবে ? টিকিট এনেছ ?

টিকিট ? সবাই জিজ্ঞাসু হল।

রামবাবু বললেন, হ্যাঁ, রেভিনিউ টিকিট। কুড়িটাকার ওপর নিতে হলে লাগে জান না ?

সুকুমার এবার কথা বলল, টিকিটের কি দরকার ? অফিসারের চিঠি আছে। মাষ্টাররোল করে টাকা দিন। সব সই করে নিও। আমি তলায় সই দিচ্ছি।

না। তা দেব না আমি। আইনের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারব না সরকারী টাকা নিয়ে। রামবাবু অস্বীকার করলেন।

এখন উপায় হামলা করা। তা সম্ভব নয়। শোভনও নয়। গৌরীশংকর বললে, আচ্ছা আনছি রেভিনিউ টিকিট।

সুকুমার পয়সা দিল। পাঁচ মাইল দূরে ডাকঘর। বর্ষায় দুর্গম পথ। গৌরীশংকর বেরিয়ে পড়ল।

খানিক পরেই হাবুল কর্মকার ঠাকুরবাড়ির উঠোনে উঠে এল। বেলতলায় সাইকেল রেখে রামবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রামবাবু বললেন, এনেছ?

হ্যাঁ।

যাক। বাঁচালে।

হাবুল কর্মকার জামার তলার ফতুয়ার পকেট থেকে টাকার থলে বার করে দিল। রামবাবুর টাকাত ব্যবসায় খাটছে। তাই হাবুলকে পাঠিয়েছিলেন ঊষাগ্রামের রহিম সেখের কাছে টাকা ধার করতে।

টাকার থলি হাতে রামবাবু হাসলেন। আর ভয় নেই। ওরা এসে হামলা করছিল। ওদের রেভিনিউ টিকিট আনতে বলেছি। জানতাম—ওরা যাবে আসবে, তারমধ্যেই তুমি ঠিক এসে পড়বেই। হেঁ-হেঁ-হেঁ শালারা টাকা টাকা করে খেয়ে ফেলল। টাকা নিয়ে ত খোলামকুচি করে উড়োবে। ওই শালা—অফিসার। ওই মাথাটা খেল। সব্বনাশ করল সবগুলোর। শালা।

কম্পিত হাতে টাকাগুলো গুনতে আরম্ভ করলেন তিনি। ক্লান্ত হাবুল কর্মকার বিড়ি ধরাল।

গৌরীশংকর টিকিট নিয়ে ফিরে এসে বললে, ছুটে গিয়েছি আর এসেছি।

আর বাধা নেই কোন পক্ষেরই। রামবাবুর উঠোনে দাঁড়িয়ে টাকাগুলো হাতে নিয়ে উদ্বাস্তুরা চেঁচিয়ে উঠল, বাস্তুহারা—জিন্দাবাদ।

সুকুমারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, অফিসার বাবুকি—জয়।

আনন্দে যার শেষ, অন্নে তার সুরু।

এই শাস্ত্রবাক্য সত্যি হয়ে উঠল কলোনীর তাঁবুগুলোতে। তিরিশটা করে টাকা পেয়েই মানুষগুলোর ভোল যেন পাল্টে গেল। সেই বর্ষার জল পড়ছে। জীর্ণ তাঁবুও আছে। দুর্গতিও কম নয়। তবু জেলেরা কেমন শান্ত হয়ে সুতো কাটতে আরম্ভ করেছে। সাধুচরণ আবাব একতারা তুলে নিয়েছে। গৌরীশংকর একটা ভাঙা হারমনিয়ম সঙ্গে এনেছিল। সেটা নিয়ে একদল ছেলে বুড়োর সঙ্গে জমিয়ে তুলেছে। দেশে ওর একটা যাত্রার দল ছিল। ও গানের মাষ্টার। এখানেও কলোনী জমে উঠলেই একটা যাত্রার দল খুলে ফেলবে। গান বাজনায় ফুর্তি না হলে জীবন বাঁচে না। তাই গানের মাহাত্ম্য বোঝাতে গান ধরে দিয়েছে। কলোনীর আর সব মানুষরা ভাবছে। এইবার তাড়াতাড়ি লোনটা এলে হয়। মেয়েরা অনেকদিন পরে স্বাভাবিক ভাবে ঘর কন্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পডেছে।

সুকুমার এই কলোনীরই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। এসব দেখে শুনে তার খুশী হওয়াই স্বাভাবিক। কলোনীর নিরাপত্তাতেই তার নিরাপত্তা। কলোনী থেকে ফিরে সে নিশ্চিন্ত হয়েই বিছানায় শুয়ে দুপুরটা উপভোগ করছিল। সামনে বাঁশের ঝাড়ে পাতায় পাতায় টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বাঁশবনের আবছা অন্ধকারের মধ্যে শেয়ালগুলো ভিজছে আর ঘুরছে। সামনে উঠোনে ঘাসের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। আর ঘরের খড়ের চালের ওপর বৃষ্টিধারার সে এক অপূর্ব মিষ্টি শব্দ। সেই সঙ্গে ঝিঁঝির, ব্যাঙের ডাক মিলিয়ে এক সুন্দর ঐকতান—ছন্দ।

সুকুমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তমনে উপভোগ করছিল পরিবেশটাকে। গানও গাইতে আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ দুপদুপ করে যেন পায়ের শব্দ হল ঘরে। গান থামিয়ে উঠে বসল সুকুমার। দেখে নন্দ

এসে ঢুকছে। পাশের বাড়ির ছেলে। বছর বার বয়স। ভয়ার্ত, বিবর্ণ প্রায়, হাঁপাচ্ছে। সুকুমার কিছু বলবার আগেই নন্দ হাউমাউ করে উঠল।

শিগগির আসুন একবার। আপনার পায়ে পড়ি। মা কেমন করছে। আমার মা মরে যাচ্ছে। নন্দ কেঁদে ফেলল। আর কথা বলতে পারল না।

সুকুমার বিছানা থেকে উঠে পড়ল। কোন কিছু ভাববার অবকাশ নেই। নন্দর পিছন পিছন পথে নেমে এল। নন্দর আগে আগে ছুটতে আরম্ভ করল শেষে। নন্দর বাড়ীর সামনে গিয়ে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে তোমার মার?

জ্বর।

কদিন?

অনেক কদিন হল। আপনি ভেতরে আসুন। দেখবেন।

নন্দর পিছন পিছন সুকুমার চলল। এ বাড়িতে এই প্রথম পদার্পণ। নন্দর মাকে সে কোনদিন দেখেনি। তার সম্পর্কে শুনেছে অনেক কিছু। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়েছে অনেক সময়। বাইরের বড়ঘরটা পেরিয়ে পাশ দিয়ে ভিতরে ছোট্ট একটা চোরকুটুরিতে ওকে নিয়ে গেল নন্দ। মাকে দেখাল। সুকুমার চমকে উঠল।

বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়া. রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারার মহিলা। বয়স অনুমান করা দায়। ময়লা ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে হাত পা খিঁচছে। উঠে বসতে চেষ্টা করছে। গোঙাচ্ছে।

সুকুমার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, বেশ জ্বর আছে। ডিলিরিয়ম হয়েছে।

সুকুমার ইতি কর্ত্তব্য ভাবছিল। নন্দ বললে, বাঁচবেত? মাকে বাঁচিয়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি।

সুকুমার বললে, বালতি আছে ঘরে? জল আছে? কুয়ো?

হ্যাঁ।

নন্দ আর সুকুমার বালতি আর ঘটি ভর্তি করে জল আনল। নন্দকে তার মাথায় সে-জল ঢালতে বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সুকুমার। মাথায়

জল পড়ছে। নন্দর মা শান্ত হতে আরম্ভ করল। বেশ আরাম পাচ্ছে।

সুকুমার প্রশ্ন করল, রাধারমণবাবু নেই ?

না।

কোথায় গেলেন ?

বাড়ি।

কবে ?

অনেক দিন হল। মার জ্বর হবার দু'দিন পরেই।

সুকুমার একটু থেমে আবার বললে, ডাক্তার দেখান হয়েছে ?

নন্দ বললে, হ্যাঁ। কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডাকতে বলেছিলেন ঘোষ সায়েব। ডেকেছিলাম। একদিন এসেছিলেন। তারপর থেকে ওষুধ দেন। আসেন না। বলেন, ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু সারচে কই ? আগে মা কথা বলত। এখন কেমন বে-ঘোরেই পড়ে থাকে। আজ দুপুর থেকে হঠাৎ এমনি হয়ে গেল।

সুকুমার বললে, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এখন মার মাথায় বাতাস দাও বসে বসে। আমি ডাক্তার দেখে আসি।

সুকুমার পথে নেমে এল নন্দর মাকে দেখে। এই মহিলার কথা সে অনেক শুনেছে। বহুভাবে। যার মূল কাহিনী হচ্ছে ঃ

নন্দর মা নন্দকে কোলে নিয়ে বিধবা হবার পর রামবাবুর নজরে পড়েছিল। রামবাবুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। বিদেশে কিছুদিন থাকার পর, রামবাবু ওর গহনাগুলো আর টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে গ্রামে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রামের মানুষ ব্যাভিচারের অপরাধে সমাজচ্যুত করে মহিলাকে। শেষকালে অনাহারে মৃতপ্রায় হতে দেখে রামবাবু দয়াপরবশ হয়েছেন। প্রকিওরমেণ্টের রাধারমণ ঘোষকে ভাড়াটে হিসেবে তুলে দিয়েছেন। ভাড়াটের ব্যাপক অর্থেই। রাধারমণ ঘোষ তাই চেয়েছিল। কারণ স্ত্রী বাড়িতে রেখে পুরুষের বিদেশে একা থাকা —স্ত্রী এলে বাসা করে খরচ চালানও দায়। তাছাড়া এই গণ্ডগ্রামে শহরের মেয়ে এসে থাকবে কি করে ? ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ? তাই নন্দর মার ভাড়াটে রাধারমণ ঘোষ। বিনিময়ে নন্দ আর তার মার

খাওয়া পরার ভার। নন্দর মা শয্যাশায়ী হতেই সরে পড়েছেন তিনি।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। সুকুমার তারই মধ্যে ডাক্তারের বাসায় ছুটল।

সেই ডাক্তার। বন্দীপুর আসার পর থেকে সে যার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা শুনেছে। ওকে নিষেধও করা হয়েছিল ডাক্তারের সঙ্গে মিশতে। সুকুমার তখন মাথা ঘামায়নি ওসব নিয়ে। ভেবেছে গ্রামের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? সে কলোনীর লোক। তারপর সে গোষ্ঠি ছেড়ে আসার পর তেমন পরিবেশ বা মানসিক অবকাশ মেলেনি ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হবার। ডাক্তারও অসামাজিক নিশ্চয়। না হলে তিনিওত আলাপ পরিচয় করে নিতে পারতেন। আজ নিজের প্রয়োজনেই তাকে পরিচয় করতে হবে ডাক্তারের সঙ্গে।

ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়েছে। বাসায়, বাইরের ঘরে ডাক্তার তখন ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে একটা ত্রিপদীর ওপর পা তুলে দিয়েছেন। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবী। চোখ বুজে একমনে সিগ্রেট টানছেন।

ডাক্তারবাবু—সুকুমার ডাকল।

কে? ইজিচেয়ার থেকে উঠে দরজা খুললেন ডাক্তার। সুকুমার নমস্কার করল। ডাক্তার একটু মাথা নিচু করে ডাকলেন, আসুন।

ঘরে উঠে সুকুমার একটু হেসে বললে, আমাকে ঠিক চেনেন না আপনি। পরিচয় হয়নি। আমি হচ্ছি—

ডাক্তার বলে উঠলেন, কলোনী অফিসার।

হ্যাঁ। কি করে চিনলেন?

চোখ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। মৃদু হেসে পাশের চেয়ার দেখালেন, বসুন।

সুকুমার একটু অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল। ডাক্তার বললেন, ধূমপান চলবে?

না। হাতজোড় করল সুকুমার।

ঠিক আছে। বলুন, হঠাৎ এই দুর্যোগ মাথায় আমার এখানে কেন?

একটা জরুরী কেস আছে। ডিলিরিয়ম হয়ে গেছে মনে হল। আপনাকে একটু যেতে হবে।

ডাক্তার কৌতূহলী হলেন। কোথায়? আপনার কলোনীতে?

না গাঁয়ের মধ্যে।

মানে, রামবাবুর আড্ডাও ছেড়েছেন। ভূপালবাড়িতে কিছু হয়েছে?

আজ্ঞে না।

তবে? আমাকে ডাকার মত আবার রোগী কে মশাই? এখানেত সবই কম্পাউণ্ডার মার্কা রোগী।

সুকুমার এবার নন্দর মার কথা বলল। ডাক্তার অমনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুকুমারের দিকে। নন্দর মা? ওখানে আপনি? ডোণ্ট মাইণ্ড—ওখানে প্রকিওরমেণ্টের ওল্ড ফুলটা ছিলনা?

ছিল। কিন্তু—

কিন্তু কি?

সুকুমার আবার খুলে বলল সব ঘটনাটা। শুনে ডাক্তর সিগ্রেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে উঠলেন, হাউ ট্র্যাজিক।

সুকুমার বলল, চোখে অমন দুর্গতি দেখা যায় না। দেখে চুপ করে থাকা যায় না। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

ছোকরা ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক আছে চলুন।

নন্দর মার রোগ কঠিন আকার ধারণ করেছে। টাইফয়েড। বাঁকা রকম। ভাল সেবা-শুশ্রূষা চাই। আর ক্লোরোমাইসিটিন লাগবে। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিলেন।

কিন্তু সমাজচ্যুতা মহিলা। সংসারে একা। বারবছরের ছেলে সম্বল। কোথায় পাবে সেবা করার লোক? আর দামী ওষুধ?

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা ওষুধটা আমি দেখছি। ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আমার ত বৌ-ঝি ঘরে নেই যে পাঠিয়ে দেব যত্ন সেবার জন্য।

সুকুমার বললে, আমারও ত সেই দশা। এক আমি নিজে পারি। কিন্তু কলোনীর কাজ আছে।

ডাক্তার বললেন, ভেবেচিন্তে দেখুন। নার্স একটা দরকার হবেই।

ডাক্তার এলেন। আর সুকুমারের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরে গেলেন গ্রামের পথ দিয়ে।

ডাক্তার? বড়ডাক্তারবাবু? কার বাড়ি গিয়েছিলেন? সঙ্গে আবার

সুকুমারবাবু? গ্রামের কয়েকজনের নজরে পড়তেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই আক্রোশে ফেটে পড়ল। একেবারে নন্দর মা। ওই বদমাইস মাগীকে দেখতে গিয়েছিল বড়ডাক্তারবাবু? তাকে ডেকে এনেছিল ওই সুকুমারবাবু?

আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি করে ফুটে উঠল আনন্দ দত্তর। পানের বরজওয়ালা বুড়ো। তারই ভাইপো-বৌ নন্দর মা। ভাইপো লেখা-পড়া শিখে বরজ ছেড়ে চাকরি করতে গিয়েছিল শহরে। বাড়ীর লোকের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে শহরের মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল। তার ফল ফলেছে।

ফলবে না? ভাইপো মারা গেল আচমকা। সমর্থ বৌ কচি ছেলে নিয়ে বিধবা হল। তখন সেত চেয়েছিল মিলমিশ করে নিতে। বলেছিল, বৌমা—তোমার পাকা বাড়িতেই আমরা উঠে আসি। তোমার দেখাশুনা আমরাই করব। তোমার ছেলের পড়াশুনা সব হবে। কিন্তু শহরের সেয়ানা মেয়ে বিশ্বাস করল না। রাম মণ্ডলের কাছে নালিশ করলে। সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিতে চাচ্ছে বলে। আরে স্বামী পেয়েছিলি—সে কার সম্পত্তি? কার রক্ত? সেই রাম মণ্ডল দিল একেবারে মীমাংসা করে। পীরিত হল। বংশটা ডোবাল। মরছে বেশ হচ্ছে। কিন্তু তাকে আবার এখন অত বাঁচানর চেষ্টা কেন?

আনন্দ দত্ত রামবাবুর কাছে ছুটে গেল। রামবাবু তখন ঘাট মেনে বলেছিলেন। সমাজের বিরুদ্ধে তিনি কোন কাজ করবেন না। কিন্তু আজ তাঁরই লোকজন—সরকারী লোক সব আস্কারা দেয় সমাজের কলংককে?

আনন্দ দত্তর কাছে সংবাদ শুনে রামবাবুর চোখে আলো জ্বলে উঠল।

সেদিন তিরিশ টাকা করে উদ্বাস্তুদের হাতে তুলে দেওয়ার মত পরাজয় তাঁর আর কখন হয়নি। মনে স্বস্তি নেই সেজন্যে। সরকারী সুকুমার জিতল। তাহলে ইংরেজ আমল থেকে এ আমলের তফাৎ

কিসে ? তবে দেশ কোথায় স্বাধীন হয়েছে ? স্বদেশী করায় লাভ কি ? কেন গায়েব ওপব খদ্দর চাপিয়ে এত কষ্ট সহ্য করা ?

এইবার আরেকটা লড়াই-এর সুযোগ মিলে গেছে। কলোনী ছেড়ে গাঁয়েব বুকেও হামালা কবতে চায় সুকুমার? আবার বদমায়েস ডাক্তারকে ডেকে এনেছে ? তাকে বদলি করবার তিনি কত চেষ্টা করেছেন।

একটা উত্তেজনা নিয়ে রামবাবু রাস্তায় নেমে এলেন। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আক্রোশে ফুলতে ফুলতে রাস্তাব মোড়ে বটতলায় এসে দাঁড়ালেন। পাশেই ভূপালবাবুব বৈঠকখানা। সুকুমাবেব আস্তানা। আলো জ্বলছে। ঘরে আছে নিশ্চয়ই।

বটতলা দিয়ে চৈতন্য কর্মকার যাচ্ছিল। পাড়াব অতি সাধারণ মানুষ। অন্য সময় বামবাবু কথা বলেন না তার সঙ্গে। এই মুহূর্তে তাকেও প্রয়োজনীয় মনে হল। তিনি জিগ্যেস করলেন, চৈতন, পাড়ায় ডাক্তার এসেছিল জান ?

চৈতন্য বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই শুনছি।

বামবাবু অমনি আস্ফালন করে উঠলেন, দেখদিকি কাণ্ড। আমি গাঁয়ের জমিদার। বোডেব প্রেসিডেণ্ট। তবু সমাজ যা বিচার দিয়েছে তাই মেনেছি। কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসা অফিসাব কিনা নন্দর মার জন্য ডাক্তার ডেকে আনে ? এত সাহস ? আস্পদ্দা ? গাঁয়ে বাস করে তাদেরই অপমান ? আমি মন্দ হতে পারি। কিন্তু গাঁয়ের লোকের এ অপমান সইবনা কিছুতেই। হ্যাঁ—এই বলে দিলাম—

বর্ষাকাল। সন্ধ্যাব পর গ্রামের পবিবেশ শান্ত, নিঝুম। রামবাবুর চীৎকার ভিজে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

সুকুমার ঘরেই ছিল। ঘরে বসে ভাবছিল নন্দর মার সেবা শুশ্রূষার কথা। ভাবছিল দুর্লভপুরের নিবারণ বিশ্বাসের নাতনি জ্যোৎস্নাময়ীর কথা। তাকে ডেকে আনতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। পাশ করা নার্স।

রামবাবুর আস্ফালনে সুকুমার চমকে উঠল। শুনল তাকেই উদ্দেশ্য

করে বলছেন। হীন, নির্লজ্জ কোথাকার—চরম ঘৃণায় সুকুমার মুখ বিকৃত করল। মনে মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল রামবাবুকে, কাপুরুষ—হীন—।

একটু পরেই ভূপালবাবু ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, কি মশাই ওসব কি করছেন আবার? কলোনী ছেড়ে গাঁয়েও কি পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হল? এ্যাঁ—

সুকুমারের হাসবার মন নয় তখন। তবু হাসতে চেষ্টা করল।

ভূপালবাবু আবার বললেন, কেন মশাই ওসব ঝামেলার মধ্যে যান? কলোনী নিয়েই দুর্গতির শেষ নেই। আবার গাঁয়ের ফ্যাসাদ কেন?

সুকুমার বললে, কি আর করা যাবে? চোখের সামনে একটা মানুষ মরে যাবে?

হ্যাঁ।

সুকুমার অবাক হল। ভূপালবাবু বললেন, মশাই অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে জীবনকে তুচ্ছ করার ইতিহাসের ইতি নেই জগতে। বুঝলেন? আপনি তার মধ্যে কে? কেন শুধু শুধু দায়ের ভাগী হতে যান? এ্যাঁ—জানেনত। ভূপালবাবু হাসলেন। বুঝবার উপায় নেই কোনটা তাঁর রসিকতা কোনটা বক্তব্য। তা নিয়ে সুকুমার মাথা ঘামাতেও চায় না। সে গাঁয়ের লোক নয়। সে নিরপেক্ষ। তার কাছে সবাই সমান।

সুকুমার সকালে উঠেই দুর্লভপুর চলে গেল। তখন নিবারণ বিশ্বাস বাড়ি ছিলেন না। পাড়ায় কোথায় বেরিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাময়ীই অভ্যর্থনা করল সুকুমারকে।

আপনি? আসুন, আসুন। এতদিন পরে সময় হল তাহলে? সেই শিগগির আসব বলে গেলেন। সেই শিগগির আজ হল?

সুকুমার চেয়ারে বসতে বসতে বললে, এসেছিত। এটাকে না মেনে পারবেন না।

সেত বটেই। জ্যোৎস্নাময়ী হেসে বললে, ভালই করেছেন। বসুন।

আজ আবার নতুন করে, প্রথম থেকে আলাপ পরিচয় হবে।

কেন ?

সে আগের পরিচয়ত কবে ভুলে গেছি। সে কি আজকের কথা ?

বিদ্রূপ করছে জ্যোৎস্নাময়ী। রসিকতা। সুকুমার হেসে উঠল। জ্যোৎস্নাময়ী বললে, বসুন একটু। চা করে আনি। হেঁটে এসেছেন ক্লান্ত হয়ে। চা খেতে খেতে পবিচয় হবে। সুকুমার কিছু বলবার আগেই জ্যোৎস্নাময়ী ভিতরে চলে গেল।

জ্যোৎস্নাময়ী আবার চা নিয়ে যখন ফিরল তখন সুকুমার মনে মনে তৈরী হয়ে গিয়েছে।

জ্যোৎস্নাময়ীকে বললে, এবার কিন্তু আপনাব কথা রাখতে হবে।

কি কথা। জ্যোৎস্নাময়ী জিজ্ঞাসু হল।

আমাব কলোনীতে যেতে হবে।

জ্যোৎস্নাময়ী হাসল। এই কথা ? নিশ্চয়ই যাব।

আজকেই যেতে হবে। নিয়ে যেতেই এসেছি।

জ্যোৎস্নাময়ী কথা বলল না। সপ্রতিভ চোখ দুটোয় জিজ্ঞাসা জাগিয়ে সুকুমারেব দিকে তাকাল।

সুকুমার বললে, সত্যি। একটা বিপদে পড়েই এসেছি। আপনার সাহায্য চাই। না হলে উদ্ধার পাব না।

জ্যোৎস্নাময়ীর কৌতূহল বাড়ল। কি বলুনত ? আমার সাহায্য দরকার—কি এমন কাজ ?

সুকুমার হাসল। ঘনিষ্ঠ হবার ভঙ্গীতে বললে, জানেন ত ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আপনি অবকাশ যাপন করতে এসেছেন। কিন্তু আমি একটু বাদ সাধতে চাই।

জ্যোৎস্নাময়ী হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা চা-টা এখন খেয়ে নিন আগে। কথা আপনার সহজে ফুরবে না দেখছি।

তা সত্যি। চায়ের কাপ তুলে নিল সুকুমার হাসতে হাসতে। চায়ে চুমুক দিয়ে, তারপর ব্যক্ত করল তার মনবাঞ্ছা। সব বলল, সুবিধা, অসুবিধা। একান্তভাবে আবেদনও জানাল।

জ্যোৎস্নাময়ী দাদুর সঙ্গে অবকাশ যাপন করতে এসেছে। সারাদিন দাদুর সঙ্গে কাটাতে ভাল লাগে না। বৃদ্ধের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না সকল সময়। সেত অমন বুড়ো হয়নি এখন। সেত মানুষ। আবার এযুগের মানুষ।

তার ওপর সে মিশনের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। কাজেই সুকুমারের প্রস্তাবে রাজী হতে তার দেরী হল না। বলল, বেশত। আমি গেলে এবং নার্স করলে যদি উপকার হয় যাব। কিন্তু রাতে থাকতে পারব না।

রাতে থাকার দরকার নেই। সুকুমার খুশীর স্বরে বললে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি থাকলেই চলবে।

জ্যোৎস্নাময়ী ছেলে নয়। মেয়ে। তার মতামতই শেষ কথা নয়। তাই বললে, বসুন। দাদু আসুক। একবার বলে যেতে হবেত। বৃদ্ধ গার্জেন।

একটু পরেই নিবারণ বিশ্বাস ফিরলেন। সুকুমারকে দেখে খুব খুশী। কিন্তু সুকুমার যেই জ্যোৎস্নাময়ীর নার্সিং প্রসঙ্গ উত্থাপন করল অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সুকুমার একটু অপ্রতিভ হল। একটি বয়স্কা মেয়েকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব তার মত একজন যুবকের পক্ষে অস্বাভাবিক বটে। আপত্তি জানালে বলার কিছু থাকে না।

কিন্তু নিবারণ বিশ্বাস ভুরু কুঁচকে বললেন, হিন্দুর বাড়িতে নার্স করতে যাবে জ্যোচ্ছনা? ক্যানে? অপমান কুড়তে?

সুকুমারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, কেন অপমান কিসে?

কিসে নয়? আপনিত হিন্দুর সন্তান। ভেবে দেখুন একবার। এইত গাঁ। এখানে হিন্দুপল্লী আলাদা, খৃষ্টানপল্লী আলাদা, মুসলমান পল্লী আলাদা। বংশ পরম্পরায় সবাই বাস করছি। পাশাপাশি। কাজের বেলায় খুব মেশামেশি। খুব ভাব। আর কাজ ফুরলেই খৃষ্টানের জল অচল। ঘেন্নার পাত্তর। এইত হিন্দুদের কাজ। তাদের বাড়িতে যাবে ক্যানে?

সুকুমার এবার অনেকখানি সাহস পেল। আদর্শের ধারণায় একটা অস্পষ্টতা থাকেই। তর্ক দিয়ে তাকে খুশীমত রূপায়িত করা যায়। তাই বললে, আপনার নাতনিকে যার জন্য ডাকছি তারও জাত নেই। হিন্দুরা তাড়িয়ে দিয়েছে সমাজ থেকে।

নিবারণ বিশ্বাস বললেন, তা জানি। তবু, তবুও হিন্দু। ওর মন ত নষ্ট হয়ে যায় নি। ওর অভ্যাস। ও আরও সাংঘাতিক। হিন্দুর বেশ্যারা সারা জীবন ছত্রিশ জাতকে পার করে শেষে বুড়োবয়সে এক এক পুরুত গিন্নী হয়। এ আমি জানি। খাওয়া ছোঁয়ার বাছ-বিচারের অন্ত নেই। না, না,। জ্যোচ্ছনাকে আমি যেতে বলতে পারিনে। পরের উপকার করা ভাল। খৃষ্টান সমাজের ওটা কর্তব্য। প্রভু যীশুরই কাজ। তাই বলে নিজের অপমান, জাতের অপমান সওয়া ঠিক নয়। এসব গৈ-গেরামের লোকজন সুবিধের নয়। আমিত চিনি সকলকেই।

সুকুমার হতাশ হয়ে পড়ল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে? শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার সে বললে, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। খাওয়া দাওয়া গাঁয়ের কারো বাড়িতেই হবে না। ওখানে ডাক্তার আছেন। তাঁর ওখানে সব ব্যবস্থা হবে। কোন অসুবিধা হবে না আপনার নাতনির। উনি না গেলে বিনা শুশ্রূষায় মরে যাবে একটা মানুষ। তাই বলছিলাম—

জ্যোৎস্নাময়ী সবই শুনছিল এতক্ষণ। আর মনে মনে আগ্রহ বাড়ছিল। এবার বলে উঠল, গেলে ক্ষতি কি? না মেলামেশা করলে ত আর অপমানের ভয় নেই। মিশব না কারো সঙ্গে। কাজ করে চলে আসব। এতে তোমার আপত্তি কি দাদু? একবার দেখে আসি না। তাছাড়া গ্রামগুলোও দেখা হবে। বেড়ান হবে। আর যদি একটা মানুষ বেঁচে যায়।

জ্যোৎস্নাময়ীর কথায় কেমন নিস্তেজ হয়ে গেলেন নিবারণ বিশ্বাস। মৃদুস্বরে বললেন, তবে যাও। কিন্তু সন্দের আগে ফিরবা। গাঁয়ের ব্যাপার। কলকাতার শহর নয়।

নিবারণ বিশ্বাস সম্মতি দিলেন। ঘরের গরুরগাড়ী। ছই দিয়ে

সব ব্যবস্থা করে দিলেন। গাড়ী পৌঁছে দেবে জ্যোৎস্নাময়ীকে। আবার বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসবে।

জ্যোৎস্নাময়ী সেজেগুজে গাড়ীতে গিয়ে উঠল। সুকুমার বললে, আমি হেঁটেই যাব।

দুর্লভপুর পার হতেই মাঠ। মেঠো পথ। সেখানে এসেই জ্যোৎস্নাময়ী আবার সুকুমারকে গাড়ীতে উঠতে বলল। কেন কষ্ট করে হাঁটবেন। উঠে বসুন। আপনার মুখ রাখলাম, আমারও কথাটা রাখুন।

গাড়োয়ান বললে, আসুন বাবু, এ ঘরের গাড়ী। ভাল গাড়ী। কষ্ট হবে না।

সুকুমারের প্রথম গরুর গাড়ী চড়া। জ্যোৎস্নাময়ীর পাশে বসা। দুটোতেই অনভ্যস্ত সে। তাল সামলাতে পারে না। মেঠো পথ। অসমতল। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে ঝুঁকে পড়ে শুধু। মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যায় দুজনের। অপ্রতিভ হয় সুকুমার। শক্ত হতে চেষ্টা করে। জ্যোৎস্নাময়ী আমোদ পেয়ে হেসে ওঠে। সে এক অভিনব আনন্দ।

সুকুমার বন্দীপুর ঢুকে গরুর গাড়ী নিয়ে গিয়ে থামাল ডাক্তারখানার সামনে। দুর্লভপুব থেকে আসতে ডাক্তারখানা আর ডাক্তারের বাসা প্রথম পড়ে। সুকুমার নিবারণ বিশ্বাসকে রাজী করাতে, ডাক্তারের বাসায় জ্যোৎস্নাময়ীর খাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ী বা তার খাওয়াব কোন কথাই ডাক্তারকে বলেনি এর আগে। ভালভাবে বলে আসা দরকার। ডাক্তার তখন ডাক্তারখানায়। গাড়ী থেকে নাম্বল সুকুমার। জ্যোৎস্নাময়ীকে গাড়ীতে রেখে ডাক্তারখানায় উঠে গেল।

জ্যোৎস্নাময়ীর কথা শুনে ডাক্তার অবাক হলেন। বলেন কি মশাই? আপনি একেবারে নার্স এনে হাজির করেছেন? আমার এখানে খাবেন তিনি সেত ভাল কথা। কই চলুন, দেখি আপনার নার্সকে।

ডাক্তার গরুর গাড়ীর সামনে নেমে এলেন। জ্যোৎস্নাময়ীও বাইরে বেরিয়ে এল। সুকুমার পরিচয় করিয়ে দিল। স্মার্ট ডাক্তার অমনি বললেন, তাহলে দুপুরে অনুগ্রহ করে আমার এখানেই আহার করবেন।

জ্যোৎস্নাময়ীও স্মার্ট। বললে, এখনত সেবায় বসিগে। বলুন, রোগীর কাছে কি কি করতে হবে আমাকে?

ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন।

গরুর গাড়ী দুর্লভপুর ফিরে গেল। সুকুমার আর জ্যোৎস্নাময়ী গাঁয়ের মধ্যে হেঁটে চলল।

ভূপালবাবুর বৈঠকখানা পেরিয়ে মোড়ের বটতলা ছাড়িয়ে নন্দদের বাড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছে। দুজনে গল্প করতে করতে চলছিল। হঠাৎ সুকুমার দেখল খুকু আসছে। ওদের খিড়কীর পথ দিয়ে প্রায় মুখোমুখি নেমে এসেছে। সুকুমার স্পষ্ট দেখল, খুকু চমকাল। থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তখানিক। পরক্ষণেই ফিরে খিড়কীর পথ ধরল।

সেদিন কলোনীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল। খুকু দারগাবাবুর পাশে বসে হেসেছিল। আজ সুকুমার জ্যোৎস্নাময়ীর পাশে দাঁড়িয়ে আকস্মিক ভাবেই হেসে উঠল। জ্যোৎস্নাময়ী বুঝল না ঠিক। জিজ্ঞাসু হল।

খুকু তখন খিড়কীর পথে। সুকুমারের হাসি তারও কানে পৌঁছল।

খুকুত সবই শুনেছে। নন্দর মাকে উদ্ধার করতে গেছে সুকুমার। তার বাবার কলংক, রাধারমণ ঘোষের কলংক যে মেয়েমানুষ—যে পুরুষমানুষের অন্যায় সহ্য ক'রে আর পাঁচজন মেয়েমানুষের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দেয়, সে মরছিল। ভাল হচ্ছিল। তাকে আবার বাঁচাতে গিয়েছে ওই বীরপুরুষ। লোকে কত কুৎসিত কথা—লজ্জার কথা বলছে, সুকুমারের নামে। তাই সহ্য করতে না পেরে সে যাচ্ছিল ভূপালবাবুর বাড়ি। দিদিকে বলতে, কেন তারা সুকুমারকে ঠিক পথে চালিত করতে সাহায্য করবে না? তবে আশ্রয় দেওয়া কেন?

কিন্তু পথে একি দেখল সে? গ্রামের বুকে, প্রকাশ্যে একটা বয়স্কা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সুকুমার? তাকে দেখে অট্টহাস্য করল? সন্দেহ, অনুশোচনা, ব্যর্থতার গ্লানিতে খুকু বিহ্বল হয়ে পড়ল। খিড়কীর পথে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে গিয়ে কাঁঠাল গাছটাকে জড়িয়ে ধরল।

জ্যোৎস্নাময়ীকে নন্দর মার কাছে পৌঁছে দিয়ে সুকুমার ফিরে এল।

একটা কাজের মত কাজ করতে পেরেছে। সেই সঙ্গে জোর আঘাত হানা হয়েছে খুকুকে। ছু-ছুটো সাফল্য। কলোনীতেও আপাততঃ শান্তি বিরাজ করছে। সব মিলিয়ে এমন প্রশান্তি আর কোনদিন সুকুমার লাভ করেনি, বন্দীপুর আসার পর।

ভূপালবাবুর বৈঠকখানার বিছানায় একটু আরাম করে শুয়ে প্রশান্তিটা উপভোগ করবার চেষ্টা করছিল সুকুমার। হল না। পাড়ার কয়েকজন লোক এসে ডাকল।

সকলের আগে দাঁড়িয়ে উপেন শিকদার। সেই সুকুমারকে ডাকল। সুকুমার বাইরে এসে দেখল নন্দর ঠাকুরদা, আনন্দ দত্তও দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার অনুমান করা কঠিন নয়। তবু প্রশ্ন করল, কি খবর উপেনদা?

উপেন শিকদার গম্ভীর স্বরে বললে, আপনার কাছে একটা নালিশ জানাতে এলাম।

নালিশ? কি রকম?

সেটা বলবার জন্যেই আসা। আপনি ভাল লোক, আমাদের সঙ্গে মেশেন তাই আব্দার করতে ইচ্ছে হয়। নইলে অফিসারত অনেক আছে। যাদের সাতে পাঁচে থাকিনে। কিন্তু আপনাকে আপন ভাবি। তাই আজ এবা আমার ওপর চড়াও হয়েছে। বলছে, তুমিইত পথ দেখিয়ে সব্বনাশ করেছ। না হলে উনি অফিসার, বিদেশীমানুষ, ছুল্লুবপুরের নিবারণ খীরিষ্টানের নার্স নাতনিকে চিনবেন কি করে? তাই আমাকে আসতে হ'ল। তাই নালিশ—আপনি ও জ্যোছনাকে এগাঁয়ে আনলেন ক্যানে? হিন্দুর গাঁয়ে—হিন্দুর পাড়ায়?

সুকুমার হঠাৎ কথা বলতে পারল না। ছুর্লভপুরে নিবারণ বিশ্বাস তাঁর বাদামী চোখের দৃষ্টি তুলে যে আশংকা ঘোষণা করেছিলেন প্রথমেই সেই বিপদের সংকেত।

সুকুমার বললে, উপেনদা, আপনিই ত নিবারণ খুড়ো বলে ডাকেন। অত আত্মীয়তা—

উপেন শিকদার বললে, আপনি শহরের মানুষ। ওসব ঠিক বুঝবেন না। গাঁয়ের ব্যবস্থা সব দেখছেনত? ছত্রিশ জাতই আছে। কিন্তু

দেখুন, সব আলাদা পাড়া—হিন্দু, মোচনমান, খীরিষ্টান। না হলে জাত বাঁচে না। ধম্মকম্ম ঠাকুর দেবতার মান থাকে না। মেলামেশা আমরা করি। ডাকডোকও সব আত্মীয়ের মতই। সংসারে থাকতে গেলে কাজের জন্য ওটুকু মেলামেশা করতেই হয়। তাই বলে কি ছুঁয়াছুঁয়ি একাকার করতে হবে সব? মোচনমানের হুঁকোয় মুখ দিতে হবে? খীরিষ্টানের চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে হবে? এতটা বয়েস হ'ল, এ অপবাদ আমাকে কেউ দিতে পারবে না।

সুকুমার বললে, আপনি যাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাচ্ছেন—সেত আরেক অপবাদের জিনিস।

বৃদ্ধ আনন্দ দত্ত পিছনে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এল। এ পর্যন্ত সে সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলেনি কোন দিন। সাহস পায়নি। সুযোগও পায়নি। কারণ সরকারী লোক দেখতে সামান্য হলে কি হয়, তাদের শক্তি কত? রাজা, মন্ত্রী, সেপাই শান্ত্রী, আইন-আদালত, থানা পুলিশ সবই তার পিছনে। সে হচ্ছে ওদের লোক। কাজেই গাঁয়ে সরকারী লোককে কেউ ঘাঁটায় না হঠাৎ। সে ওরা যাই করুক।

আজ সুকুমারের সঙ্গে উপেন শিকদারের আলোচনা দেখে সাহস পেল সে। বলে উঠল, দেখুন আমার নাম আনন্দ দত্ত। এই নন্দর বাবার আমি কাকা। ভাইপো মরবার পর তার ছেলে আগলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার বৌ বাড়ি থেকে চলে গেল। চরিত্তির নষ্ট করে ফেলল। বংশটায় কলংক দিল। তাই সমাজ তাকে একঘরে করেছে। সমাজের অপমানের শাস্তি। ওর মরণই ভাল। সমাজের কলংক ঘোচে। অমন মেয়েমানুষ থাকাটাই ভয়ের। ছেলেমেয়ে নিয়ে সকলের সংসার। কিন্তু আপনি হুজুর ওদের দরদ দেখাচ্ছেন। সাহায্য করছেন বুঝমান লোক হয়ে। ইটা আমাদের মাথায় ঠিক খেলছে না।

আনন্দ দত্তকে থামিয়ে উপেন শিকদার আবার আরম্ভ করল, দেখুন সুকুমারবাবু, ক'টা কথা বলি আপনাকে। বিচার করে দেখুন—এই যে কালোনী বসাচ্ছেন, গাঁয়ের লোকের এতেই আপত্তি ছিল। রাম মণ্ডলের জেদের কাজ এসব। নইলে গাঁয়ের লোকই যেখানে উপোসে মরে,

যেখানে কাজ নেই, ব্যবসা নেই, সেখানে কত লোকের এতটুকু জমিই নেই চাষের—আমি ট্যাক্স আদায় করি বোর্ডের। আমিত জানি সব—কতলোকের মাথা গুঁজবার বাড়িঘর, একটা আচ্ছিরায় অবধি নেই, কোন রকমে দুদিন পরে একদিন খেয়ে কাটায়, সেখানে আবার নতুন করে লোক এনে বসতি করানোর আক্কেল দেখে অবাক হয় না কে ?

তবু আপনারা সরকারী লোক যখন আনলেন ওসব, গাঁয়ের লোক কেউ বাধা দেয়নি। যাতে উপগার হয় এতগুনো কষ্টে পড়া লোকের তার কসুর করিনি আমরা। ওদের লোন হচ্ছে, ঘরবাড়ি হবে। হোক। আমাদের কিছু সাহায্য করতে বলিনে। চাইনে কিছু। কিন্তু তাই বলে আমাদের যা আছে তাও নিয়ে নিতে চান নাকি ? এই আপনাদের ধর্ম ? আমাদের সুখ নেই ঐশ্বর্য নেই। শুধু এই সমাজ ধর্মটুকু নিয়ে বেঁচে আছি। এই আচার বিচারটুকু নিয়ে বেঁচে আছি। পুব্বপুরষের মুখ রাখতে পারছি, তাও কেড়ে নিতে চান ? আমরা কি কিছুতেই আমাদের মনটুকু নিয়ে বাঁচতে পারব না ? এমনি কলিকাল এল দেশে ? এমনি স্বাধীনতা ? আপনিও মাথায় লাঠি মারবেন ? বলুন, আপনার কি অপকার করেছি ? কি পাকা ধানে মই দিয়েছি ?

সমস্ত পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠেছে। দুপুরবেলা। উপেন শিকদারের পিছনে পাড়ার মাতব্বরদল দাঁড়িয়ে।

সুকুমার অপ্রতিভ হয়ে বললে, উপেনদা আমাকে অকারণে অপরাধী করেছেন। একজন মানুষ চিকিৎসা অভাবে, সাহায্য অভাবে মরে যাবে, তাই ছুটে গিয়েছিলাম।

আনন্দ দত্ত বললে, আপনি জানতেন না কিছু ?

হ্যাঁ। জানতাম। তবু একটা মানুষের এত কষ্ট।

উপেন শিকদার বললে, আপনার কাছে এটা আশা করিনি।

কেন ? সুকুমার বললে, মানুষ মাত্রেই শুনলে একাজ করত বলে আমার মনে হয়। যে কোন সরকারী লোক শুনলেই ছুটে যেতেন। ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার আসতেন।

তা আসুক। উপেন শিকদার উত্তেজিত হল। যা খুশী করুকগা।

ডাক্তার চুলোয় যাক। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? সরকারী লোকত গাঁয়ে থারও আছে। অনেক কীত্তিই করে। কই তার জন্যেত আমরা মাথা ঘামাইনে। ওরা আমাদের কেউ নয়। আসে চাকরী করে, চলে যায়। আমরাও ধার ধারিনে ওদের। তবে হ্যাঁ—আমাদের ক্ষমতা থাকলে ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম। কিন্তু ওরা সরকারী লোক। থানা কাচারী ওদের। আমরা কি করব? কিন্তু আপনি—আপনিত ওদের মত নন্। আপনি আমাদের লোক। আমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছেন। আপনার সুখ্যাত করে বেড়াই। সবাই ভক্তিছেদ্দা করে। সেই আপনি যদি এখন এমন কাজ করেন, যদি আমাদেরই সব্বনাশ করেন তবে বলুন আমাদের মনে লাগে কি না? দোহাই আপনি আর ও কাদা মাখবেন না। কলোনীর কাজ করুন শুধু। এই আমাদের আর্জি আপনার কাছে। দোহাই।

আত্মীয়তা। সুকুমার বিহ্বলের মত বলে উঠল, আচ্ছা, উপেনদা, তাই হোক। কলোনী ছাডা আর কিছু দেখা শুনা কবব না।

ওরা চলে গেল। কিন্তু সুকুমারের এতদিনেব শিক্ষা-দীক্ষাব দ্বারা অর্জিত বিবেক অমন সিদ্ধান্ত মানতে চাইবে কেন? জ্যোৎস্নাময়ীকে এনে সেবাকাজে লাগিয়েছে। এখন সে সবে আসবে কি করে? অথচ গ্রামের লোকের সাহায্য সাহচর্য তার চাই। কলোনীকে সার্থক করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য গ্রামের লোকইত প্রধান সহায়।

এ এক দ্বন্দ্ব। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সুকুমার শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারের কাছে ছুটল। ডাক্তারই রক্ষা করতে পারেন তাকে। আর কেউ নয়।

তখনো জ্যোৎস্নাময়ী খেতে আসেনি। ডাক্তার রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। সুকুমার এসে সব কথা বিবৃত করল। শুনে ডাক্তার একটু হাসবার ভঙ্গী করলেন। তারপর বলে উঠলেন, ডোণ্ট মাইণ্ড ব্রাদাব। এ আপনার কাওয়ার্ডিস মেণ্টালিটি। কাপুরুষতা। গাঁয়ের মানুষকে ভয়? কে আছে গাঁয়ে? ওই রামবাবু—ডেমন? আর আমার কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপসন সার্ভ করে করে ডাক্তার হয়েছে গাঁয়ে—সে?

আর বাকীগুলোত জড় পদার্থ। ইন্‌ভ্যালিড। তাদের ভয়ে আপনি পিছিয়ে যেতে চান? ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এ ডাক্তার রণে ভঙ্গ দেবে না। তার কাজ সে করে যাবেই। হি হ্যাজ এনাফ কারেজ।

এ হয়ত অপমান। অসম্মানকর উক্তি। তবু সুকুমার নীরবে হাসল মনে মনে। নিশ্চিন্ত হয়ে ভূপালবাবুর বৈঠকখানায় ফিরে এল। তার নিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করে দিল। আর তার প্রত্যক্ষ ফল দেখল ভূপালবাবুর বাড়ির ভিতর খেতে গিয়ে। ভূপালবাবুর স্ত্রী দুদিন থেকে কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষুণ্ণ হয়েছেন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আজ দুপুরে সুকুমার গিয়ে দেখল, তাঁর সেই হাসি, সেই রসিকতা, স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। সুকুমার খুশী না হয়ে পারল না।

ডাক্তারও খুশী হলেন খুব সুকুমারকে মুক্তি দিয়ে। সুকুমারের মুক্তি মানেই জ্যোৎস্নাময়ীর তদারকী ভার নিজের হাতে নেওয়া। এতেই খুশী ডাক্তার। তিনি শুনেছেন, জ্যোৎস্নাময়ী নার্সিং পড়তে বিলাত যাবে।

বিলাত—বিলাত—সুস্মিতার বিলাত।

সুস্মিতা—তাঁর সহ-পাঠিনী। ডাক্তারী পড়ত! সেই সূত্রেই আলাপ। পরিচয় থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে পরিণয়—ঘর বাঁধবার বাসনা পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেই দুজনে আবদ্ধ হবে সামাজিক বন্ধনে। স্বামী-স্ত্রী হবে।

পরীক্ষার খবর বার হল। দুজনেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। খবর পেয়ে তিনি ছুটলেন, সুস্মিতার বাড়ি। সুস্মিতা বাড়ি ছিল না। ওর ভাই সুসময় বললে, বান্ধবীর বাড়ি গেছে বেড়াতে। আপনি বসুন। আমি ডেকে আনছি দিদিকে।

সুস্মিতা এলে তিনি সুখবর পরিবেশন করলেন। সুস্মিতা অবাক হল যেন। বললে, এতে এত আনন্দ করবার কি আছে? পাশ করব বলেইত পরীক্ষা দিয়েছিলাম। এত সামান্য পাশ। কি হবে এই এল. এম. এফ. ল্যাম্পো পাশ করে?

সুস্মিতার এ ঔদাসীন্যের কারণ বুঝা দায়। সুস্মিতাই বিশ্লেষণ করল, বান্ধবী রেণুর এক সম্পর্কিত দাদা—সুধীরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি বলেছিলেন, এখন এদেশে বিলিতি ডিগ্রীর মর্যাদা আছে। চাকরী আর সম্মানে তার পথ প্রশস্ত।

তারপরেই সুস্মিতা প্রস্তাব কবেছিল, চলনা বিলাত যাই।

তিনি সাধাবণ ঘরের ছেলে। অত বড় স্বপ্ন দেখতে পারেন নি কখন। সুস্মিতার কথায় অবাক হলেন। তাঁর টাকা কোথায়? সামর্থ্য?

পরদিন সুস্মিতা তাঁকে সুধীরদার কাছে ধরে নিয়ে গেল।

সুধীর দত্ত ডাক্তার। সম্প্রতি জার্মাণী থেকে ফিরেছেন! পাইপটা মুখে লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ কবলেন। ওঃ। আপনিই সেই লাকি চ্যাপ? গুড। সুস্মিতার ফ্রেণ্ড। সুস্মিতা বড় ভাল মেয়ে। ও এবার ল্যাম্পো পাশ করল। শুনে বললাম, এইত আমি আবার ওদেশে ফ্লাই করব। তুমি চল আমার সঙ্গে। কিন্তু রেণু বললে আপনার কথা। শুনে থমকে গেলাম। তাই আপনাকেও বলছি, ওকে নিয়ে চলে যান। কোন অসুবিধা হবে না। ইণ্ডিয়া হাউসের সাহায্যে কোন দোকানে, কাফেতে বয়-এর চাকরী জুটিয়ে নিতে পারবেন। দেশ-বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অমনি কবেই খরচ চালায়। শ্রমের অমর্যাদা নেই ওদেশে।

তবু যেতে পারলেন না তিনি। সুস্মিতা বিরক্ত হল। শেষ পর্যন্ত সুধীরদার সঙ্গেই সে বিলাত পাড়ি দিল। লণ্ডনে পৌঁছেই চিঠি দিয়েছিল, লণ্ডন যেন অলকাপুরী। স্বপ্নের মত দিন কাটে। সঙ্গে সুধীরদা। দুমাস পরে সে আবার লিখেছিল রাগ করনা লক্ষ্মী সোনা আমার। তোমার মনের সঙ্গে মন জড়িয়েছিলাম। তার নাম প্রেম। প্রেম চলে অন্তরস্রোতের মত। গোপনে। তাই তার বাধা কম। আনন্দ বেশি। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে অনুষ্ঠান। পাঁচজনের রুচি নিয়ে কারবার সেখানে। সে ক্ষেত্রে সুধীরদা গৌরবের জিনিষ কি না, পাঁচ জনের চোখ ধাঁধান অলংকারের সামিল কিনা তুমিই বল। নারী হয়ে লোভ সামলাতে পারলাম না। আগামী সপ্তাহে আমাদের শুভ পরিণয়। তারপর আজীবন এখানে থেকে যাব ঠিক করেছি।

সেই বিলাত। সেখানে জ্যোৎস্নাময়ী যেতে চায়। কখ্খন না। তিনি বাদ সাধবেনই। আলাপ যখন হয়েছে। আর সুকুমারবাবু সরে গেল। খুব ভাল হল। ডাক্তার তাই খুশী, খুব খুশী হয়ে উঠলেন সুকুমারের নিরপেক্ষতার জন্য।

অহিপদ ঘোষ ডাক্তারখানার পিওন। বুড়ো। কাল কুচকুচে রঙ দেহের। মাথার চুল, ভূরু, সব ধবধবে সাদা। মুখের চামড়ায় অসংখ্য অভিজ্ঞতার ভাজ। ফোকলা দাঁত। উদাসীন। হাবাগোবা ধরণের মানুষ। নাম জিগ্যেস করলেই বলে রুইপদ আমার নাম। ফলে সকলেই ওকে রুইপদ বলে ডাকে। ওকে নিয়ে আমোদ করে।

ডাক্তার বললেন, রুইপদ, ডেকে আন নার্স দিদিমনিকে।

রুইপদও সমাজের লোক। তবু উপায় নেই। সমাজের চেয়ে সরকারী চাকরীর দাম বেশি। ওপরওয়ালার হুকুম যমরাজও রদ করতে পারে না। কাজেই রুইপদ গিয়ে জ্যোৎস্নাময়ীকে ডেকে আনল।

ডাক্তার আপ্যায়িত করলেন। খেতে বসিয়ে গল্পগুজব করলেন। সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

জ্যোৎস্নাময়ী ডাক্তারের সৌজন্যে মুগ্ধ হল। পাশকরা ডাক্তার। ছেলেমানুষ। দেখতেও সুন্দর। তার ওপর এত ভাল ব্যবহার? জ্যোৎস্নাময়ী প্রীত হয়ে উঠল প্রথম দিনেই। বন্দীপুর এসে কোন অসুবিধা হবে না, বিপদ হবে না নিশ্চয় করে অনুমান করতে পারল। দাদুর আশংকা অমূলক। দাদুকে সবকথা বলবে সে বাড়ি ফিরে।

খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রামের নামেও খানিক গল্প করল দুজনে। রোগী পড়ে আছে। নন্দর মা। কাজেই জ্যোৎস্নাময়ী ইচ্ছে থাকলেও আর বসতে পারল না বেশিক্ষণ। বিদায় নিল। ডাক্তার দরজা পর্যন্ত এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

দরজার বাইরে এসে ডাক্তার হাসতে হাসতে নমস্কার করলেন। তরুণী জ্যোৎস্নাময়ী প্রতি নমস্কার করছিল যখন, তখন কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ পাশের কলতলায় দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করলেন। শুনলেন। আগুন জ্বলে উঠল তাঁর চোখে। প্রতিহিংসার আগুন। সুযোগের

আলো। ডাক্তার আবার গাঁয়ের বুকে ডাক্তারীতে নামছে। এটা তাঁর ভয়ের কথা বৈকী। ডাক্তার তাঁর শত্রু। রামবাবুর চোখের বিষ। তিনি রামবাবুর অনুগামী।

তখন আর বেশি ভাবতে পারলেন না হরিমোহন দাঁ। বড় মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে। তাদের যত্ন আপ্যায়ন করার কাজ অনেক। তারা সন্ধ্যের সময় বিদায় নিল। তখন হরিমোহন দাঁর ছুটি হল।

বাস্। ছেলেমেয়েরা আলো জ্বেলেছে। মাদুর বিছিয়ে বই খাতা শ্লেট নিয়ে বসেছে। হরিমোহন দাঁ একখানা খাতা টেনে নিয়ে তাদের পাশে বসে পড়লেন। ছেলেরা অবাক, বাবার কাণ্ড দেখে।

হরিমোহন দাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে বসেছিলেন। স্বামীকে অমন করে বারান্দায় বসতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। আবার সেই কাণ্ড চলবে নাকি? সেই রোগ? সেই বিয়ের পর কথাবার্তা নেই, কাগজ কলম নিয়ে কি সব আবোল তাবোল। রাতে শুতে গিয়ে সেই খাতা খুলে সে সব পড়ত। মাগো! কি ন্যাকামি—কি লজ্জা যে হত। যে কথা শুধু মনে মনে ভাববার, তাকে কি করে যে মুখে আনত লোকটা। আজ আবার সেই সব আরম্ভ হল নাকি? মেয়ের বিয়ে হবে ঘোমটা টেনে বৌ সেজে বরের ঘরে যাবে; সেই কথা ভেবে মনে রঙ লাগল নাকি মিনসের? রান্নাঘব থেকে বেরিয়ে এলেন দাঁ-গিন্নী।

ওকি হচ্চে এখন? কি করতে বসলে? ছেলেদের আলোটা দাও। ওরা পড়ুক। তুমি দেখিয়ে দাও।

হরিমোহন দাঁ, বিরক্ত হলেন। ছেলেদের আলো দিয়ে দিলেন। যা পড়গা তোরা—। তিনি বড় মেয়েকে বললেন, লখ্খী ল্যাম্পো জ্বেলে দেত।

স্ত্রী ঝাঁপিয়ে উঠলেন, ল্যাম্পো কি হবে? ঘরে ঝুল হবে না ল্যাম্পো জ্বাললে?

হরিমোহন দাঁ মেয়েকে তাগিদ দিলেন, দে, দে। ল্যাম্পো জ্বেলে দে।

অন্যদিন হলে মেয়ে মার নির্দেশের অপেক্ষা রাখত। আজ পাত্র-পক্ষ তাকে দেখে গেছে। সে সাবালিকা। স্বামীর ঘরে ঘরণী হতে

চলেছে। তাই খুশীর নেশায় বাবাকে ল্যাম্পো জ্বেলে দিল।

হরিমোহন দাঁ ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দরজায় খিল এঁটে দিলেন। কিন্তু অনেক দিন অভ্যাস নেই। আর সেকালে যা লিখতেন সে ত নতুন বৌকে সোহাগ করতে। কিন্তু ছড়া? ময়ূরপঙ্খীর গান?

বুড়োবয়সে মেয়েদের প্রথম সন্তান প্রসবের বেদনার মত, লেখা-লেখির ব্যাপারেও হরিমোহন দাঁর সেই দশা হল। তবু বেদনা যখন আছে, তার প্রকাশ হলই। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে মনের আক্রোশকে সাজিয়ে ফেললেন একরকম করে। একবার মনে মনে গেয়েও উঠলেন ঃ

ও হায় হায় মজার খবর—
ডাক্তারও মজলো রসে গুপ্ত প্রেমে
রসের নাগর।
জাত বিচারে অন্ধ হয়ে
রঙ্গ করে ম্লেচ্ছ নিয়ে
(ও তাকে) সঙ্গ দিয়ে কলতলাতে
হাসির বাহার কি জবর।
যে দেখে তার লজ্জা লাগে—
ধিঙ্গী-ছুঁড়ী ধাত্রী-মাগী
বর জোটেনি কেউ পোছেনি
জোটাতে চায় যাকে তাকে,
তার পায়েতে মাথা কোটে
হিঁদুর ছেলে অষ্টপ্রহর।
ও হায় হায় একি ভীমরতি—
বন্দীপুরের দুঃখ অতি
সরকারী সব বাবুর দলে,
বাস্তুহারা পঙ্গপালের
বেনো জলে
শান্তশিষ্ট গৈ গেরামের
হায় কি দিগদারির বহর॥

হয়েছে। ছড়া লেখা। হরিমোহন দাঁ উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন।

রাতে শুয়ে চোখে ঘুম আসে না। বিছানা থেকে উঠে বসতে লাগলেন বার বার। মাঝে মাঝে বাইরে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্ত্রী গণ্ডা দেড়েক অপগণ্ড নিয়ে মেঝেয় শুয়ে। স্বামীর এমন কাণ্ডে তাঁরও ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। ক্ষেপে উঠে তিনি একবার বলে উঠলেন, হল কি? বার বার বাইরে যাওয়া কেন? বহুমুত্তুর হয়েছে নাকি? ভালো লাগে না। আলো নিবাও। ঘুমুতে দাও।

হরিমোহন দাঁ হেসে উঠলেন। চৌকী ছেড়ে স্ত্রীর কাছে নেমে এলেন। বড় আর মেজ মেয়ে দুটো বড় হয়েছে বলে পাশের ঘরে শোয়। লক্ষ্মীর চোখে ঘুম নেই। তার বিয়ে হবে। সেই স্বপ্নেই বিভোর। হঠাৎ সে চমকে উঠল। কানে যেন একটা চুম্বনের শব্দ লাগল। পাশের ঘর থেকেই যেন শব্দটা এল। অমনি তার শরীরটা শির্ শির্ করে উঠল। তারও স্বামী হবে। ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মী পাশ ফিরল। মেজ বোন পাশে শুয়ে আছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আবেগে তাকেই জড়িয়ে ধরল। উত্তেজনায় তার মুখের ওপর চুম্বন বসিয়ে দিল গোটাকয়েক।

পাশের ঘরে সোহাগ পেয়ে দাঁ-গিন্নি খুব খুশী। নিজের বিছানায় ফিরতে ফিরতে হরিমোহন দাঁ বললেন, শালা ডাক্তারকে এবার ঘায়েল করব। গাঁয়ের বুকে খীরিষ্টান মাগী নিয়ে কেচ্ছা—ভদ্দর লোক, শিক্ষিত বলে। হারামজাদার সংযম বলতে কিছু নেই একেবারে।

ছড়া পেয়ে রামবাবু বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল হরিমোহন দাঁকে।

এই রকম ছড়াইত দরকার এখন। ময়ূরপঙ্খীর শোভাযাত্রায় গাওয়া হবে। এ অঞ্চলের লোক শুনে রস পাবে। উপভোগ করবে। কানাকানি থেকে ব্যাপক প্রচার হবে। তাহলেই ডাক্তারকে তাড়ান সহজ হবে। যদিও তিনি জেলাবোর্ডের মেম্বার তবু ডাক্তারও সেয়ানা খুব। জেলা বোর্ডের কর্মচারী আর অন্যান্য অনেক মেম্বারকে ভজিয়ে রেখেছে বেশ। কিন্তু এবার চরিত্রের ওপর কলংক দিলে আর ঠেকাবে কোন

ভগবান? ঠিক হয়েছে। বেশ ছড়া।

ময়ূরপঙ্খী বার করতে হলে আর এ-ছড়া গাওয়াতে হলে হাবুল কর্মকারকে দরকার। তার হাতে যাত্রার দল আছে। মোটা চাঁদা দেয় সে দলে। একজন পৃষ্ঠপোষাক।

কিন্তু হাবুল কর্মকার আপত্তি তুলল। বললে, এটা ঠিক ময়ূরপঙ্খী গাওয়ার সময় নয়। বিশেষ করে নিবারণ বিশ্বাসের নাতনীর নামে।

কেন?

নিবারণ বিশ্বাস খীরিষ্টান জাতের মাথা এ দিগরে। তার নাতনিকে নিয়ে অমন করলে কি হাওয়া ভাল হবে? এখন আকালের সময়। লোকে ঘটি বাটি বাঁধা রাখবে আমার কাছে। চাল কিনতে আসচে এ আড়ৎএ। ঝাণ্ডাওয়ালা চারিদিকে চেঁচাচ্ছে কনট্রোলের চালের কোটা বাড়াতে হবে ব'লে। আর টেষ্ট রিলিফের কাজ চাই ব'লে। তাদের নেতা ওই নিবারণ বিশ্বাসের নাতি। শেষ পর্যন্ত হয়ত এ চালের দোকানে হামলা বাধাবে। গাঁয়ের লোকের মাথার ঠিক নেই খিদেয়। যা বলবে ওরা তাই শুনবে এখন।

ঠিক কথা। রামবাবু কথার গুরুত্বটা বুঝলেন। আকালের কালে খাদ্যের দাম বাড়িয়ে ব্যবসা। কম দায়িত্ব নয়। নেহাৎ শান্তির দেশ, ভাল মানুষের দেশ, আচার বিচারের দেশ, আর পুলিশ দারোগা, দেশের শাসন খুব ভাল, তাই। তবু মানুষকে বিশ্বাস নেই। তাইত ছোট ভাইকে লিখেছেন, এসময়ে দেশে এসে মরশুমটা ঠেকিয়ে দিয়ে যেতে। পাশে হাজির থাকলেও অনেক কাজ হবে।

ভেবেচিন্তে রামবাবু শেষ পর্যন্ত ময়ূরপঙ্খীর পরিকল্পনা স্থগিত রাখলেন। তবু মনে মনে আপশোষ যায় না। গাঁয়ের বুকে বাইরের উটকো লোকের বাড়বাড়ন্ত অসহ্য। চিকিৎসার নাম করে নার্স নিয়ে ফুর্তি করা তার নাম সেবা? রামবাবুর মনটা নিস্‌পিস্ করতে লাগল। তাঁকে ফাঁকি দিতে চায় ডাক্তার? এত সহজ? তিনি যৌবন কাটিয়েছেন ওই করে। পয়সাকে কেয়ার করেন নি। নিজের বলতে যা ছিল—মায় বৌ-এর গয়নাগাঁটি অবধি রাখেননি। সে সব ফুরিয়ে

গেল তাই। এখন না হয় ভাই-এর টাকায় ব্যবসা চালিয়ে খাচ্ছেন। তাই বলে ডাক্তাব টেক্কা মেরে যাবে ?

হাবুল কর্মকার অবশ্য বলে গেল, দেখা যাক। অন্যভাবে ছড়াটা কাজে লাগাতে চেষ্টা কবতে হবে।

রামবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাই একটু ভেবে দেখোদিকি।

রামবাবু, হাবুল কর্মকার আর হরিমোহন দাঁ। ছড়ার আলোচনাটা সীমাবদ্ধ ছিল তিনজনেব মধ্যে। গোপনেই হয়েছিল। তবু যেন দেওয়ালেব কান বেয়ে বেয়েই ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটা। ডাক্তারের কানেও পৌঁছে গেল। কিন্তু ডাক্তার শুনে শুধু একটু হাসলেন। যা খুশী করুক ওবা। ওটা নতুন কিছু নয়। মূঢ়তা অমন আঘাত সভ্যতাকে পদে পদে হেনে চলেছে। জড়তা মুক্তির পথকে দুর্গম কবছে। স্বার্থ থেকেই নীতি আব শাস্ত্রেব উদ্ভব। শাস্ত্র মানেই সুবিধা। যুগ যুগ ধবে হিন্দু তাব শাস্ত্রেব নিরীখে বাজ্য কবেছে। তারপর এসেছে মুসলমান। তার শাস্ত্র তখন হয়েছে সব মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের নিরীখ। তাবপব খৃষ্টান। সেও সেই পথেই পবিক্রমা চালিয়েছে। আপন শাস্ত্রেব নিরীখেই।

কিন্তু মানুষ তাকে কোনকালেই পুবোপুরি ভাবে মেনে নেয়নি। মানুষ ছুটেছে আপন বেগে। আপন কক্ষপথে। স্থান কাল পাত্র ভেদে সংগ্রাম হয়েছে। গতি ব্যহত হয়েছে। ক্ষয় ক্ষতি অনেক হয়েছে। মানুষ চলেছে। আজ এসেছে নতুন নীরিখ। নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে এদেশের মানুষ। হিন্দু রাজা নেই, মুসলমান রাজা নেই, খৃষ্টান রাজা নেই, বৌদ্ধ রাজা নেই। কেউ রাজা নেই। মানুষের চলবার পথ আছে শুধু। সবাই চলবে। পাকিস্থানের অমুসলমানদের মত এখানে কেউ জিম্মি নয়। কাজেই কোন এক সম্প্রদায়ের নিরীখকে ডাক্তার ভয় করেন না। কারো একচেটিয়া ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ঘৃণা ধিক্কারই জীবনের সত্য, সম্বল হবে না। তাঁর পক্ষেও কত মানুষ ছুটে আসবে। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—। বাবা মার উৎপাদিত হয়েও সন্তানের সত্তা ভিন্ন। তার উপলব্ধ সত্য ভিন্ন। ব্যবধান ঢের। তবু তাদের

সকলের মিলনেই পরিবার গঠিত। সুখী পরিবার। ডাক্তারের চোখে সমাজ সংসারকে তাই মনে হয়। কাজেই তাঁর কোন ভয় নেই মনে।

জ্যোৎস্নাময়ীর ভাবনা চিন্তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। সে মিশনের খরচে বিলাত যাবে নার্সিং পড়তে সে মিশনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। প্রতিদিনই সংকোচ নামছে তার মনে। আত্মজিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠছে। নন্দর মা দ্রুত আরোগ্য লাভ করছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার সেবা কাজ ফুরবে। তখন সে বন্দীপুর আর আসবে না। বন্দীপুর এসে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ঘনিষ্টতা বেড়ে গেছে, দুপুরে খাওয়া, বিকেলে চায়েব আসর—সব হারিয়ে যাবে। ডাক্তারের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তাহলে? তখন ডাক্তারকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে যাবে মাঝে মাঝে। কিন্তু বিলাত চলে গেলে?

জ্যোৎস্নাময়ী অসতর্ক মুহূর্তের এই সব চিন্তার জন্যে চমকে ওঠে। কি ভাবছে সে? সেত তার জীবনকে তৈরী করছে প্রভু যীশুর সেবিকা হিসেবে। মিশনের ওপর কত আস্থা। সর্বত্যাগী হয়ে তাকে সকলের সেবা করতে হবে। কুমারী থেকে। কাজেই এসব চিন্তা—হ্যাঁ মোহ—পুরুষের প্রতি আকর্ষণ—পাপ। জোর করে নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করে জ্যোৎস্নাময়ী। পারে না। এরই নাম কি পাপের আসক্তি?

যেদিন জ্যোৎস্নাময়ীর মনে এসব চিন্তা ধরা পড়েছে সেদিন থেকেই সে প্রভু যীশুর মূর্তির সামনে বসে নাম জপ সুরু করেছে। শয়তানের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের জন্যে প্রভুর করুণা ভিক্ষা করে রোজ। তবু—পাপ কি দুর্বার। জ্যোৎস্নাময়ী দুশ্চিন্তা রোগী হয়ে উঠছিল দিন দিন।

ঠিক সেই সময় ডাক্তার একদিন প্রশ্ন করলেন, আর কদিন?

বিকেলের মজলিশে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। পেয়ালা নামিয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল। শংকিত দৃষ্টিতে।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, পেশেণ্টত সেরে উঠল। আরত এ গ্রামে আসবেন না। তখন এ চায়ের আসরের কি হবে?

জ্যোৎস্নাময়ী চমকাল। এতদিন যে প্রশ্ন, যে চিন্তাকে পরিহার

করতে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, ডাক্তারের মনেও সেই প্রশ্ন? সে জবাব দিতে পারল না। ফেরার পথে এই কথাগুলোই পাক খেয়ে উঠতে লাগল মনে। আজ প্রভু যীশুর পায়ে সে মাথা নিচু করে পড়ে থাকবে। কাতব প্রার্থনা কববে এর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য।

বাড়ি পৌঁছে জ্যোৎস্নামযী দেখল দাদুর মুখখানা কেমন গম্ভীর। থমথম করছে। তার সামনে ত দাদু এমন করে থাকে না? জামা কাপড় ছেড়ে এসে জ্যোৎস্নাময়ী দাদুর সামনে দাঁড়াল। দাদু অমন করে আছ কেন? কি হয়েছে?

বৃদ্ধ নিবাবণ বিশ্বাস অমনি কঠোর হয়ে উঠলেন। চড়াস্থরে বললেন, বন্দীপুব গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে কি করিস?

জ্যোৎস্নাময়ী কেঁপে উঠলেন।

নিবারণ বিশ্বাস বললেন, কি করিস এমন, যাব জন্যে যাত্রাদলের ছোকরা ছড়া বানায়, গান গায়? আজ হাবুল কর্মকার আর কম্পাউণ্ডার দাঁ এসে বলে গেল। তাবা ছড়া গাইতে শুনেচে। কম্পাউণ্ডার বলল, গাঁয়ে তাই নিয়ে কানাকানি চলচে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। এত বড় বিশ্বেস বংশের মুখে কালি পড়ল আজ?

জ্যোৎস্নাময়ী দাঁড়াতে পারছিল না। কোন রকমে নিজের ঘবে এসে ঢুকে পড়ল। খিল তুলে দিল দবজায়। ছিঃ-ছিঃ—কি জঘন্য ইঙ্গিত—অথচ কত মিথ্যে। কিন্তু সে যদি প্রতিবাদ করে, কে শুনবে? এ খবর ক্রমে চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। দুশ্চিন্তায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ল জ্যোৎস্নাময়ী। ক্ষুধা তৃষ্ণা হারিয়ে গেল।

রাতের বেলা নিবারণ বিশ্বাস এসে ওর দরজায় ঘা দিলেন।

দাদু দরজায় ঘা দিচ্ছেন। জ্যোৎস্নাময়ীর অন্যমনস্ক মন চমকে উঠল। দাদু ডাকছেন। আস্তে আস্তে উঠে এসে সে দরজা খুলে দিল। দাদুর মুখের দিকে তাকাতে পারল না।

নিবারণ বিশ্বাস কিন্তু স্নেহসিক্তস্বরে ডাকলেন, জোচ্ছনা, আয় দুটো খেয়ে নিবি।

জ্যোৎস্নাময়ী বললে, না। খিদে নেই।

আছে। আয়। নিবারণ বিশ্বাস ঘরে ঢুকে নাতনিকে বিছানার কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। নিজে বিছানায় বসে, নাতনির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, জানিস এ বিশ্বেস বংশ কত উঁচু?

জ্যোৎস্নাময়ী দাদুর মুখের দিকে তাকাল। দেখল, বৃদ্ধের মুখখানা বড় করুণ, বড় ক্লান্ত। জ্যোৎস্নাময়ী দাদুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। কাতরস্বরে বললে, আমি আর বন্দীপুরে যাবনা দাদু।

নিবারণ বিশ্বাস বললেন, সে তুমি বুঝে দেখ। তুমিই জান, কি করতে ডাক্তারের সঙ্গে।

অমনি মুহূর্তে যেন অমোঘ শক্তি পেল জ্যোৎস্নাময়ী। মাথা তুলে খাড়া হয়ে প্রতিবাদ জানাল সব মিথ্যে, মিথ্যে কথা। ডাক্তার তেমন লোকই নয় দাদু। এ অঞ্চলের কারো সঙ্গে তুলনাই হয় না। একদিন নিয়ে আসব তাঁকে। তুমি দেখো। সুকুমারবাবু ডেকে নিয়ে গিয়ে আর খোঁজ নেন না। কিন্তু সব সাহায্য করেন ওই ডাক্তার।

নিবারণ বিশ্বাস জবাব দিলেন না। নাতনির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, চ' গেরাস দুই ভাত মুখে দিবি।

সারারাত দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে জ্যোৎস্নাময়ী সকালে উঠেই কিন্তু আবার বন্দীপুর গেল।

ডাক্তারকে একবার বিষয়টি জানান দরকার। সে বেচারী ভদ্রলোক, নির্দোষ। তাঁর সৌজন্য, সহৃদয়তাই তাঁর পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকথা তাঁকে একবার জানিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুখে কোন কথা জ্যেৎস্নাময়ী বলতে পারল না ডাক্তারকে। সে কথা বলা যায় না। তাই সে তৈরী হয়ে এসেছিল। লিখে এনেছিল। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে উঠে আসার সময় চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে গেল।

চিঠি? ডাক্তার কৌতূহল নিয়েই চিঠিখানা পড়লেন। সংবাদটা তাঁর কাছে নতুন নয়। কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ীর কানে উঠেছে জেনে দুঃখিত হলেন। নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নাময়ী আঘাত পেয়েছে মনে। ডাক্তারের

মনে একটা সিভাল্‌রি ভাব জেগে উঠল। ওকে সাহস দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে দুশ্চিন্তা অর্থহীন। ডাক্তার মনে মনে তৈরী হলেন।

দুপুরবেলা জ্যোৎস্নাময়ী খেতে এল। কিন্তু ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না কিছুতেই। ডাক্তার বুঝলেন। পরিবেশটা সহজ করার জন্যে তিনি কথা আরম্ভ করলেন। আপনার চিঠি পড়লাম। আপনি ভয় পাচ্ছেন মনে হচ্ছে। আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

জ্যোৎস্নাময়ী একটু অবাকদৃষ্টিতে তাকাল এবার।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, তাই। ওদের বোকামিতে হাসব নাত কি? ওরা কুৎসা রটনা করতে চায়। কিন্তু ওরা জানেনা কুৎসারও স্থান কাল পাত্র ভেদ আছে। ওরা যাকে কুৎসা ভাবে সে ওদের জড়তাও হতে পারে। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতাকে হীন ভাবাটাই হীনতার পরিচায়ক। আর এক্ষেত্রে ধারণাটাই যখন মিথ্যা—অপপ্রচার—

জ্যোৎস্নাময়ী কথা বলতে সাহস পেল। বললে, তবুত প্রচার। —লোক জানাজানি।

ডাক্তার বললেন, কিন্তু আমরাত জানি মিথ্যে। সেই আমাদের শক্তি।

জ্যোৎস্নাময়ী বললে, তবু প্রচারের কিছু শক্তি আছেই। অপপ্রচার নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। আপনার ক্ষতি হবে। আর মিশনের কাজে আমাকে বিদেশে যেতে হবে। বিলাত। সেই মিশন যদি শোনে—

মুহূর্তে ডাক্তারের উদ্দীপনা জেগে উঠল। যেন এই সুযোগই খুঁজছিলেন। বললেন, মিশন শুনলে কি হবে? অবিশ্বাস করবে? যারা জেনেশুনে বিচার করে উপযুক্ত মনে করেছে, অন্যের কথায় তাদের সেই বিচার বিপর্যস্ত হবে? আশ্চর্য! তাদের ভরসায় আপনি নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে চলেছেন?

জ্যোৎস্নাময়ী বললে, না, গড়তে নয়। সৎ এবং মহৎ কাজে লাগতে।

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি আরও অনেকবার শুনেছি আপনার কাছে। জীবনকে উৎসর্গ করতে চলেছেন সৎ এবং মহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে। আপনি মিশনারি হবেন শুনেছি। দুঃখ পেয়েছি

মনে। আপশোষ করেছি। কেন পরিচয় হল আপনার সঙ্গে? আপনার এ আত্মোৎসর্গ আত্মবঞ্চনা বলেই মনে হয় আমার কাছে।

জ্যোৎস্নাময়ী আঁৎকে উঠল। ডাক্তার লক্ষ্য করলেন। বললেন, বলতাম না। আমি ডাক্তার, আপনি নার্স। দুজনেই বিজ্ঞানের কারবারী। বিজ্ঞান যুক্তিবাদী। তাই আমার কাছে ওসব তথাকথিত কলংক পবিত্রতার কোন অর্থ নেই। যারা অপপ্রচার চালাতে উদ্যত, যারা আপনার আজীবন কুমারীত্বের চুক্তিতে আপনার ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নিতে চায়, আর—আপনার মত যাঁরা এই নীতিতে বিশ্বাসী—এই তিন গোষ্টিই বিভ্রান্ত। ওর বিরুদ্ধে যুক্তি আছে দৃষ্টান্ত আছে ভুরি ভুরি।

জ্যোৎস্নাময়ী ডাক্তারের কথা শুনে নির্বাক প্রায়।

ডাক্তার বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন, জীবদেহের প্রতিটি জীবকোষ তার খাদ্য চায়, তার পূর্ণতা চায়। তাদের সম্মিলিত পূর্ণতা নিয়েই জীবেরও স্বাস্থ্যের সুস্থতা। তার কোন অংশের খাদ্যাভাব—অর্থ—অপূর্ণতা। অপূর্ণতা অর্থে সামগ্রিক সুস্থতার অভাব। অর্থাৎ পঙ্গু। সমাজ, জীবনের ক্ষেত্রেও এই ত সত্যি। যেখানেই এর ব্যতিক্রম, সেখানেই অশুভ ফল। তার ব্যর্থ করুণ পরিণতি ছড়িয়ে আছে যুগ যুগের মঠ মন্দির প্যাগোডার গীর্জার অন্তরঙ্গ ইতিহাসে। দেবদাসী, ভিক্ষুণী আর নান্‌দের সঙ্গে পুরোহিত ভিক্ষু আর পাদরীদের কত গোপন কাহিনীতে। তার প্রভাব ছড়িয়ে আছে সারা সমাজে। কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করছে—মানুষের চেয়ে নীতি আর সংঘ বড় নয়। নীতির খোলস, আর সংঘের কাঠামো মানুষের চরম চাওয়া নয়।

চাইবে কি করে? সুরবাহার তুলে নিয়ে আর সব তারগুলোকে বাতিল করে, একটি তারে সুর তুললে সে বাজনা যতই উচ্চাঙ্গের হোক সে একতারাই হবে। সুরবাহারের গৌরব তার জোটে না। সে সব সমস্যার নির্দেশ দিতে অক্ষম। তেমনি ব্রহ্মচারী কি করে বুঝবে, সংসারের অন্তরতম বেদনা? সেত অন্তরঙ্গ নয়। সে ক্ষুণ্ণ। তাই শংকরাচার্যকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। মার্টিন লুথারকে সংসারী হতে হয়েছিল। বিজ্ঞান বলছে, সব জানলা দরজা খুলে দাও।

জ্বেলে দাও আলোর দেওয়ালি। সেতারের সব তারগুলো বাজিয়ে তোল। সম্ভোগের ঐক্যতান বাদনে জাগিয়ে তোল সমাজ থেকে ব্যক্তিকে পর্যন্ত। অন্যথায় পূর্ণতার আশা ব্যর্থ হবে। এর মধ্যে পাপ নেই, কলংক নেই, অপবিত্রতা নেই। বরং একে পরিহারের চেষ্টাই পরিপূর্তির বাধা সৃষ্টির চেষ্টা। সেই অবৈধ। ভ্রূণ হত্যার সামিল। জীবনের স্বাভাবিকতাকে পরিহারের চুক্তি নিশ্চিত আত্মবঞ্চনা। এই বঞ্চনা দিয়ে কোন সৎ-মহৎ কাজই হয় না। হতে পারে না।

জ্যেৎস্নাময়ী সেদিন পালিয়ে এল—বন্দীপুর থেকেই চলে এল সকাল সকাল। ছিঃ-ছিঃ। একি যুক্তি ডাক্তারের। পাপ—মহাপাপ।

বাড়ি এসে সে দেখল দাদু তখন উপাসনা ঘরে উপসনায় বসেছেন। সেও ভারাক্রান্ত মনে নিঃশব্দে এসে তাঁর পিছনে বসে পড়ল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সামনে কাঠের সিংহাসনে রূপোর তৈরী ক্রুশ। তার সামনে কম্বলের আসনের ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছেন নিবারণ বিশ্বাস। করজোড়ে মন্ত্র পড়ে চলেছেন।

'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে—আমেন।'

জ্যোৎস্নাময়ী ক্রুশের ভঙ্গীতে হাত দুটো আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর স্থাপন করল। উন্নত যৌবন নিষ্পিষ্ট হল ওর। অমনি ডাক্তারের কথাগুলো মনে বেজে উঠল যেন। সঙ্গে সঙ্গে আতংকিতা হয়ে বলতে আরম্ভ করল।

'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতে পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইস্থক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। আমাদের ক্ষমা কর যেমন আমরা নিজ আপরাধী দিগকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদের পরীক্ষা আনিও না। কারণ রাজ্য পরাক্রম মহিমা তোমারই যুগে যুগে। আমেন্।'

তারপর দাদুর কণ্ঠকে অতিক্রম করে আরও উচ্চকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল, 'প্রভু যীশুর প্রসাদ, ঈশ্বর পিতার প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহ-ভাগিতা আমাদের সঙ্গে এখন এবং নিত্যকাল থাকুক। আমেন্।'

তবু—তবু আজ যেন খাঁচার বাঘ দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে। যে প্রবৃত্তিকে অনেক যত্নে কৃচ্ছ্র তার দ্বারা দমিত করেছিল জ্যোৎস্নাময়ী, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে সযত্নে প্রতি মুহূর্তে গঠন করে তুলছিল নিজেকে, আজ ডাক্তারের বাঁধভাঙা বক্তৃতায় তার বিপর্যয় উপস্থিত।

বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না জ্যোৎস্নাময়ীর। শুধু ডাক্তারেরই মুখ ভেসে ওঠে মনে। সেই হাসি, সচ্ছন্দ স্বাভাবিক মানুষের ভঙ্গীগুলো। কেন মনে আসে? পাপ? পাপের আকর্ষণ। ঈভকে টেনেছিল অমনি করে। এ্যাডামকেও টেনেছিল।

প্রভু যীশুকে ডেকে সারা হল জ্যোৎস্নাময়ী। সারারাত ডাকল। পরদিন সকালে উঠে কলকাতা যাবার আয়োজনে লেগে পড়ল। মিশনের পরিবেশে গেলে নিশ্চয়ই এর একটা পরিবর্তন সম্ভব হবে।

জ্যোৎস্নাময়ী আর বন্দীপুরে এল না।

উৎসুক প্রতীক্ষার পর ডাক্তার হতাশ হয়ে পড়লেন। জ্যোৎস্নাময়ী নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে মতবাদ শুনে। কিন্তু একদিনত প্রকাশ করতে হ'তই। ডাক্তার মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। জ্যোৎস্নাময়ী আর আসবে না? বিলাত চলে যাবে। মনটা হাহাকার করে উঠতে লাগল ওঁর। যেমন পৌরুষএর হাহাকার ওঠে রমণীয়তার অভাবে। অদর্শনে। নিজের অধিকারে না আনতে পারার অক্ষমতায়।

সুস্মিতা বিলাত গেল। তার পরইত তিনি পালিয়ে এসে এখানে আত্মগোপন করেছেন? বেশ নির্জন, নিঃসঙ্গতার নির্মম শান্তিই এখানে ছিল। জ্যোৎস্নাময়ী এসে সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল? দুঃসহ প্রতিক্রিয়ায় ডাক্তার ভেঙে পড়লেন। একি হয়ে গেল তাঁর?

সবচেয়ে ক্লান্তিকর হয়ে উঠল দুপুর। মধ্যাহ্ন ভোজন। সেই দুজনে মুখোমুখি বসে খাওয়া, গল্প গুজব, আলোচনা—। কিছু নেই আর।

বাইরে নির্জন দুপুর। ঘুঘু ডাকছে। ডাক্তার অশান্তমনে খেতে পারলেন না ভাল করে। উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। কখন গিয়ে চেয়ারে বসেন। কখন আবার বিছানায় শুয়ে পড়েন। না। তবু শান্তি নেই কোথাও। অশান্ত মনে শুধু বেদনার দাহ।

হঠাৎ ঘরের বাইরে এক সময় মুহুর্মুহু ধ্বনিতে বাতাস ভরে উঠল। ধ্বনিটা আসছে কলোনীর দিক থেকে—বন্দেমাতরম্। জানালার কাছে উঠে এলেন ডাক্তার। বাইরের দিকে তাকালেন উদাসীনের মত।

কলোনীর মানুষগুলো দল বেঁধে চলেছে। তাদের পিছনে চলেছে সুকুমার। ডাক্তারের মনে হল, সুকুমার যেন এক নিঃসঙ্গ অপরাধী আসামী। ডাক্তার হেসে উঠলেন। বিদ্রূপের, বিতৃষ্ণার হাসি। পরক্ষণেই বিরক্তির সঙ্গে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। দেখবার কিছু নেই। ওসব মামুলী—মায়া—আত্মবঞ্চনারই রূপ—মূর্খ মূঢ় সুকুমার বাবু—মায়া মৃগীর পিছনে ছুটছে আত্মহননের নেশায়।

ডাক্তার জানালা বন্ধ করে দিলেই পৃথিবী অবরুদ্ধ হয়ে গেল না। পৃথিবীর গতি থেমে গেল না। খাঁ খাঁ করা তুপুরের মধ্যেই উদ্বাস্তুর দল ধ্বনি দিতে দিতে চলল। আনন্দ ধ্বনি। আশার ধ্বনি। রামবাবুর ঠাকুরবাড়িতে বড় কলোনী অফিসার এসে বসে আছেন। লোন এনেছেন। সুকুমারেরও আনন্দ কম নয়। এত দিনে পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হতে চলেছে। এতদিনের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ শান্ত হল।

কিন্তু সুকুমারত জানতই শান্তি আসবে না এতে। নতুন অশান্তি আরম্ভ হবে। হলও তাই। কলোনী অফিসার রামবাবুকে তুষ্ট করতে নবীন জীবনদের ভাগে অতিরিক্ত লোন দিলেন। বিশেষ ক্ষমতা বলে। আর রামবাবু সগৌরবে উদ্বাস্তুদের সামনে দাঁড়িয়ে সে টাকাটা নবীনদের গুণে দিলেন। মন্তব্য করলেন, দেখলেত, বলেছিলাম কিনা—একটা যা হয় করবই—এঁ্যা—হেঁ-হেঁ-হেঁ—।

সুকুমারের বিরক্ত হবারই কথা। চতুর কলোনী অফিসার ভূপাল বাবুর বৈঠকখানায় এসে সুকুমারকে বললেন, একটা শুভসংবাদ দিই। আপনার একজন পিওন মঞ্জুর হয়েছে। তু'একদিনের মধ্যে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে নামটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দেরী করবেন না মোটে। পিওন না থাকলে কাজের খুব অসুবিধা হয়। মর্যাদাও থাকে

না। অফিসার হাসলেন। সুকুমার হাসতে পারল না।

সুকুমার চাকুরীজীবী। কর্মচারী। অন্যায় বৈষম্য দেখেও সে নীরব থাকতে পারে। কিন্তু উদ্বাস্তুরা শুনবে কেন? সুকুমারকে আটক করল সবাই মিলে। কেন, কেন এমন কাণ্ড হবে?

সুকুমার জানত এমন হবে। সে সোজা বললে, আমার হাতে ত সমস্ত সরকারী দপ্তর নেই। আমি একা কি করতে পারি? রামবাবু তোমাদের এনেছেন—তিনি যা করবেন—বুঝতেই পারছ।

হ্যাঁ-হ্যাঁ। পারছি। খুব বুঝছি আমরা। উদ্বাস্তুরা হৈ-হৈ করে উঠল। আমরা সব বুঝি স্যার।

এই মুহূর্তে রামবাবুর পক্ষ বিপক্ষ সব যেন একাকার হয়ে গেল। ঈর্ষায়, স্বার্থ চেতনায় কলোনী মুখর হয়ে উঠল। তার প্রতিক্রিয়ায় ছড়াগান বেজে উঠল কলোনীর বাতাসে, লোকের মুখে মুখে। মজার ছড়া, সত্যি ছড়া, মুখরোচক গান।

ঘরের বৌ বিকিকিনি
টাকা বাজায়, রিনিঝিনি
কুললক্ষ্মী কেঁদে মরে
ভাতার সোহাগী।

ছড়া গায় আর হাসে। শোনে আর হাসাহাসি করে সব।

গৌরীশংকর একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এটা হাসির জিনিস নয়। কলংক কথা। আমাদের সকলের। হোক রামবাবু জমিদার। তাই বলে নিজেদের মান সম্মান নেই? যদি তেমন কিছু ঘটে ছাড়া হবে না। এ প্রতিজ্ঞা করা দরকার সকলের।

নিশ্চয়। নিশ্চয়। সবাই একমত। চলবে না। ওসব চলবে না। এ কলোনীর মধ্যে থেকে।

সুকুমার আর কোন সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চায় না। অনেক বিরোধ ত হল। এবার লোন এসে গেছে। এবার কাজের দিন। গঠনের কাজ। টাকাগুলো দিয়ে যাতে মাথা গুঁজবার মত ঘর তুলে ফেলে

সবাই তার তাগিদ দেওয়া, তদারকী করা দরকার। আর কোন কাজ নয় এখন। মনকে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া ঠিক নয়। সুকুমার সেই চেষ্টাই করছিল।—কিন্তু পারল না।

জ্যোৎস্নাময়ী বন্দীপুর ছেড়েছে। নন্দর মাও আরোগ্যলাভ করেছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে। আর হারিয়েছে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সুস্থতা। তবু যাহোক প্রাণে বেঁচেছে। রাধারমণ ঘোষ ছুটি থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রামবাবু তাঁকে আর উঠতে দেননি নন্দদের বাসায়। এইখানেই বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে আবার। নন্দ একবার সুকুমারের শরণাপন্ন হয়ে সুফল পেয়েছে। তাই তারই টানে টানে আবার সুকুমারের কাছে ছুটে এল। কেঁদে ফেলল আবার।

কি খাব? রাধারমণ বাবু যে উঠে গেলেন বাড়ি থেকে?

সুকুমার চিন্তিত হল। গ্রামের লোকেব আবেদনে একদিন সে সরে এসেছিল। জ্যোৎস্নাময়ীকে গ্রামে এনেও মেলামেশা করতে পারেনি। প্রবল ইচ্ছাকে দমন করেছে। জ্যোৎস্নাময়ী কি ভেবেছে কে জানে। কিন্তু আবার সেই অসহায় আর্তনাদের পুনরাবৃত্তি?

কিশোর বালক নন্দ। তার কান্নায় বিচলিত না হয়ে পাবা যায় না। সুকুমার একদিন সাহায্য পেয়েছিল ডাক্তারের কাছে। আজ আবার সেই ডাক্তারের কাছেই ছুটল।

কিন্তু এ কোন মানুষ? এ কোন মনোবৃত্তি ডাক্তারেব? সুকুমারের কথাবার্তা শুনে বিরক্ত হলেন তিনি। সোজা বলে দিলেন, আমার আর করনীয় কিছু নেই মশাই। আমি ডাক্তার। রোগী দেখেছি। সেরে গেছে। কাজ মিটে গেছে। আর আমার কিছু দেখবার নেই। যা খুশী করুন গে। আমি কিছু পারব না।

সুকুমার ক্ষুণ্ণ হল। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল। তবু—তবু—আর কি করা যেতে পারে? ক্ষুধার্ত অসহায় নন্দ। সদ্য রোগমুক্ত দুর্বল, অসহায় ওর মা। ওদের জন্যে কি করতে পারে সে? পথ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। নন্দকে ডেকে বললে, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

কি ?

চাকরী করতে পারবে ? আমার পিওনের চাকরী। আমার হুকুম খাটতে হবে। সে তেমন কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। মাইনে পাবে তার জন্যে।

নন্দ বলে উঠল, হ্যাঁ পারব। আপনি যা বলবেন করতে পারব।

সুকুমার পরদিনই নন্দকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ওর নাম কলোনী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিল।

বন্দীপুর গ্রাম। ছোট্ট এলাকা। ঘটনার বৈচিত্র কম। তাই কোন সামান্যতম ঘটনাও হারিয়ে যাবার নয়। নন্দর পিওন হবার সংবাদও পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। পল্লবিত হয়ে।

"নন্দ চাকরী পেল ? সরকারী চাকরী ? ওই সুকুমারবাবু দিল ? দেবে না ? ঘেন্না পিত্তি আছে ? অন্ধ হয়েছে। রোগ থেকে উঠেছে, বুড়ি, মার বয়েসী—তার কাছেও যেতে ইচ্ছে করে ? বিয়ে থা করলেই পারে ?

তাতেই বা কি ? বিয়ে করলেই কি ও প্রবৃত্তি যায় ? ওরা যে সরকারী লোক। শহর থেকে আসা সরকারী বাবুদের ওসব না হলে মানায় না যে।"

সব মানুষই একদৃষ্টিতে দেখে না কোন কিছুকে। স্বার্থ হাজার দিকে কাজ করে। নন্দর এক কথায় চাকরী হয়ে গেছে। গ্রামের বুকে অমন বেকার আরও অনেক আছে। তাদের মা বাবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে রটাতে আরম্ভ করল—শুনেচ, সুকুমারবাবু নন্দরমাকে মাসীমা বলে ডেকেচে। কি ছেদ্দা ভক্তি করচে। ছেলেটার উঁচু প্রাণ। উনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের ছেলেদেরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কলোনীর অতগুনো লোকের মা-বাপ উনি। অমন লোক হয় না।

এই দুর্যোগের মধ্যেই রামবাবুর মন্দিরের পুরোহিত ছোকরা সুকুমারের সামনের এসে দাঁড়াল।

নন্দকে যেমন চাকরী দিয়েচেন অমনি আমাকেও আপনার একজন পিওন করে নিন।

অসহায়তার মধ্যেও সুকুমার হাসল। অবাক হল। তুমি পিওন হবে? কি দুঃখে? পুরোহিতের সম্মানের চাকরী। ভালমন্দ খাওয়া।

ছাই। সম্মানের মুখে ঝাঁটা। ভাল মন্দ না পিচাশের রক্ত খাওয়া।

ছোকরা কেঁদে ফেলল। বলতে আরম্ভ করল এই ক'বছর কি না করলাম। ওরা মদ মাগী নিয়ে হল্লা করবে সরকারী বাবুদের সঙ্গে। তার রান্না থেকে আরম্ভ করে সব ঝক্কি আমার। আজকাল আবার দুটো মন্দিরের পুজো। তাও না হয় করলাম। কিন্তু ওই ছোটবাবু লখ্‌খন মণ্ডলের ফোঁস ফোঁসানি আর সয় না। কুথায় ছিল এ্যাদ্দিন। কলকাতায় হাসপাতালে নাকি পড়েছিল। এসেই লেগেছে। আমাকে বলে কিনা জুতোয় কালি করে দিতে—।

সুকুমারের কানকে বিশ্বাস হয় না।

পুরোহিত ঘটনাটা বিবৃত করল। মন্দিরে যাচ্ছি দুয়োর খুলতে। উনি হুকুম করলেন—জুতোয় কালি করে দে। বললাম, এখন কাজ আছে। পুজোর কাজ। শুনে রুখে উঠল অমনি। হারামজাদা—বসে বসে ছানা ক্ষীর মারচ আর দুবেলা ঘণ্টা নেড়েই খালাস। খুব মজা নয়? দেখে আয়গে শহর বাজারে, কলকারখানায় আট ঘণ্টা ডিউটি মেরে তবে টাকা উপায় হয়। খাটতে খাটতে মাজার বাঁধান ছিঁড়ে যায়। শালা—

ক্ষুব্ধ ক্লান্ত কণ্ঠস্বর পুবোহিত ছোকরার। কিশোব ব্রাহ্মণপুত্র। সুকুমারের দিকে সকরুণ দৃষ্টি মেলে বললে, সহ্য হয় বলুন? মানুষের সন্তানত। লেখাপড়া শিখতে পাইনি। পেটের খাওয়া জুটত না। তাই বাপের যজমানিটা নিয়েছিলাম। পিতৃপুরুষের কাজ। কিন্তু আর সয় না। এর চেয়ে গতর খাটিয়ে খাওয়া ভাল। ভালবেসে আপন করে —কেউ চাকর করলে তার পা ধুয়া জলও এগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এমন হেনস্তা—তাই আপনার কাছে এসেছি। নন্দর মত আমাকেও যদি নেন—তাহলে এগাঁ থেকেই চলে যাব এবার। যা ভাগ্যে আছে হবে।

অক্ষম সুকুমার নীরবে শুনে গেল শুধু। জবাব দিতে পারল না।

সেইদিন বিকেলেই প্রকিওরমেণ্টের এ্যাসেসর ইন্সপেক্টর তুলসী দত্ত সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বদলি হয়েছেন। চলে যাচ্ছেন গ্রাম ছেড়ে। তিনি সুকুমারকে নমস্কার করে বললেন, ধন্যবাদ, আপনার কথা মনে থাকবে।

সুকুমার একটু আপত্তির ভঙ্গীতে বললে, কেন ?

কেন ? তুলসী দত্ত বললেন, আপনি অনেক করেছেন মশাই। আমরা ত আশাই করিনি। সত্যি বলতে কি আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখিত হয়েছিলাম। কারণ আমরাও এককালে ছাত্র ছিলাম। আদর্শ-বাদও ছিল। তারপর চাকরীর পাকে পড়ে এমন পরিবেশে জড়িয়ে পড়লাম যার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশাই চলে গেল। আপনি তা করলেন না। দেখে তাজ্জব হয়েছিলাম। দুঃসাহস দেখে হেসেছিলাম। পাগলামি বলে মনে হয়েছিল। রাধারমণ দাঁ বলেছিলেন, বেকুবির ফল বুঝবে শিগগির।

কন্তু আমরাই ভুল মশাই। আপনার ক্ষমতা আছে। আমরা হাজার অন্যায় করি, সত্যি কথা। আমাদের বদনামও আছে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী হিসেবে একজনের নাম বলতেত পারব জোর গলায়। গর্ব করতে পারব। তাই আপনাকে নমস্কার।

অভাবনীয় ঘটনা সুকুমারের জীবনে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোর আবির্ভাব বুঝি এরই নাম।

যাবার আগে তুলসী দত্ত কিন্তু সুকুমারের মনে আবার খানিকটা ভাবনা ছড়িয়ে গেলেন। শুনছেনত, রাধারমণদার ভাগ্য ফিরেছে নতুন করে। নন্দর মাকে ছাড়লেন। তারা মুলোর বৌকে পাচ্ছেন। ছেলে পুলে হয়নি। ডাঁটো চেহারা। অল্প বয়স। অপনার জন্যেই হল। নন্দর মাকে সাহায্য করতে গেলেন। তাই।

জেদ, জেদ,। রাম মণ্ডল জমিদার। করিতকর্মা লোক। তাঁর পক্ষে লোকের ভাবনা কিসের ? রাধারমণ ঘোষকে নন্দর মার ঘর থেকে উঠিয়ে আনলেন। উঠে আসুন। অমন ঘর, অমন আশ্রয়, অমন সুখ আবার হবে। রাম মণ্ডল কাপুরুষ নয়। চলে আসুন।

সেই সময়ই তারা নুলোর বৌএর কথা মনে পড়ল রামবাবুর।

তারাপদ ঘোষ। এককালে সুস্থ সবলই ছিল। জমিদারের পেয়াদার কাজ করত। সেই কাজই কাল হল ওর। জমিদারের হয়ে জমির দখল নিতে প্রজার সঙ্গে লড়তে গিয়ে জখম হল। মাজায় লেগেছিল। প্রাণে বাঁচল। কিন্তু অধঃ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেল চিরদিনের মত। দয়ালু জমিদারবাবুরা দোকানে বেচা-কেনার কাজে ওকে বসিয়ে দিলেন। খোরপোষের হিল্লে হল।

ওর বৌএর তখন কৈশোর অবস্থা। তখন কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। বিপদ ঘনাল তার যৌবন এলে। অসহায় তারাপদ। দাবীদার বৌ কোন কথা শুনতে চায় না। তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া। শেষে বৌ যেদিন স্বামীর গায়ে হাত তুলল, সেদিন পাড়াপড়শীরা মধ্যস্থ করল। বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

তারপর গ্রামের মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তাকে। রামবাবুর মনে পড়ল। তাকেই আনতে হবে। লোক পাঠালেন। তাকে আনতেই হবে। যা কবে হ'ক। বকশিস পাবে।

সংবাদ শুনে তারা নুলো ভয় পেল। পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। বৌএর সেই রুদ্রমূর্তি। রামবাবু আশ্বাস দিলেন। কোন ভয় নেই। এবার তোর বৌ ভালই থাকবে। তাছাড়া যাগযজ্ঞ ক'রে ও পঙ্গুত্ব ভাল করে দেওয়া যায়। তার ব্যবস্থা করা হবে।

পাড়াতে, মেয়েমহলেও সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল।

জানিস্‌লো—তারা নুলোর বৌ বলে আসচে।

তাইত শুনচি।

এ্যাদ্দিন পরে কত খিটকেল করে তারপরে আবার ?

তাই হয় লো। জন্মজন্মান্তরের সোয়ামী-স্ত্রীর টান একেই বলে। খোঁড়া হোক, পঙ্গু হোক, অথ্যাম হোক, তবু সোয়ামী। এজন্মে ওর সেবা করলে পর জন্মে ওই নুলো তারাই দেবতা হবে। শিব ঠাকুর হবে। সোয়ামী এমনি জিনিসই রে—।

রামবাবু ভেবে দেখেছিলেন তারা নুলোর বৌকে আনালেই সবদিক

রক্ষা পাবে। সুকুমার জব্দ। নন্দর মার দায় থেকে রেহাই। আর রাধারমণ ঘোষও তুষ্ট হবেন। এই চিন্তা নিয়ে বেশ শান্ত ছিলেন তিনি। হঠাৎ নন্দ সুকুমারের পিওনের চাকরী পাওয়ায় আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। আরও—আরও শয়তানী করতে হবে তাহলে।

কলোনীতে চলে গেলেন রামবাবু। উদ্বাস্তুদের মধ্যে শোনাতে আরম্ভ করলেন, কেন পিওনের চাকরী পাবে ওই পুঁচকে নন্দ? তোমরা রিফিউজী। তোমাদের জন্যেই যে আপিস, কর্মচারী, পিওন, সেখানে কেন তোমাদের বাদ দিয়ে ওকে নেওয়া হোল? এর জবাব চাইতে পার না? এমনি করে মুখ বুজে থাকলে মংবা, সব মরবা।

হাবুল কর্মকারের ওপর ভার পড়েছিল তারা নুলোর বৌকে আনাবার?

অনেকদিন পরে বন্দীপুরে আবার এল তারা নুলোর বৌ। গিয়েছিল যৌবনোন্মেষের কালে। এল ভরা যৌবন। চব্বিশ পঁচিশ বছব বয়স। হাঁপালো চেহারা। নিটোল স্বাস্থ্য। তাকে দেখতে পাড়ার লোকের ভীড় জমে গেল। অনেক কাল পরে চেনা গ্রামে এসেছে সে। চেনা মানুষগুলোকে দেখতে তারও ইচ্ছা করে বৈকী। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরতে আরম্ভ করল তারা নুলোর বৌ।

রামবাবুব মেয়ে খুকুকে সে কখনো দেখেনি। জমিদার বাড়িতে জমিদার বাবুর মেয়েকেও দেখতে এল। একা নয়। তার সঙ্গে পাড়ার আরও কজন বৌ-ঝি রয়েছে।

তারা নুলোর বৌ। রঙীন ছাপা শাড়ী পবেছে একখানা। একটা নকল সিল্কের ব্লাউজ। হাতে কগাছা কাঁচের চুড়ি। কানে নকল সোনার দুল। পায়ে ডগডগে লাল আলতা। দেহ জুড়ে যৌবনের জোয়ারের খেলা। শুধু হাসে—অকারণ—আর কেমন যেন অঙ্গ ভঙ্গী করে।

খুকু জ্বলে উঠল দেখে শুনে। সেত সবই জানে। শুনেছে। ভাগ্যে আগুন লেগেছে ও বৌটার। এখানে পুড়তে এসেছে। আরেক নন্দর মা হতে এসেছে। তার পরত অমনি দশা হবে। তখন পাড়ার এই সব বৌ-ঝিরা কোথায় থাকবে?

খুকু লেখাপড়া শিখেছে। মেয়ে মানুষ খুকু। তার পক্ষে এসব দুঃসহ। তার অভিভাবক, পরিবেশ, গ্রাম সবই এই হাওয়ায় মেতে আছে।

তারা মুলোর বৌ দেখা করতে এসেছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা ডাকল, কই দিদিমণি কুথায়? খুকু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওরা বলল, এইযে গো আমাদের মুলো ঠাকুরপোর বৌ ফিরে এয়েচে।

তারা মুলোর বৌ হেসে তাকাল খুকুর দিকে। তারপর অবাক হয়ে গেল যেন খানিক। তাকিয়ে থেকে বললে, এ দিদির বিয়ে হয়নি এ্যাকুনু?

বৌ-ঝিরা হেসে উঠল। না, না। একি চাষার মরণ? জানিস কত নেকাপড়া জানে? বয়েস না হতেই পরের ঘরে গোবর ঘাঁটতে যাবে নাকি?

তারা মুলোর বৌ আরেকবার খুকুর দিকে তাকাল। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

খুকু সংকুচিতা হয়ে পড়ল। ইচ্ছা ছিল তারা মুলোর বৌকে শাসন করবে। উপদেশ দেবে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে। পারল না। তারা মুলোর বৌএর বিস্ময়ের সামনে তার কুমারী যৌবন নিয়ে আর দাঁড়াতে পারল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল আবার।

ঢুকবেইত ঘরে। বড়লোকের নেকাপড়া জানা মেয়ে যে। ঠ্যাকার হবে না? অমন ব্যাভার? ছিঃ-ছিঃ। বসতে নাই বলল। একটা মুখের কথাও কি ছিল না?

ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ে আগন্তুকরা তারা মুলোর বৌকে নিয়ে রামবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

যাক ওসব ঝামেলা। যত বদ হাওয়া। ভাল লাগে না আর।

খুকু ঘরে ঢুকে কেঁদে ফেলল। কেউ খোঁজ রাখেনা তার। তার অবস্থার কথা কেউ ভাবে না।

সেন্টহেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়নের বন্দী জীবনের কথা, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা, রাশিয়ার সাইবেরিয়ার নির্বাসন দণ্ডের কথা নিয়ে কত লোকে ভাবে। শিউরে ওঠে অমানুষিকতার কথা ভেবে।

কিন্তু এই অখ্যাত গ্রামে যে মেয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে অনিশ্চয়তার মধ্যে, যার চারদিকে ছড়ান বাবার কলংক কথা, অপবাদ, কুৎসা, বংশের দুর্নাম, আর অন্যদিকে তার ব্যক্তি জীবনের নৈরাশ্য—প্রত্যেকটা সন্ধ্যা ঝরে পড়ে এক একটা পাপড়ি ঝরার মত করে।

প্রতিরোধের উপায় নেই। পালাবার পথ নেই। লেখাপড়া জানা মেয়ে মানিয়ে নিতে চাচ্ছে, পারছে না। সে একা, নিঃসঙ্গ ব্যর্থ। তার কথা কে ভাবছে? এই তিল তিল করে মরে যাওয়া কি কম যন্ত্রণা?

তারা স্থলোর বৌ দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলে খুকুকে এই এক ঘেয়ে চিন্তাতেই পেয়ে বসল আবার। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। কোথায় পালাবে? দাদামশাই দিদিমাও নেই। কেউ নেই আর। ভগবান—বাবার কি চোখ ফুটবে না? বাবা কি একবার তার দিকে ফিরে তাকাবেন না?

খুকু ভাবছিল।

বাইরে থেকে ডাক এল, খুকু—

খুকু চমকাল। কাকা?

হ্যাঁ। এল. সি. মণ্ডল উঠোনে দাঁড়িয়ে।

খুকু চোখমুখ মুছে বাইরে বেরিয়ে এল। এল. সি. মণ্ডল প্রশ্ন করলেন, কিরে ভাল আছিসত?

হ্যাঁ। খুকু মাথা নাড়ল।

শরীরটা কেমন দেখচি যেন।

না। খুকু নিজের শরীরের দিকে ভাল করে তাকাল। তারপর কাকাকে প্রশ্ন করল, তুমি কেমন আছ? অসুখ করেছিল শুনলাম?

হ্যাঁ। কলকাতায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়িছিলাম। এখন ঠিক সেরে উঠিনি। দাদার চিঠি পেয়ে চলে এসেচি। ওঃ এইটুকু পথ আসতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। বড্ড খিদে পেয়ে গিয়েচে। তাড়াতাড়ি রান্না চাপা দিকি। ডাক্তারেরও হুকুম, সন্ধ্যে লাগতেই খেয়ে নিয়ে, সকাল সকাল বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করা দরকার।

যাক, তাও যেন নিঃসঙ্গতা একটু কেটেছে ' খুকুর মনে হল। কাকার নির্দেশ মত তখনই রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এল. সি. মণ্ডল খেতে বসে বললেন, জানিস খুকু, আমি ঠিক করেচি এখানকার ব্যবসা তুলে দেব। ঘরের টাকা ঢেলে আবার যদি অপমান সইতে হয় তবে কি দরকার অমন ব্যবসাতে? দাদা চিঠি লিখেছিল, এবার দোকানে হামলা হবার ভয় আছে। বন্ধুরা সে চিঠি দেখে হেসে খুন। আজকাল ব্যবসা করতে গিয়ে আবার ওসব কি? ও ব্যবসা করা কেন? গ্রামে থাকাই বা কেন? তাদের কথা শুনে লজ্জায় মরি। ভেবে দেখলাম, সত্যিই, অপমান সয়ে বেঁচে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে শহরে গিয়ে ব্যবসা খুলব।

খুকু উদ্বুদ্ধ হল। তাই চল কাকা।

খুকুব মনে আশা জেগে উঠল। আবার শহরে যেতে পারবে। আবার সেই জনারণ্য। আধুনিক জীবন যাত্রা। মেলামেশা অনেক মানুষের সঙ্গে। সেই দাদামশায়ের থাকার কালে যেমন হোত।

খুকু বললে, কাকা, বাবাকে বল। বাবা যদি নাও শোনে, তুমি জোর করেই নিয়ে চল সব। এ জায়গায় আর ভাল লাগে না।

এল. সি. মণ্ডল হেসে উঠলেন। দাঁড়া, যাব, যাব। সব হবে। আর যদি না হয়, তোকে শহরে পাঠাবই এবার। দাদার খেয়াল না থাকতে পারে। আমি ভুলি নি। একটা ভাল মত পাত্র দেখেই সব ব্যবস্থা করে ফেলচি। একটু সবুর কর। সুস্থ হতে দে একটু।

কাকার সামনে থেকে খুকু উঠে গেল। আড়ালে, নির্জনে স্বপ্ন দেখতে বড় ভাল লাগে।

রাতে বাড়ি ফিরলেন রামবাবু। সারাদিন কলোনীর মানুষকে শিক্ষা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, তারা স্কুলোর বন্দোবস্ত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন। তবু ভাইকে দেখে খুসী হয়ে উঠলেন।

এসেছিস্? ভাল হয়েছে। নানা ঝামেলা নিয়ে আমি ব্যস্ত। তুই দোকানে বসলে অনেক সুবিধে হবে।

এল. সি. মণ্ডল গম্ভীর স্বরে বললেন, দোকানে বসতে পারব না।

কেন ?

শরীর খারাপ। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেচেন। তাছাড়া তোমার সঙ্গে কথা আছে। ব্যবসা সম্বন্ধে। খেয়ে দেয়ে ঘরে এস, সব বলচি।

রামবাবু খাওয়া দাওয়ার পরে ভাইএর সামনে গিয়ে বসলেন। কি কথা ?

এল. সি. মণ্ডল বললেন, আচ্ছা, তোমার এসব ঝামেলা ভাল লাগে ?

ঝামেলা ? কিসের ?

এই টাকা ঢেলে ব্যবসা কোরে লোকের গালমন্দ খাওয়া ?

রামবাবু অবাক হয়ে ভাইএর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকলেন।

এল. সি. মণ্ডল বললেন, তুমি যে চিঠি দিয়েছিলে সে চিঠি দেখে আমার বন্ধুরা হেসে অস্থির। তারাও ব্যবসাদার। তারা বললে, ওসব মামুলি ব্যবসা আজকাল করতে আছে ? খাদ্য নিয়ে ওসব চুটকি ব্যবসা করে কিছু হয়না অথচ বদনাম। আজ চাষী ক্ষেপবে, কাল সরকারী বাবুরা মনের মত ঘুষ না পেলে গোঁসা করবে।

রামবাবু বললেন, তাহলে কি করতে হবে ?

শহরে চলে যাওয়া অনেক ভাল। এখন শুধু শহর উন্নত হবে। শহরের কারখানায় টাকা ঢাললে তার আর মার নেই। আর জমিদারীত থাকবে না। উঠে যাবে শিগগির। তখন জমিদারদের ওই সব কলকারখানায় মালিকানা নিতেই হবে। এমন কি ফেরীঘাটের ইজারা নেওয়া, রাস্তাঘাট তৈরীর ঠিকেদারী করা, কিংবা কোন জাগ্রত ঠাকুর দেবতার মন্দিরের লীজ নিয়ে বসে থাকাও আমাদের এসব ব্যবসার চেয়ে অনেক লাভের। অনেক শান্তির। হাঙ্গামা হুজ্জুতের ভয় অনেক কম। তাই আমার মনে হয়, চালের ব্যবসা তুলে দিয়ে শহরে যাওয়াই ভাল। সভ্য মানুষ হয়ে বাঁচা যাবে। টাকা উপায়ও হবে।

ভাইএর কথা শুনে রামবাবু খানিক গুম হয়ে থাকলেন। তিনি ধারণাও করতে পারেন নি ভাই এমন কথা বলবে। একটু পরে ক্ষুব্ধ স্বরে তিনি বললেন, বেশ, যা খুশী করতে পার। যখন টাকা তোমার।

এল. সি. মণ্ডল বললেন, না। তুমিও যাবে। আমিও যাব।

রামবাবু রুখে উঠলেন, আমি যাব কেন? ব্যবসা উঠিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যাব আর লোকে হাসবে? বলবে ভয়ে পালাল। সে আমি প্রাণ থাকতে পারব না। তবে তোমার টাকা—

একটু থেমে রামবাবু ব্যথিতস্বরে বললেন, তোর এমন মতি হল কি করে নকা? তোর ব্যবসার কি ক্ষতি হয়েছে? মুনাফা কম হয়েছে? তোকে কি ভাবনা চিন্তা, মেহনত, কিছু করতে হয়েছে?

ব্যাবসা মানেই মুনাফা চাই। মুনাফা যদি ঠিক থাকেত আদার ব্যাপারী আর জাহাজের ব্যবসায় তফাৎ কি? আমার অপরাধের মধ্যে হয়েছে তোমাকে শহর থেকে ডেকে এনেছি—এইত? আমার অপরাধ হয়েছে। তুমি ফিরে যেতে পার। কিন্তু দোহাই—পিতৃপুরুষের মান সম্মান ডুবিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে বলিসনে আমাকে। সে আমি পারব না। আমি তোর দাদা—আমাকে আর ও উপদেশটা দিস্‌নে।

এল. সি. মণ্ডল আর কোন কথা বললেন না। নীরবে ঘর থেকে উঠে গেলেন। দাদার সামনে থেকে। দোকানেও বসলেন না তিনি। ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম নিতে—গ্রামের বিশুদ্ধ হাওয়া বাতাস খেতে বলেছেন। তিনি সেই নির্দেশ পালন করতে লেগে গেলেন।

মন্দিরের পুরোহিত ছোকরা সুকুমারের কাছ থেকে কোন আশ্বাস পায়নি। পরদিনই গ্রাম ছেড়ে, মন্দিরের চাকরী ছেড়ে চলে গেছে। রামবাবু প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এল. সি. মণ্ডল বলেছেন, যার ইচ্ছা চলে যাক। ভাত ছিটোলে কাকের অভাব হয় না। এল. সি. মণ্ডল শহরে ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের কাছে এবার খুব বেশি রকম শুনে এসেছেন, কর্মচারীরা ধর্মঘটই করুক আর হুমকিই দিক—আসলে ওসব কান্নারই রকমফের। পা জড়িয়ে পড়ে থাকবার সুযোগ দিলে আর কেউ মাথা তুলবার চেষ্টাই করবে না।

এল. সি. মণ্ডল তাই মন্দিরের পুরোহিত ছোকরার প্রতি আর কোন অনুকম্পাই দেখালেন না।

পুরোহিত ছোকরা চলে গেল।

রামবাবু কলোনীর ভণ্ডুল চক্রবর্তীকে পুরোহিত নিয়োগ করলেন।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী। মাথায় লম্বা চুল। পিছনে ঘাড়ের দিকটা ক্ষুর দিয়ে গোল ক'রে কামান। চোখ দুটো লাল। কপালের রগের ওপর শিরা দুটো ঠেলে উঠেছে দড়ির মত। বয়স মাঝারি হবে।

এই ভণ্ডুল চক্রবর্তীকে রামবাবু অনেকদিন থেকেই জেনেছেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠও হয়েছে। চক্রবর্তী গাঁজা টানে। আবার তার সমর্থনে বক্তৃতাও দিতে পারে। বলে, একজন মস্ত বড় সন্ন্যাসীর কাছে প্রসাদ পেয়েছি ওটা। সাধন ভজন করতে হলে গঞ্জিকা সেবা আগে দরকার।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী গুণী লোক। হস্তরেখা গণনা, গ্রহ বিচার, যাগযজ্ঞ, হোমহুতাশন,—সব পারে।

সেই সব গুণের জোরেই রামবাবুর প্রিয়পাত্র হতে পেরেছে সে। রামবাবু এইবার তার সেই সব গুণপনাকে কাজে লাগাতে আরম্ভ করলেন। প্রথমেই নির্দেশ দিলেন তারা মুলোর বৌ-এর হস্তরেখা গণনা করতে এবং সন্তান লাভের যোগ সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করতে।

একদিন ভণ্ডুল চক্রবর্তী তারাপদ আর তার স্ত্রীকে পাশাপাশি বসাল। দুজনের হাত পাশাপাশি রেখে গণনা ক'রে, মন্ত্র আউড়ে ঘোষণা করল, সন্তান লাভের যোগ প্রবল। আর স্ত্রীর ভাগ্য জোরেই সে সন্তান লাভের সৌভাগ্য দেখা যাচ্ছে। না হলে ওর নিজের হাতে তেমন কিছু ছিল না।

ভণ্ডুল চক্রবর্তীর গণনা এখানেই শেষ হল না। সে আরও বললে, এ সন্তান লাভ কিন্তু সহজে হবে না। এর জন্যে যজ্ঞ করতে হবে। রাজা দশরথ যেমন করেছিলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। সে যজ্ঞে লাগবে এক পাত্র পবিত্র জল। শিবের মাথার জল। শিবরাত্রে নয় বৎসরের কোন মেয়ে যদি শিব পুজো করে, আর রাত্রির তৃতীয় যামে যদি সে শিব-লিঙ্গের মাথায় গঙ্গাজল দেয়, আর সেই জল দেওয়াই যদি সে যামে সে লিঙ্গের মাথায় প্রথম জল দেওয়া হয়, তাহলে সেই লিঙ্গ চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়া গঙ্গা জল মহৌষধ হয়ে যায়। আমার কাছে সে জল আছে। এই জল যজ্ঞস্পর্শ করিয়ে বন্ধ্যা নারীকে পান করালে তার সন্তান ধারণ

শক্তি জাগ্রত হয়। সে ঋতুমতী হয়। আর পুরুষের পক্ষেও শুক্র-সঞ্জীবনীর কাজ করে।

তারাপদর বৌ উৎসাহিত হ'ল। অক্ষম তারাপদর চোখেও ক্ষীণ আলোর রেখা ফুটে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে একটু আশার আলো।

রামবাবু নির্দেশ দিলেন, যজ্ঞ কর।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী বললে, তার আগে কিছুদিন ওদের দুজনকে নিয়মিত ভাবে শাস্ত্র পাঠ শুনতে হবে। তারাপদর স্ত্রীকেই যজ্ঞ করতে হবে। কাজেই তাকে একা শুনতে হবে আরও অন্যান্য মন্ত্র কথা।

বেশ। তাই হবে। রামবাবু সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারাপদ দম্পতির সামনে ভণ্ডুল চক্রবর্তীর শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ হল। শাস্ত্র অর্থে মহাভারতের অংশ। সেই যেখানে যেখানে—স্বামী অক্ষম বা মৃত হলে অন্য যোগ্য পুরুষ নিয়োগ করা হয়েছে। ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মেছে। সেই সন্তান নির্বিবাদে সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছে। মহাভারত তো ভারতীয় হিন্দুর শাস্ত্র। যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। সেই মহাভারতের কথা অমৃত সমান। যে শোনে সে পুণ্যবান। আব যে মহাভারতের মতে চলে সে মহা মহা পুণ্যবান। পূর্বপুরুষের এবং ঋষিদের আশীর্বাদে তার স্বর্গবাস অনিবার্য।

কে কার খোঁজ রাখে? গ্রামের নিস্তরঙ্গপ্রায় জীবনেও মানুষ ব্যস্ত নিজের কাজে। তাই তারাপদর বৌকে শাস্ত্র পাঠ করে শোনানর ব্যাপার নিয়ে কানাঘুষা হলেও তেমন কিছু দানা বেঁধে ওঠেনি।

কিন্তু যেদিন যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল সেদিন গ্রামজীবন নড়ে উঠল।

অমাবস্যার রাত্রি। অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন পৃথিবী। বন জঙ্গলে ঘেবা বন্দীপুরে সে আঁধার গাঢ়তর।

রামবাবুর ঠাকুরমন্দিরের পিছনে শান্ত শুষ্ক বিল। বিলের এক পাশে সারবাঁধা কয়েকটি তালগাছের পাশে উঁচু ঢিবির মত মাঠ। সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। অগ্নিকুণ্ড। তার চারপাশে ঘিরে বসল কয়েকজন। অরুণ ঘোষ লাঠিহাতে। বেতনভোগী প্রহরী। হাবুল

কর্মকার রামবাবুর প্রতিনিধি। ভণ্ডুল চক্রবর্তী পুরোহিত। আর তার কয়েকজন তন্ত্র, যন্ত্রধারক সঙ্গী।

ভণ্ডুল চক্রবর্তীর সামনে এসে বসল তারাপদর বৌ। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে সিঁদুর। বস্ত্রবাস শিথিল। সমথ যুবতীর নিটোল সুডৌল স্তনদ্বয় অনাবৃত—সিঁদুরের মাখামাখি। কোরা লাল পাড় শাড়ী পরণে। যজ্ঞশেষে সেই পবিত্র জল নিয়ে যাবে সে মাথায় করে। স্বামীকে পান করাবে। স্ত্রীর ব্রতপালন করবে।

সেই যজ্ঞ হচ্ছে। যজ্ঞ।

সংবাদটা প্রচারিত হতে দেরী হল না। ঝাড়, ফুঁক, জল পড়া, তুকতাক করা দেখেছে অনেকে। কিন্তু সাক্ষাৎ যজ্ঞ কেউ দেখেনি। গ্রামের লোক ছুটতে আরম্ভ করল। যোগ্ন হচ্ছে। যোগ্ন।

ভণ্ডুল চক্রবর্তি মহাব্যস্ত। কোসাকুসি, পঞ্চপাত্রাদি সাজিয়ে যজ্ঞ সুরু করে দিয়েছে। ঘৃতাহুতির পরিবর্তে কেরোসিন তেল ঢেলে দিচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে। সমানে বলছে—ওঁ—স্বাহা—ওঁ—স্বাহা—

দর্শকেরা দেখতে দেখতে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল। সত্যি—যজ্ঞ হচ্ছে—যজ্ঞ। জাগ্রত।

পুরোদমে যজ্ঞ চলছিল। হঠাৎ ভীড় ঠেলে উপেন শিকদার সামনে এসে দাঁড়াল। জনতাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল, গাঁয়ের মানুষ তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ এসব ? ঘরের বৌকে বে-আব্রু করে বেলেল্লাপনা করছে আর তোমরা দেখছ ?

দর্শকরা একটু চঞ্চল হল। তারাপদর বৌএর মনে লজ্জা নামল। যজ্ঞের দিকে পিছন ফিরে বস্ত্রবাসকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে লাগল।

বেগতিক অবস্থা। হাবুল কর্মকার উঠে দাঁড়াল অবস্থা বুঝে। উপেন শিকদারের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি কি বলছ উপেনদা ?

উপেন শিকদার বললে, এসব কি হচ্ছে ?

যোগ্ন।

যোগ্ন ?

হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ না? চোখ নেই?

হ্যাঁ। চোখ মন সব আছে। অমন বেহায়াত হইনি।

তার মানে?

মানে দেখাচ্ছি কলোনী অফিসারকে ডেকে এনে। কলোনীর লোক ক্যামন যোগ্য করছে দেখুক।

হাবুল কর্মকার হেসে উঠল। ভয় দেখাচ্ছ উপেনদা? যাও। যাও। সরে দাঁড়াও। যোগ্য করতে দাও। বাধা দিও না। জানত—রাখ্‌খসেরা যোগ্য নষ্ট করত বলেই শ্রীরামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করেছিলেন। তাই শ্রীরামচন্দ্র বীর। তাইত আমরা রামরাজ্য চাই। গান্ধীজী বলেছেন, রামরাজ্য চাই। এ রাজ্য গান্ধীজীর রাজ্য।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী উঠে দাঁড়াল। আপনি হিন্দু হয়ে হিন্দুর ধর্মে বাধা দিতে এসেছেন? হোম যোগ্য যা হিন্দুদের পুজো—তাতেই বাধা?

হাবুল কর্মকার উপেক্ষার ভঙ্গীতে বললে, নাও, নাও ঠাকুর, তোমার কাজ কর। তোমার যগ্য বন্ধ রেখ না। অকল্যাণ হবে। তারাপদর বৌকে বললে, বস। আসন নাও।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী অগ্নিকুণ্ডে খানিকটা কেরোসিন তেল ঢেলে দিতেই লেলিহান শিখা উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠল। অমনি চক্রবর্তী আরম্ভ করে দিল —ওঁ—স্বাহা—অগ্নে—স্বাহা—।

যজ্ঞ। হিন্দু ধর্ম। ধর্মভীরু দর্শকরা শান্ত হয়ে গেল। উপেন শিকদার সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

উপেন শিকদার অপমান উত্তেজনা নিয়ে সুকুমারের কাছে ছুটে এল। কিন্তু সুকুমার আর গ্রামের কোন কাজে যেতে রাজী নয়। সে বললে, উপেনদা আপনারাইত গ্রামের কাজে মাথা গলাতে নিষেধ করেছেন।

উপেন শিকদার বললে, গ্রামত নয়। কলোনীর মানুষ ওই ভণ্ডুল চক্রবর্তী।

সুকুমার বললে, না। লোন নিয়ে ঘর তুলছে। এখন ওরা এখানকার মানুষ। স্বাধীন। সাবালক।

সুকুমার গেল না। উপেন শিকদার ভূপালবাবুকে ধরল। তিনিও যজ্ঞস্থলে যেতে অস্বীকার করলেন। উপেন শিকদার বেরিয়ে গেল। গ্রামের কিছু পাণ্ডা জুটিয়ে আবার ভূপালবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রতিকার একটা করতেই হবে। অন্ততঃ তারাপদকে শাসন করা দরকার। ওকে ধমক দিতে হবে। ভূপালবাবুকে ওরা জোর করেই ধরে নিয়ে গেল।

তারাপদ ঘোষ তখন আটচালার বাইরের বারান্দায় বসে। একা। সামনে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। সে প্রতীক্ষা করছে। বৌ যজ্ঞশেষে পবিত্র জল নিয়ে আসবে। সে পান করবে।

উপেন শিকদার আর ভূপালবাবুকে সদলে দেখে সে চমকে উঠল। ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল। খুদে চোখ দুটো ভয়ে কাতর হয়ে উঠল। উপেন শিকদার সামনে গিয়ে বললে, তারাপদ একটা কথা আছে।

আমার সঙ্গে? তারাপদ একটু কুঁজো হয়ে পড়ল।

হ্যাঁ। কি আরম্ভ করেছ গাঁয়ের বুকে? অখ্যাম মানুষ একবার অনেক কষ্টে বৌ বাপেরবাড়ি পাঠালে। আবার আনলে কি সাহসে?

আমি আনিনি।

তবে?

নিজে এয়েচে।

এ্যাদ্দিন পরে?

পিছন থেকে একজন বললে, সব জেনে শুনে নুলো হয়েও ছেলে পাওয়ার সাধ?

আরেকজন বললে, গুরুর দিব্যি করে বল দিকি তোমার ইচ্ছে কি?

তারাপদ বিপন্ন। কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নেই তার। সুযোগ পেয়ে আরেকজন আগন্তুক আস্ফালন করে উঠল, ক্যানে তুমার বৌ যায় ওখানে যোগ্ন করতে? ক্যানে?

প্রশ্নকারীর কথা আর শেষ হল না সবাই চমকে উঠল। তারাপদর বাড়ির ভিতর থেকে তীব্র, তীক্ষ্ণ, কর্কশ অমার্জিত নারীকণ্ঠ বেজে উঠল, কে? কে ওরা? কারা গো বাড়ি বয়ে দরদ দেখাতে এয়েচে?

পরিবেশ পাল্টে গেল সহসা। তারাপদর বৌ তারাপদর ভূমিকা নিয়েছে। প্রতি আক্রমণে, সকলকে পর্যুদস্ত করে তুলল। মিনসেদের হায়া নেই, লজ্জা নেই। তাদের ঘরের মাগছেলে নেই? মাগেরা বিয়োয় না? বিয়েন না হলে মানত করে না? ঠাকুর তলায় ঢেলা বাঁধে না? মাগের কাছে যা সব। মিনসেরা পরের মাগের গন্দ শুঁকতে এয়েচে ক্যানে? মিষ্টি নাগে?

ভূপালবাবু হতভম্ব। উপেন শিকদার এক নতুন উত্তেজনা নিয়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে আবার এগিয়ে যাবার উপক্রম করছিল তারাপদর দিকে।

বাড়ির ভিতর থেকে ডাক্তারখানার পিওন বুড়ো অহিপদ বেরিয়ে এল। হরিবোল—হরিবোল। তুমাদের মরণ নেই? ছিঃ ছিঃ। ঘেন্না। এখনও ডেঁড়িয়ে ডেঁড়িয়ে ওইসব খেউড় শুনচ? ওইসব খিটকেল? মরুগ্গা যার মরণ পাকা উঠেচে—

অহিপদ রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। অমনি তার গতিতে গতি পেয়ে গেল যেন সমস্ত আগন্তুক দলটা।

রাস্তায় নেমে ভূপালবাবু অহিপদকে চেপে ধরলেন, হাগো পিসে—তোমাদের বাড়িতে শালা—শালার বৌএর ওসব কি কাণ্ড?

অহিপদ ঘুরে দাঁড়াল। তার হাতের লণ্ঠনের আলোয় তার মুখের বার্ধক্যজনিত ভাঁজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললে, তুমরাত ন্যাকাপড়া জানা নোক। বুঝমান। ত্যাবে?

অহিপদর রাতে ডাক্তারখানা পাহারা দেওয়া কাজ। ডাক্তারের কাছে গিয়ে চাবি নেয়। তারপর শুতে যায়। বাড়িতে ওই সব নানান ঝামেলার দরুণ সেদিন পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল।

ডাক্তারের মনে শান্তি নেই। ব্যর্থতার জ্বালা বুকে। তার ওপর অহিপদর দেরী দেখে শেষ পর্যন্ত একটা সিগ্রেট ধরিয়েছেন। অশান্ত মন নিয়ে বারান্দায় পায়চারী আরম্ভ করেছিলেন। অহিপদ এসে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, এত দেরী হ'ল?

হ্যাঁ। এগিয়ে আসতে আসতে অহিপদ আরম্ভ করল, ছিঃ ছিঃ—কি নজ্জা, কি ঘেন্না।

বারান্দার ওপর লণ্ঠন আর লাঠি নামিয়ে অহিপদ বসল। ডাক্তার ওর মন্তব্যের অর্থ বুঝলেন না। দাঁড়িয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর কিছু রূঢ়স্বরে বললেন, কি, হ'ল কি?

সে আর শুনবেন না হুজুর। চাষা ঘরের ছোটনোকদের কথা। সে সব খিটকেল। ভদ্দরনোকদের শুনতে নেই। কানে আঙুল দেবা ত্যাখন?

ডাক্তার কৌতূহলী হলেন। কি হয়েছে, বলত?

অহিপদ বললে, এরমধ্যেই বৌডা ধামাধরা আদাঅমন বাবুর সেবাযত্নের কাজে নেগেচে।

কার বৌ?

ওই আমার স্থমুন্দির—তারা মুলোর বৌ। বাপের বাড়ি থেকে এনিয়েচে ওই আমবাবু—ওই জন্যেই।

ডাক্তার হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অহিপদর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললেন, রুইপদ—ও তোমার আত্মীয় নয়? তবে? বলতে লজ্জা করছে না? গলায়ত তিনকণ্ঠী তুলসীমালা দিয়ে বসে বসে হরিবোল হরিবোল কর। মোক্ষ চাও। রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে মোক্ষ নিতে পার না?

ডাক্তারের কথা শুনে অহিপদর চোখ দুটো পিট পিট করল বারকয়। মুখখানা কেমন শক্ত হয়ে উঠল। তারপরেই সে বললে, হুজুর—তাই যদি পারতাম—একটু থেমে বললে, এখনত তাও পারলাম না। কেন্তুক—

কিন্তু? এরমধ্যে আবার কিন্তু কি আছে হে? ডাক্তার আঘাত দিলেন, তোমার স্বার্থে আঘাত লাগলে, অপমানিত হলে বাধা দেবে। পাঁচজনকে বলবে। এতে আবার কিন্তু কিসের?

অহিপদ অধীর ভাবে মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর চোখে মুখে ভয়ার্ত ভাব নিয়ে বললে, তাও পারিনি হুজুর।

কি পারনি?

এই আমার নিজের বেলায়।

নিজের বেলা মানে ?

অহিপদ এবার আবেগে বলে উঠল, হুজুর, ওই তারাপদরই বুন—মানে আমার ঘর—সুমখ বয়েস। গর্ভবতী। বিকেল বেলা ওই মণ্ডলদের পুকুরে গা ধুতে গেল। ত্যাখন ওই আমবাবুর বাবার আমল। উনাদের অবস্থা আরও ভাল। হাঁকডাকে তিভুবন কাঁপে। পুকুর বাড়ি আরও জবরদস্ত করে ঘেরা। তার মধ্যে কি যে হোল—জ্ঞানে আর সে ফিরল না। যখন পুকুর ঘাট থেকে নিয়ে এলাম তুলে, ত্যাখন জ্ঞান নেই। গব্বও নেই। শুধু খুন খারাপী।

নোকজন আমাকে নানারকম বুদ্ধি দিতে নাগল। কদিন পরে জমিদার বাবু আমাকে ডেকে চুপি চুপি বলল, রুইপদ, এইনে তোকে পাঁচকুড়ি ট্যাকা আর ওই বিলের ধারের চাঁদি নাখরাজ ধানি জমি দিচ্ছি বিঘে দশ। বুঝতে পারিনি গব্ব ছিল। তুই মনে কিছু করিসনে।

অহিপদ থামতেই ডাক্তার হুংকার দিয়ে উঠলেন। তুমি নিলে ?

না, না। আমি নিইনি। আমি পেলিয়ে গিয়েলাম গাঁ ছেড়ে। ত্থাশ ছেড়ে। এ রাজ্যি ছেড়ে অনেকদিন ছ্যালাম না গো এ মাটিতে। —অহিপদর অনেক দিনের পুঞ্জীত শোক, মনের মধ্যে গুমড়ান বেদনার বাঁধ যেন আজ ভেঙে গেল। লোল চর্মসার বৃদ্ধ হাহাকার করে উঠল।

ডাক্তার স্তব্ধ। তাঁর চোখের সামনে যেন নতুন জগৎ খুলে গেল। অহিপদ কাঁদছে। অহিপদ হাহাকার করছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মতই। সেই অহিপদ—যাকে যন্ত্রমাত্র মনে হয়েছে এতকাল। কালো, লোল চর্মসার,—উত্থানে পতনে নির্বিকার, আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র—অহিপদ।

অহিপদর চোখ দুটো জ্বলে উঠল আবার। বললে, এ রাখ্‌খুসে মাটিতে কারো নিস্তার নেই ডাক্তারবাবু। আমাদের জাত জ্ঞাতের ছেলে অরুণ। তারও হয়েচে একদশা। ছোট জমিদার নকাবাবুর নজর নেগেচে ওর ঘরে। অরুণত প্যাটের ভাত করে ওদের দুয়োরেই খেটে। অথচ—তাই বুললাম সেদিন, বৌকে বাপের বাড়ি পেটিয়ে দাও। চলে যাক দুলুবপুরে। সেখানে আর যেতে সাহস পাবে না নকাবাবু। সে

কাল আর নেই। বৌর বাপত খানসামা নয়। নকাবাবু বুললে বুলো, বাপ নিয়ে গিয়েচে। এ্যাখন রাখবে বুলেচে। শ্যাযকালে ও তাই করেচে।

মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে সিগ্রেটের ধোঁয়ার মিশ্রিত রহস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের মনে হতে লাগল, যেন আজকের এই অন্ধকার রাত্রে অহিপদ সেই চিরকালের গল্প বলা ঠাকুরদা। তাঁকে রূপকথা শোনাতে দৈত্যরাজ্যের বিভীষিকার মধ্যে নিয়ে গেছে। তারপর সেখান থেকে পরিত্রাণের কাহিনী সুরু করছে আবার।

ডাক্তার জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি আরম্ভ করলেন। যেন তিনি চিরকালের মানবশিশু হয়ে গেছেন—যার মধ্যে আছে সর্বদা অগ্রগতির সুযোগসন্ধানী সেই বীর সত্তা, যে দৈত্য রাজ্য জয় করে। বিপন্ন রাজকুমারীকে জীবনসঙ্গিনী করে পরিপূর্ণতা চায়।

চিন্তার আর উত্তেজনার ভিতর দিয়ে সময় কাটছিল। হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হতেই ডাক্তার সচকিত হলেন। কে ?

অহিপদ দরজা খুলে দিতেই কয়েকজন লোক বাড়ির ভিতর এসে ঢুকল। হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে।

ডাক্তারবাবুকে একবার ঊষা গেরামে যেতে হবে।

ক্যানে ? অহিপদ প্রশ্ন করল।

একটা ছোট্ট ছেলের বড্ডা ব্যামো হয়েচে। দেখতে যেতে হবে।

অহিপদ মাথা নাড়ল। হবে না। উনি রাতে কুতাও যায় না।

আগন্তুকরা বললে, আজ যেতেই হবে। বিধবার কোলমুচা একমাত্তর ছেলে। বড্ডা কাতর হয়েচে। তার ছেলেডার—

তবু অহিপদ মাথা নাড়ল। সে জানে এমন ডাক অনেক আসে। ডাক্তারবাবু কোথাও যায় না।

অহিপদ দৃঢ়স্বরেই বললে, তার্ত বুঝলাম। কেন্তুক ডাক্তারবাবুত যাবে না গো। তুমরা ছোট ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাও।

ডাক্তার বারন্দায় দাঁড়িয়ে। তাঁর মনে তখনো অহিপদর কাহিনী। এই গ্রামাঞ্চলের মানব আর দানবের বোঝাপড়ার ইতিহাস এখন তাঁকে

বিহ্বল করে রেখেছে। অহিপদর শেষ কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছল —ডাক্তারবাবুত যাবে না। তোমরা ছোটডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাও।

ডাক্তার বাধা দিলেন অমনি। না। আমিই যাব। দাঁড়াও।

অহিপদ, অবুঝের মত, ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়ল।

ডাক্তার ঘরে গিয়ে পোষাক পাল্টালেন। বর্ষাকাল। কাদারাস্তা। গামবুট, প্যাণ্ট সার্ট আর বর্ষাতি নিলেন।

তিনকাল পেরিয়ে চারকালের কোঠায় এসে অহিপদ পদার্পণ করেছে। রূঢ় বাস্তবই এখন তার কাছে সত্য। আর সব মায়া। সব ছায়া। বাইরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের বললে, ডাক্তার বাবুর মনডা এখন ভাল আছে। তাই তুমাদের আশা মিটলো। কেন্তুক ডবল ভিজিট দিও। রাতে গেলে চার ট্যাকা লাগে জানত? হ্যাঁ। দিও কেন্তুক।

পোষাক পরে ডাক্তার আগন্তুকদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। অহিপদ ডাক্তারের বাড়ির উঠোনে একলা দাঁড়িয়ে থাকল খানিক। তারপর দরজা বন্ধ কবে ডাক্তারখানার দিকে যেতে যেতে তার উদাসীন কণ্ঠে গান ধবল :

পতিত পাবন দীনবন্ধু
দয়াসিন্ধু হে তুমি যদি
পার করগো প্রেমের ঠাকুর
পার করে দাও ভবনদী।

ডাক্তার গিয়ে দেখলেন রোগী মুমূর্ষু। একটি ছোট্ট বালক। কলেরায় আক্রান্ত। প্রায় শেষ অবস্থা। তবু একবার চেষ্টা করা যেত যদি স্যালাইন সিলিণ্ডার সঙ্গে থাকত। রোগের কথা কেউ বলেনি তাঁকে। তিনিও ব্যস্ততার মধ্যে অত খেয়াল করেন নি। নিরুপায় নিরস্ত্র ডাক্তার। তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে, যারা তাঁকে ডেকে এনেছে, তাদের হাতে দিলেন। শিগ্‌গির ছোট ডাক্তারবাবুর কাছে যাও। যন্ত্রপাতি দেবে। নিয়ে এস। শিগ্‌গির।

ওরা আবার ছুটল।

ডাক্তার রোগীর পাশে এগিয়ে গেলেন। ঘরের এককোণে ছেলেটির

মা দাঁড়িয়েছিল। দরিদ্র। বিধবা তরুণী। তার একমাত্র ছেলে রোগশয্যায়। ডাক্তার রোগীর পাশে যেতেই সে কাছে ছুটে এল, ডুকরে উঠল, আমার পাঁচুর কি হবে ?

ডাক্তার রোগী দেখছিলেন। দেখা শেষ হতেই সে আবার কাতরে উঠল, ডাক্তারবাবু, আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। হাত পা কাঁপছে। ওগো, তুমিত ওগ বালাইএর দেবতা। মরণ বাঁচন সব জানতি পার। তুমি বুলে দাও আমার পাঁচুর কি হবে ?

পাঁচুর কি হবে ডাক্তার জানছিলেন ঠিকই। কিন্তু তা বলা যায় না। তিনি ওষুধের একটা শিশি বার করে রোগীর মুখে ঢেলে দেবার উপক্রম করতেই ছেলের মাথার কাছে পাঁচুর মা ছুটে এল। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠল, আল্লা—আল্লা—এ ওষুদ তুমার দোয়া হোক।

রোগী ছোট্ট ছেলে। অপরিণত বালক শিশু। তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। যন্ত্রণা বাড়ছে। পাঁচুর মা এসে ডাক্তারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। ওগো, তুমি আমার বাপ। তুমি ভদ্দর নোক। নেকাপড়া জান। বিদ্যেওলা। তুমি ফাঁকি দেবা না।

ডাক্তারের হাত চেপে ধরল। এস, আমার পাঁচুর গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। মাথায় হাত দাও। ওর ওগ বালাই সেরিয়ে দাও। এস। আমার পাঁচুকে ভাল করে দাও। তুমি যা চাইবা তাই দেব। ডাক্তারবাবু—আমার পাঁচু তুমার চাকর হয়ে থাকবে। আমি তুমার বাড়িতে বাঁদী হয়ে থাকব।

রোগীর যন্ত্রণা। অসহায় নারীর আর্ত্তনাদ। এর মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

ওরা ছুটেই গিয়েছিল। ছুটেই এল। ডাক্তার ব্যাকুল ভাবে বললেন, এনেছ ?

না।

কি হোল।

তিনি খুঁজে পেলেন না।

সেকী ! ডাক্তার অসহায়ের মত ভঙ্গী করলেন।

পাঁচুর মা বুঝি বুঝতে পারল না। ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল। ডাক্তার সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন। আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি।

তারপরেই ঘর থেকে তিনি নেমে এলেন। পালিয়ে এলেন। পাঁচুর মার বুক ফাটা কান্না তখন নিশুতি রাত্রিকে ভয়াল করে তুলছে।

এ ছাড়া আর কি করণীয় ছিল ডাক্তারের? অক্ষমকে ক্ষমতার বোঝা চাপালে এই হয়। সে নুয়ে পড়ে। পলাতক হয়। ডাক্তারের পালিয়ে এসেও মনে স্বস্তি আসে না। পাঁচুর মার সেই কান্না কানে বাজে। চোখে ভেসে ওঠে পাঁচুর সেই অসহায় মূর্তি। তিনি ডাক্তার। দেহকে যন্ত্র বা পরিপূর্ণ কারখানা হিসেবেই দেখে এসেছেন এতকাল। আজ সে দেহযন্ত্রের ভিতর যেন জীবন মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বুঝি মানুষের ওই জীবন মহিমাই মনুষ্যত্ব। তাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। মনুষ্যত্ব যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে গেছে হয়ত এতক্ষণ।

পাঁচু মারা গেছে হয়ত। ডাক্তার পালিয়ে এলেন। কিন্তু সারা রাত আর চোখে ঘুম এল না।

* *

সকালবেলা। ডাক্তার ডিসপেনসারীতে গিয়ে হরিমোহন দাঁকে প্রশ্ন করলেন, স্যালাইনের সরঞ্জামগুলো নেই?

হরিমোহন দাঁ বিরক্তি নিয়ে বললেন, থাকলেত দিতাম।

তাহলে গেল কোথায় সেগুলো?

আমি কি জানি?

কে জানবে? ডাক্তার বললেন, আলমারির চাবি আমাদের দুজনের কাছে থাকে। দুজনেই যদি না জানি—।

হরিমোহন দাঁ ক্ষেপে উঠলেন। কি বলতে চান আপনি? আমি চুরি করেছি? কি দায়? কি দরকার আমার ওসব জিনেশের? কলেরা কি গ্রামে নতুন হচ্ছে যে আমাদের কাজে লাগবে? কলেরার এপিডেমিক বছরান্তেই হয়ে থাকে। এ সময় বিলে পাট পচায়। পচা জল খেয়ে অমন অনেকেই মরে। অল্প অল্প হলেই ওষুধে বাঁচে। না

হলে স্যালাইন দেবার লোক নেই এখানে। তাহলে কার জন্যে চুরি করব? আমি চোর? রাগে গজ গজ করতে করতে হরিমোহন দাঁ পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কথায় কথা ওঠে। নতুন কথাও মেলে। ঝগড়া করতে গিয়ে ডাক্তার শুনলেন, বিলে পাট পচায়। জল পচে। পচা জল খেয়ে মানুষ মরে। বছর বছরই। স্যালাইনের লোক নেই এখানে।

ডাক্তারের চোখের সামনে গতকালের মুমূর্ষু পাঁচুর মুখখানা ভেসে উঠল। তার মার অসহায় আর্তনাদ কানে বাজল যেন।

ডিসপেনসারী থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? খ্যাপা, খ্যাপা। খেপে গেছে একেবারে। জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে হরিমোহন দাঁ হেসে উঠলেন। মুখ বিকৃত করে আপন মনেই বলে উঠলেন, বাবা—ঘোড়া রোগ। হেঁ-হেঁ—কর পেরেম। কর রসকলি—বুকের ঘাএর জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মর। হু'-হু'—বাবা—

ডাক্তার অদৃশ্য হতেই হরিমোহন দাঁও কলোনীতে ছুটলেন। শ্রীমন্ত আইচের সঙ্গে মিলে ডিস্‌পেন্‌সারী খুলেছেন। সেখানে স্যালাইনের সরঞ্জাম—আরও ওষুধপত্র আছে। সবই ডাক্তারখানা থেকে নেওয়া। সেগুলো সাবধানে রাখা দরকার এখন।

ডাক্তার কোনদিন বিলের ধারে আসবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ব্যর্থ জীবনে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যেই গ্রামে এসেছিলেন। আজ বিলের সামনে এসে দেখলেন, জলে পাট পচছে। জল পচছে। ঝাঁপড়া ধরেছে। লাল হয়ে উঠেছে জল। কুচো চিংড়ীগুলো মরে লাল হয়ে উঠেছে ডাঙার কাছে কাছে। এই জল ব্যবহার করছে মানুষ। বছর বছরই এমনি হয়। সকলেই মেনে নেয়। গা সওয়া হয়ে গেছে।

ডাক্তারের অবাক লাগল। একি মানুষের রাজ্য? একি নরক?

ডাক্তার ভুপালবাবুর বৈঠকখানায় ছুটে এলেন। সুকুমারের কাছে।

ডাক্তারের এমন অস্বাভাবিক আচরণে সুকুমারও অবাক হ'ল।

ডাক্তার বললেন, কি কলোনী গড়ছেন আপনি?

সুকুমার আরও অবাক হয়ে বললে, কেন?

কলোনীতে মানুষ বাস করতে, সংসার পাততে এসেছে। কিন্তু তার আগেই যদি খতম হয়ে যায় ত কি হবে? বিলের ওপর কলোনী। বিলের জল ব্যবহার করছে। বিলের জলটা দেখেছেন? পাট পচিয়ে সব কেমন করেছে? ওই খেয়েইত সব মরবে। আপনি কলোনীর কর্তৃপক্ষ হিসাবে পাট পচানর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলুন।

সুকুমার বিপন্ন বোধ করল। আপত্তি তোলার অর্থই—বাদ বিসম্বাদ। ওই রামবাবুর দলের সঙ্গে। যাদের পাট আছে। জমি আছে তাদের সঙ্গে। আর ইচ্ছে হয় না। লোন মিলেছে। ঘর বাড়ি তুলছে সবাই। এখন ওদের অন্যদিকে মতি ঘুরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। ভাঙনের নেশা বড় মারাত্মক। সংক্রামক।

সুকুমার ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারল না। খানিক নীরব থেকে বললে, দেখুন, চাকরী করি। এখন ওসব করতে গেলেই রাজনীতির অভিযোগ উঠবে। কাজেই আর—

ডাক্তার আর বসলেন না। একটু ঘৃণার ভঙ্গী নিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর স্থির থাকার উপায় নেই। পাঁচুর মার আর্তনাদ, পাঁচুর মৃত্যুযন্ত্রণা —তার মধ্যে তিনি অসহায় ডাক্তার। তিনটি মানুষেরই কি অসহায় অবস্থা। অনন্ত শক্তির অধিকারী মানুষের সব শক্তি বুদ্ধি কি শোচনীয় ভাবে পরাভব মেনেছিল সেদিন। সেদিনের সেই দৃশ্য যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বন্দী করেছে।

ডাক্তার দুর্লভপুরে ছুটে এলেন। জ্যোৎস্নাময়ীর বাড়িতে।

নিবারণ বিশ্বাস এসে প্রথমে দেখা দিলেন। কে? কি চাই?

ডাক্তার আত্মপরিচয় দিলেন। বৃদ্ধ নিবারণ বিশ্বাসের বাদামী চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

আপনি ডাক্তারবাবু? নমস্কার। আসুন, আসুন।

না বসব না আর। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য এত দিনে হোল। জ্যোৎস্নাময়ীর কাছে আপনার নাম অনেক শুনেছি।

নিবারণ বিশ্বাস বৈঠকখানা ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারও অনুসরণ করছিলেন কি এক আশায়। নিবারণ বিশ্বাস বললেন, জ্যোচ্ছনাও আপনার নাম করত। বলেছিল আপনাকে নিয়ে আসবে একদিন এখানে। কিন্তু তার আগেই কলকাতায় চলে গেল। বিলেত যাবার সব জোগাড় করতে হবে।

ডাক্তারের চলার গতি থেমে গেল অমনি। জ্যোৎস্নাময়ী এখানে নেই। কলকাতায় পালিয়েছে। পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। ডাক্তার থমকে গিয়ে বললেন, থাক আর বসব না। অন্য একদিন আসব। গোবিন্দবাবু কোথায় তাঁর সঙ্গে একটু কাজ আছে।

মুহূর্তে রূপ পাল্টে গেল নিবারণ বিশ্বাসের। বললেন, কি জানি ওর খবর বলতে পারব না। ও আমার হাতের বাইরে। কুলাঙ্গার।

ডাক্তার অবাক। নিবারণ বিশ্বাস কথা শেষ করেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

ইদ্রিস মণ্ডলের ঘরে গোবিন্দলালকে পেলেন ডাক্তার। একদল লোক নিয়ে সেখানে জটলা করছিল। ডাক্তারকে দেখে গোবিন্দলাল একটু অবাকই হল।

ডাক্তার কোন ভনিতা না ক'রে তাঁর বক্তব্য জানালেন। গ্রামের অবস্থাও বুঝিয়ে বললেন।

গোবিন্দলালও স্বীকার করল। হ্যাঁ, গতকাল পাঁচু মরেচে। ও আমাদেরই দলে ছিল। যাত্রাদলে আর পার্টির স্কোয়াডে গান গাইত। বড় হলে নামজাদা হতে পারত।

ডাক্তার বললেন, এমনি করে বছর বছর কি হারাচ্ছেন দেখুন। অথচ কোন প্রতিবাদ নেই। প্রতিকারের চেষ্টা নেই। আপনারা ওসব দল গড়েই বা কি করছেন? যদি মানুষের দরকারের সময় না লাগেন?

এর মধ্যে কথা আছে। গোবিন্দলাল যুক্তির অবতারণা করল।

এসব গ্রামে আন্দোলন গড়ে তোলা হঠাৎ সম্ভব নয়। দীর্ঘ দিন ধরে মার খেয়ে খেয়ে মাজা পড়ে গেছে এদের। এখন এরা ভাবে এই ওদের প্রাপ্য। যে যত অত্যাচার চালাতে পারে সেই তত গুণী

প্রতিভাধর ব'লে নাম পায় ওদের কাছে। ঘটি-বাটি বেচে চাল কিনচে জমিদারের দোকানে। তবু দেশের শান্তি-ভঙ্গ করতে রাজী নয় অন্যায়ের শোষণের প্রতিবাদ করে। তার উপর আছে ধর্মের বাঁধন। ধর্মের মোড়লরা আছেন। যেমন আমার ঠাকুদ্দা আছেন।

ডাক্তার বললেন, এটা কি বিপ্লবী কর্মীর মত কথা হল? এদের জাগাতে হবেত।

গোবিন্দলাল বললে, জাগবে। দেরী হবে। তার আগে কলোনীর মানুষ নিয়ে কাজ করা ভাল। ওরা বিদেশী। গ্রামের জমিদার মোড়লের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক নেই। তাছাড়া অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেচে। ওরা আন্দোলন করতে পারে এক্ষুনি। এদিগরের মানুষের ভয় ডর দুর্বলতার নাড়িতে মোচড় দিয়ে দিতে পারে। তখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। এখন যে লোক আছে তা দিয়ে এসব করা যাবে না।

গোবিন্দলাল পরোক্ষভাবে আন্দোলন করতে অস্বীকার করলেও, যুক্তিটা মন্দ দেয় নি। ডাক্তারের বেশ মনে ধরল। চৈত্রের শীর্ণা স্রোতস্বতীকে পুনর্জীবিতা করে বন্যার প্লাবন। বাইরে থেকে ছুটে আসা জলস্রোত। সেই নদীর দুপাড়ে আগামী দিনের নতুন ফসলের সমৃদ্ধ সম্ভাবনা আনে।

ডাক্তার বন্দীপুরে ফিরে এলেন। কলোনীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কলোনীর মানুষ লোন পেয়েছে। ঘর তুলছে। বাসিন্দা হয়েছে গ্রামের। কিন্তু মনে শান্তি নেই কারো। অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে শুধু সেই ছড়ায়:

ঘরের বৌ বিকিকিনি
টাকা বাজায় রিনিঝিনি,
কুললক্ষ্মী কেঁদে মরে
ভাতার সোহাগী।

এই ছড়া, এই সুর, এই কটাক্ষ কলোনীর আকাশে বাতাসে। মানুষের মুখে মুখে, মনে মনে। এই নিয়ে দল ভাঙাভাঙি।

রামবাবুর দল থেকে ভেঙে ভেঙে বেরিয়ে আসছে সবাই। কেন নবীন জীবনরা বেশি টাকা পাবে? দেশে মান সম্মান থাকছিল না বলেইত পালিয়ে আসা। এখানে এসে কটা টাকার জন্যে ঘরের বৌ বিকিয়ে দেওয়া? ছিঃ। ঘেন্না। কলোনীর দুর্নাম। সেই পূর্বপুরুষের কলংক। ওদের সংস্পর্শই খারাপ। থাকতে নেই ওদের মধ্যে। তাই সবাই গৌরীশংকর আর সাধুচরণের নিরপেক্ষ দলে এসে যোগ দিতে আরম্ভ করেছে। সবাই প্রায় এসে গেছে। শুধু ভণ্ডুল চক্রবর্তী, ক[illegible] ঘর নমঃ—রামবাবুর ধান ওঠান নামানর মজুর আর শ্রীমন্ত আইচ হরিমোহন দাঁর সঙ্গে ডাক্তারখানা খুলেছে বলে সে—এই কজন শুধু রামবাবুর দল ছাড়তে পারল না। শ্রীমন্ত আইচ জোর গলায় ঘোষণা করতে লেগেছে, আমি সাতে পাঁচে নেই। বাস করতে এসেছি। লড়াই করা কাজ নয়। আর দেশেও সকলের সমান সম্পদ ছিল না। কাজেই ওসব বদবুদ্ধির মধ্যে নেই আর। ক্ষমতা থাকে লড়াই করুক যে পারে।

ঠিক সেই মরশুমে ডাক্তার কলোনীর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। গোবিন্দলালের যুক্তি তাঁর মনে ধরেছে খুবই।

ডাক্তারের কথা মন দিয়ে শুনল উদ্বাস্তুরা। তারপর গৌরীশংকরের দলটা হাত মিলিয়ে দিল তাঁর সঙ্গে। ধ্বনি তুলল, বিলে পাট পচান চলবে না। সব পাট তুলে নিতে হবে। ডোবায় গর্তে দিতে হবে।

শুধু ধ্বনি দিয়ে কাজ হয়না। মানুষের মরমে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তারজন্যে গান বাঁধল তারা:

মরণের কি দোষ, বল ভাই
পাট পচানো বিলের জলে
বিষের অন্ত নাই।

শুধু কলোনী নিয়ে আন্দোলন হয় না। অনেক কালের পুরনো জটিল পাপকে দমন করা যায় না। গান গাইতে গাইতে গ্রাম থেকে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল গৌরীশংকরের দল। কলোনীর মানুষ। প্রাণ নিয়ে এক দেশ থেকে এক দেশে এসে, সেখানে আবার এমনি বেঘোরে প্রাণ হারাবে নাকি তারা? সাবধানের মার নেই।

পাট পচান জল বিষাক্ত হয়েছে। ও ব্যবহার করলে মৃত্যু। ওতে বাস করছে যে সব মাছ, সেও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কেউ খেও না। কেউ কিন না ও বিলের মাছ।

বিল লীজ নিয়েছে রহিম সেখ। সে আবার এবছর ইজারা দিয়েছে যাদের তারা রহিম সেখের কাছে গিয়ে অর্থক্ষতির সম্ভাবনার কথা বলতে আরম্ভ করল। মাছের সম্বন্ধে যদি এমনি করে বলতে থাকে ওই মিটিংওয়ালারা, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি যে হবে—ইজারার সব টাকা দিতে পারব না তাহলে।

না, না। দেখছি—আমি দেখছি। রহিম সেখ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেইদিনই রামবাবুকে ডেকে পাঠাল লোক দিয়ে। জরুরী দরকার।

রাম মণ্ডল আর উষাগ্রামের রহিম সেখ অনেক কালের পুরনো বন্ধু। লীগের আমলে রহিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিল। তখন রাম মণ্ডল এ অঞ্চলের বিশিষ্ট লীগ সদস্য। আজ দুজনেই আবার স্বদেশী যুগের লোক। গায়ে খদ্দর চাপিয়েছেন। আজ রামবাবু বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। রহিম সেখ স্বদেশীদলের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য এঅঞ্চলের।

রাম মণ্ডল, রহিম সেখের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। গভীর। স্বার্থসম্পর্কও জড়িত দুজনের মধ্যে। দুজনেই ব্যবসায়ী। দুজনের মিলিত ব্যবসাও আছে অনেক। বিশেষ করে সীমান্ত ব্যবসাটা। বে-আইনী পথে মাল আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা। এ ব্যবসায় স্থানীয় যে কোন চোরা-কারবারের চেয়ে লাভ বেশি। আর এ ব্যবসাতে রাম মণ্ডল ও রহিম সেখের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা একান্তই প্রয়োজন। যে যাই বলুক, দেশ আসলে ভাগ হয়েছে। পাকিস্থান এবং হিন্দুস্থান হয়েছে। কাজেই পাকিস্থানের মুসলমান এবং পুলিশ রক্ষী আর হিন্দুস্থানের হিন্দু এবং পুলিশ রক্ষীর কবল থেকে আত্মরক্ষা করে বে-আইনী সীমান্ত ব্যবসা চালু রাখতে গেলে হিন্দু রাম মণ্ডল এবং মুসলমান রহিম সেখের আত্মীয়তা ছাড়া উপায় নেই। তাই ওঁদের এক কর্ম, এক ধর্ম। দুজনে একাকার।

তাই রহিম সেখের ডাক শুনে রামবাবু উষাগ্রামে ছুটে গেলেন।

পরামর্শ করতে। তাঁর নিজের স্বার্থ কম নয়। রহিমের কাছে যে মৎস্য-জীবীদল এবছরে জলকর কিনেছে—তাদের তিনভাগ টাকা রামবাবুর। রামবাবুই মৎস্যজীবীদের পাঠিয়ে দিলেন রহিমের কাছে। এ আন্দোলনের প্রতিবাদ করবার জন্যে।

মৎস্যজীবীদের কথা শুনে রহিম সেখ বিপন্নবোধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পাঠিয়েছে রামবাবুর কাছে।

বিলে পাট পচানর বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ অঞ্চলে রাম মণ্ডল আর রহিম সেখের পাটের চাষই সব চেয়ে বেশি। কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন। একটা পরামর্শ দরকার। বিশেষ করে রহিম এ অঞ্চলের মুসলমানদের নেতা। মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি এ আন্দোলনে যোগ না দেয় তাহলেই অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে ও আন্দোলন।

এ আন্দোলন বন্ধ করতেই হবে। নাহলে, বংশ বংশ ধরে, অনেক কীর্তি ক'রে, কৌশল ক'রে যে সম্পদ, সুবিধা সুযোগ কায়েম করেছেন তাঁরা, আজ একটা ঝড়েই সে বট, পাকুড়, অশত্থ উপড়ে উল্টে যাবে নাকি? এত সহজে? এত আচমকা?

রামবাবু রহিম সেখের বাড়িতে হাজির হলেন।

এটা লীগ আমল নয়। পাকিস্থানও নয়। রহিমের মাতব্বরীও নেই। এটা রাম মণ্ডলের যুগ। রামবাবু যেতেই রহিম বলে উঠল, এ কি হ'ল দাদা? গাঁয়ে ঘরের লোক যা সাহস পাচ্ছিল না তাই করল আপনার কলোনীর মানুষ? খাল কেটে এ কি কুমীর আনলেন?

রামবাবু এসেছে শুনে, রহিম সেখের বাবা বরকত সেখ বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বুড়ো। পাকা চুল। ভুরুও পেকে গেছে। খাঁটি চাষী লোক। এক কালে বলিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের দেহের কাঠামোটা একটু নুয়ে গেছে বয়সের ভারে। রহিম সেখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, ও রহিম—বিল কিনিলি বেশ করিলি—এখন? এখন যে তোর পাচা ফাটচে ভীমের গদায়।

রামবাবু হেসে উঠলেন। বরকত সেখ অমনি রুখে উঠল। তুমি হাসচ জমিদার বাবু। হাসবা বৈকী। ও শালা রহিমও আমার কথায়

ফেস্যেল। নীগের ফোঁসে পড়ে পেচিজেন হয়ে ভেবেল কি হয়। ত্যাকুন মানা করেলাম। শুনা হোল না। বিল কিনা হোল। মহাজন হবে। এঁ—শালা শত্তুর কি অমনি জন্মায়? সেই বিল কিনে অবধি ওই শহর থেকে ছুটে আসে ভীমপদা নিবারণ বিশ্বাসের নাতিকে নিয়ে আর এক নাল নিশান নিয়ে, ষাঁড়ের মত গাঁয়ে গাঁয়ে হুঁকরে বেড়ায়—জাল যার জল তার। এঁ—একেবারে পীর পয়গম্বরের বাচ্চা সব।

এখন আবার তুমি ওই কলোনী করলে জমিদার বাবু—ওরা লাগল পাটের গুষ্টিতে। মাচ মারচে, জল পচছে। আহা-হা—এ্যাদ্দিন ছ্যালে কুথায় সব? এ্যাদ্দিন পাট পচেনি? এ বিল ছ্যালনা? এ মানুষ ছ্যালনা এ গাঁয়ে? ওরা একা মানুষ? মরণের ভয় উদেরই একার। আমাদের মরণ নেই? তাছাড়া পাটগুলোন যাবে কুথায়? ফ্যালনা নাকি? মাঙনা? আজলা ভরে ট্যাকা আসে না? ত্যাবে?

রামবাবু জমিদার। তিনিই কলোনী গড়েছেন। কাজেই কথাগুলো তাঁর গায়ে লাগারই কথা। লাগলও। কথা নয় ঠেস। নুন। নুনের ছিটে লাগল কাটা ঘায়ের ওপর। বিরক্ত বিপর্যস্ত। রামবাবুর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সুরু করল বরকত সেখের কথাগুলো। উত্তেজিত হয়ে তিনি বীরের মত বলে উঠলেন, যা খুশী করুক ওরা। চেঁচাক। আমরাও এদিগরের মানুষ। জানি কি করতে হয়। আমার অরুণ এখন বেঁচে আছে। ওর হাতের লাঠি এখনও খসে যায়নি। রামবাবু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা জানালেন। বরকত সেখের অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল অরুণ ঘোষের ওপর। খানিক দূরে একটা পেয়ারা তলায় অরুণ ঘোষ চুপ করে বসে ছিল। সব শুনছিল। ওই বলিষ্ঠ বীর লাঠিয়ালের কলাইত জীবিকার বিনিময়ে জীবন পণ করে আসছে প্রভু জমিদারের খেয়ালের খুশীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে।

রামবাবুর আস্ফালন শুনে অরুণ ঘোষ চমকে উঠল। ওর শ্বশুর বাড়ির কথা মনে পড়ল। দিন কতক আগেই সেখানে গিয়েছিল। শাশুড়ী বলেছে, ছেড়ে দাও বাবা ওসব বদমতলবের কাজ। শ্বশুর বলেছে, জামাই মানুষ, তোমাদের মানে লাগতে পারে, তাই বুঝিনি।

তবু বলচি, বাপু, আমিত বাপের তুল্য, আমার কাচে এলে মান যায়না। এস, শ্বশুর জামাই মিলে চাষবাস, গাই বাছুর দুচারডে নিয়ে কাজ করি। আমাদের একরকম করে চলে যাবে।

সবচেয়ে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিল বৌ। কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ওগো, আমার মাথা খাও। শোন। বাবার সঙ্গে মিলে মিশে চাষ কর। ওই পেয়াদাগিরি কোরনা। ও খুন খারাপী কাজ। নোকের শাপ সাপান্ত কুড়নো। আমার বড্ড ভয় করে। যদি কিছু হয়ে যায়, যদি ওই তারান্নুলো—আর বলতে পারেনি বৌ। ওকে ধরে শুধু বলেছিল, তোমার পায়ে পড়িগো—

অরুণ ঘোষ রাজী হতে পারে নি। পুরুষ মানুষ, মরদের বাচ্চা—ঘর জামাই হবে? তবে বৌকে বলে এসেছে, এ সনডা যাক। সামনের সনে চাষ-বাস ভাগে যোগে যা হয় দেখবে চেষ্টা করে।

কিন্তু রামবাবুর কথা শুনে অরুণ ঘোষ ভয় পেয়ে গেল। কি হবে কে জানে? চোখের সামনে শুধু ভেসে উঠতে লাগল, তারান্নুলো—তারান্নুলোর বৌ—।

অরুণ ঘোষ পেয়ারাতলায় বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করেছে। রহিম সেখ আর রামবাবুর আলোচনা আরম্ভ হল। বরকত সেখ (শ্রো

রামবাবু বললেন, কলোনীর লোকজনকে জব্দ করা কঠিন নয়।

রহিম বললে, কিন্তু গাঁয়ের লোকের মনও যে বিগড়ে দিচ্চে। বদ বুদ্ধি দিয়ে।

রামবাবু হাসলেন। বলে উঠলেন, গাঁয়ের লোক মণ্ডল বংশে চেনে। রাম মণ্ডল কী চীজ তারা জানে। সে ভাবনা নেই। কলোনী ট্যাঁ-ফুঁ করলেই তাড়াব। অফিসারের বিষদাঁত ভেঙেছি। এবার ডাক্তারকে দেখব। তুমি তোমার সমাজের লোকদের একটু দেখ। ওরাও বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

আমার সমাজ? মোচনমানদের কথা তুলচ্ছেন দাদা? জানি, আমি জানি। সব বেইমান। শালারা ভোল ধরেচে। শুধু বলে কার দলে যাব? রিফুজীরা এয়েচে পাকিস্থান থেকে। মেজাজ গরম সব। তাদের

কথা না শুনলে টিকা দায় হবে। ভুগান্তি বাড়বে। আবার তুমরা উদের সঙ্গে কাজিয়ে বাদাতে চাও। তাহলে আমরা কি করি?

রামবাবু কি বলতে চাচ্ছিলেন। থামিয়ে দিয়ে রহিম সেখ বললে, আসল কথা কি জানেন—দাদা? হিংসে—হিংসে। যেই বাড়িডা করেচি, অবস্থাটা একটু ফিরিয়েচি আপনাদের আশীব্বাদে অমনি হিংসে—শুধু দাও, থোও, তাহলেই ভালো নইলেই শালা। ওরা বেশি ট্যা-ফুঁ করলেই আমার হাতে মরবে কেন্তু দাদা—হ্যাঁ—জাতের শত্তুর জাত—জাতের শত্তুর জাত।

আন্দোলন তবু ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমেই। ডাক্তার মেতে উঠছেন।

গোবিন্দলালও আর এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আন্দোলন ও জাগরণের মধ্যে সুযোগ মত ঢুকে পড়া এবং ক্রমে নিজেব প্রভাব বিস্তার করে নিজেব নেতৃত্বকে পুষ্ট করাই রাজনৈতিক বিধি। গোবিন্দলালও সেই পথেই নেমে পড়ল শেষ পর্যন্ত। তার দলও গেয়ে উঠল।

মরনের কি দোষ বল ভাই
পাট পচানো বিলের জলে
বিষের অন্ত নাই।

সেই উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে জ্যোৎস্নামরী আবার দুর্লভপুরে এল।

কলকাতায় পালিয়ে গিয়েও শান্তি পায়নি। গ্রামকে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে। সাধনার চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। সেবা-ব্রতীর নিষ্ঠাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। কিন্তু ডাক্তারের মুখখানা মনে থেকে যেন কিছুতেই নড়তে চায় না। বরং দূরে চলে যাওয়ায় সে মুখ যেন আরও ঘনিষ্ঠ আরও বেশি মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে লাগল দিন দিন। মুখ ফুটে ডাক্তার যা বলেননি, তাঁর স্মৃতিমুখ যেন তাও ঘোষণা করতে চায়। তাই বিপন্ন অসহায় অবস্থায় জ্যোৎস্নাময়ী আবার গ্রামে পালিয়ে এল।

জ্যোৎস্নাময়ী গ্রামে এল। গোবিন্দলাল দিদিকে দেখে হঠাৎ যেন

একটা সুযোগের সন্ধান পেল। আন্দোলনকে সাহায্য করতে দিদির সাহায্য নিলে বেশ হয়। জ্যোৎস্নাময়ীকে গিয়ে গোবিন্দলাল বললে, দিদি একটা কাজ করবি?

কি?

তোর মিশনেরই কাজ। লোকের সাহায্য করা। গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের বোঝাবি, পাট পচা জল খেয়েই লোক মরচে সব। কাজেই জলটা ফুটিয়ে, সিদ্ধ করে খাও।

জ্যোৎস্নাময়ী মনের অশান্তি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রভু যীশুর সাধনায় তন্ময় হতে চায়। পারছে না। কি এক শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে যেন তার ওপর। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সে গোবিন্দলালের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু দাতুর মতামত, অনুমতি দরকার। জ্যোৎস্নাময়ী বললে, তোকেই দাতুর কাছে বলতে হবে গোবিন্দ।

গোবিন্দলাল নিজে অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জ্যাৎস্নাময়ীর জন্যে দাঁড়াতেই হবে। নিজের জন্যেত নয়। মানুষের জন্য। অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্যেই দাতুর সামনে গিয়ে গোবিন্দলাল দাঁড়াল।

অন্য কোন কাজ নয়। আন্দোলনে যোগ দেওয়া নয়। শুধু গ্রামের মানুষের সেবার জন্যেই দিদি বাড়ি বাড়ি যাবে তাদের বোঝাতে। পাট পচা জল খেতে নিষেধ করতে।

নিবারণ বিশ্বাস জানেন, মানুষের সেবাকর্ম মহৎ প্রবৃত্তি। কিন্তু গোবিন্দর সঙ্গে যাবে জ্যোছনা? কখ্খন না। গোবিন্দ কুলাঙ্গার। ও যোগ দিয়েছে ধর্ম না মানার দলে। শয়তান। ব্যাভিচারী। তার ওপর আন্দোলন করে। লোক খেপিয়ে বেড়ায়। ওদের মানতে পারেন না তিনি। এখন ধর্মের ভয়ানক দুর্দিন। ইংরেজ ছিল, খৃষ্টানদের তাও খানিক ভরসা ছিল। কিন্তু এখন? কি হবে ভবিষ্যতে কেউ বলতে পারে না। কাজেই খৃষ্টানরা যদি এক জোট হয়ে কাজ না করে, যদি হিন্দুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে ওই সব হাঙ্গামা হুজুত বাধিয়ে বেড়ায় তাহলে সর্বনাশ। যদিও তিনি প্রটেষ্টাণ্ট, তবু এ ব্যাপারে রোমান

ক্যাথলিকদের মতই তাঁর গোঁড়া মনোভাব। জ্যোৎস্নাময়ীকে গোবিন্দর দলে যেতে দিতে তিনি পারেন না। বিশেষ করে জ্যোৎস্নাময়ী মিশনের পয়সায় বিলাত যাবে। —নিবারণ বিশ্বাস সাফ জবাব দিলেন, জ্যোচ্ছনাকে ওসব শয়তানের দলে যেতে দেব না আমি।

গোবিন্দলাল কমরেড। তার শাস্ত্রে হতাশার ঠাঁই নেই। পালিয়ে আসবার কথা নেই। গোবিন্দলাল দাদুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল,— তোমাদের ও পথ আজ আর ঠিক নয়। ওতে তোমাদের মঙ্গল হবে না।

নিবারণ বিশ্বাস কোন কথা বললেন না।

গোবিন্দলাল বললে, শুধু ধর্মের গণ্ডী নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না দাদু। এখন মানুষের রাজত্ব। পৃথিবী এখন অনেক ছোট হয়েচে। এ্যাটমের কৃপায় সব গণ্ডী উধাও। এখন মানুষের মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়াই পথ। যেমন একাকার হয়ে আছে, রুটি ভুক, পাউরুটি ভুক, অন্ন ভুক থেকে পরস্পর নিষিদ্ধ আহার্য ভুকেরা অবধি। ধর্ম নিয়েও ওই করতে হবে। আজ ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়েছে। দেশের মানুষকে ওই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করে এগিয়ে চলতে হবে।

না। নিবারণ বিশ্বাস কিছুতেই মানতে পারেন না এসব। যে হিন্দুধর্মের অবিচার আর নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশের এত মানুষ খৃষ্টান হয়েছে, তারা আবার সেই হিন্দুধর্মের খপ্পরে পড়বে, ওদের সঙ্গে মিশে যাবে? কখখন না। হিন্দুর কুসংস্কারের মধ্যে খৃষ্টান আর যাবে না কিছুতেই।

গোবিন্দলাল অসহিষ্ণুর মত বলে উঠল, দাদু, নিজেদের এত বড় করে দেখচ কেন?

দেখব না? কুসংস্কারকে, অন্যায়কে ছাড়িয়ে ওপরে উঠে বড় ভাবব না?

হ্যাঁ। ভাবতে পারতে যদি সত্যি সত্যিই বড় হতে পারতে।

নিবারণ বিশ্বাস জিজ্ঞাসু হলেন।

গোবিন্দলাল ব্যাখ্যা করল। তোমরা হিন্দু থেকে বেরিয়ে এসেচ বটে। কিন্তু ওদের দোষ অস্থি মজ্জায় মিশে আছে। তোমরা ধর্ম

পাল্টেছ। কেষ্টর জায়গায় খৃষ্টকে ভজনা করচ। কিন্তু তুমিত ভুক্তভোগী দাদু। দিদির বিয়ের কত চেষ্টা করেছিলে।

নিবারণ বিশ্বাস শিউরে উঠলেন। গোবিন্দলাল বলে চলল, কলকাতার নন্দ মুখুজ্জের ছেলে রমেনের সঙ্গে দিদির বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। নন্দ মুখুজ্জে রাজী হ'ল না। বলল, বিশ্বেস বংশে কাজ করিনে আমরা। খৃষ্টান হলেও আমরা বামুন খৃষ্টান। তারপরেইত তুমি রেগে মেগে দিদিকে মিশনের হাতে দিলে। প্রটেষ্টাণ্টরা ঈশ্বরের সেবার জন্য আজীবন কৌমার্যে বিশ্বাসী নয়। হিন্দু আর রোমান ক্যাথলিকদের ভূমিকা নিলে তুমি। দিদির কানে মন্তর দিলে, বিয়ে করতে হবে না। মিশনারী হয়ে, কুমারী হয়ে সারাজীবন ঈশ্বরের সেবা পুণ্যির কাজ।

নিবারণ বিশ্বাস শুনতে পারেন না আর। উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত কি হ'ত কে জানে।

কিন্তু এই হামলার মধ্যে কেউ জানতে পারে নি জ্যোৎস্নাময়ীর উপস্থিতির কথা। ভাই আর দাদুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ভিতরের কোণে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। একি বলছে গোবিন্দ—এ নির্মম নিষ্ঠুর সত্য—এতদিন পরে আবার সেই সব তোলা কেন ? তার মিশনারী হবার পিছনের এই ইতিহাস তার ধর্মীয় নিষ্ঠাকে যেন ব্যঙ্গ করে তুলল। অমনি কেঁপে উঠল জ্যোৎস্নাময়ী। না। আর শোনা যায় না। ছুটে পালাতে উদ্যত হ'ল। সেই সময়ই তার পায়ের সঙ্গে দরজার পাল্লার একটা ধাক্কা লাগল।

অমনি গোবিন্দলাল থেমে গেল। নিবারণ বিশ্বাস ফিরে তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু বুঝতে পারলেন কে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপমানের জ্বালা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, যা—বেরিয়ে যা গোবনে। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা বলচি। জ্যোচ্ছনা যাবে না। ওকে যেতে দেব না।

গোবিন্দলাল বেরিয়ে এল। না আসুক দিদি। না আসুক দাদু। আর তাঁর সম্প্রদায়। তবু পারবে না আমাদের রুখতে। মানুষ চিরকাল

বোকা থাকবে না। নিজের সর্বনাশ কখন মুখ বুজে মেনে নেয় না। তারা আপন পথ বেছে নেবেই। একদিন হিন্দু খৃষ্টান হয়েছিল সেই তাগিদেই। খৃষ্টান বিপ্লবী হয়েছে সেই কারণেই। সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, বাঁচার ইচ্ছা যে মানুষের ধর্ম। জীবনের ধর্ম।

গোবিন্দলাল আবার আন্দোলনের কাজে নেমে গেল। গ্রামের শান্ত হাওয়া চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্রমেই। ঘূর্ণী ঝড়ের সম্ভাবনায় যেন সময় গুনছে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর।

দারোগাবাবু এবার সচকিত হলেন। শান্তির নিয়ামক তিনি। শান্তির রক্ষক।—দেশ রাষ্ট্র সমাজ তাঁর হাতে শান্তিদণ্ড তুলে দিয়েছে। বলেছে, হে পুরুষ তুমি অতন্দ্র প্রহরী হও। কিসের? শান্তির। শান্তি বলতে কি বোঝায়? বোঝায় যথা পূর্বং তথা পরং। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখ। উন্নত শীর্ষ পর্বত থেকে গভীরতম সমুদ্র অবধি, যে যেমন আছে তাই নিয়ে শান্তি। বরং পর্বত আরও উন্নত হতে পারে, সমুদ্র আরও গভীর হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত যেন না ঘটে। তাহলেই বৈচিত্র্য হারাবে। শান্তি, নিয়ম, শৃঙ্খলা—যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা আমাদের ধ্যান ধারণা আঘাত খাবে। সে অসহ্য। তাই তোমার হাতে শান্তির দণ্ড তুলে দিলাম। এ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ তোমার কাজ নয়। শুধু বিরুদ্ধচারীদের উদ্দেশ্যে দণ্ড প্রয়োগই তোমার কর্তব্য।

দারোগাবাবু প্রথমে এলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রামবাবুর কাছে। প্রথমে শুনলেন কিছু ঘটনা। তারপর বললেন, আপনি বরং আমার কাছে একটা রিপোর্ট দিন। সাহায্য চেয়ে। এলাকার নিরাপত্তার জন্যে। তারপর আমি যা হয়—।

রামবাবু হেসে উঠলেন। রিপোর্ট কি দেব? ওদের ভয় করছি বলে? কিচ্ছু না। এ রাম মণ্ডল অমনি প্রেসিডেণ্টি করে না স্যার। ভয়ই যদি করতাম, তাহলে প্রথমে যেদিন ওরা পাট তুলে নেবার জন্য প্রস্তাব পাঠাল আর নাহলে আন্দোলন আরম্ভ করবে বলে সাত দিন সময় দিল, তখনই আপনার কাছে ছুটে যেতাম। তবে একটা ভুল

করেছি, ওই গোটাকতক বাঙাল ছন্নছাড়াকে এখানে এনে। শালাদের মান অপমান জ্ঞান নেই। তাই এত তড়পানি। সব ভেঙে দেব।

দারোগাবাবুর মন উঠল না। রামবাবুর কাছ থেকে উঠে সুকুমারের কাছে গেলেন। সুকুমার আজকাল বেশির ভাগ নিজের আস্তানাতেই থাকে। সে ডাক্তারের এই কার্যকলাপকে মানতে পারে না। দুঃখ হয়। অনেকটা বিপন্নও হয়েছে বৈকী এই আন্দোলনের ফলে। তার নিজের কাজ আর উদ্বাস্তুদের অবস্থা ভেবেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে। শুধু গণ্ডগোল আর বিরোধ বাধান উচিত নয় সকল সময়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয় তাতে। অগ্রগতি ব্যহত হয়। জীবনের স্থিতির স্বস্তির শিকড় নড়ে ওঠে। সহযোগিতা আর যতদূব সম্ভব নিরপেক্ষতাই শান্তির পথ। এতাবৎ আপন জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

কিন্তু উদ্বাস্তুরা তার বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। কয়েদীও নয়। স্বাধীন নাগরিক—অনেক অভিজ্ঞ, জীবনে পোড় খাওয়া মানুষ, তাদের উপদেশ দেবার দায়ভার তার ওপর নেই। কাজেই সুকুমার প্রায় গুটিয়ে এনেছে নিজেকে। বাধার সৃষ্টি করার চেয়ে সরে দাঁড়ান ভাল।

দারোগাবাবু সুকুমারের কাছে এলেন। সুকুমার অভ্যর্থনা করে বসাল। দারোগাবাবু বললেন, আপনি সরকারী কর্মচারী। আমিও তাই। তাই আপনার সহযোগিতা চাই স্যার।

সুকুমার জিজ্ঞাসু হ'ল।

দারোগাবাবু বোঝালেন, কলোনীর লোকগুলো কি করছে বলুনত? এসে বসতে না বসতে আমাদের চাকরী করা দায় করে তুলল? আপনি ওদের একটু বলুন।

সুকুমার ক্ষমা চাইল, অক্ষমতা জানিয়ে। বললে, আমি লোন দিতে এসেছি। খবরদারী করতে আসিনি।

তবু লোন যখন দিচ্ছেন, ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনার ওপর দেওয়া আছে। ওদের চরিত্র বিচারের।

না। এটা ঠিক নয়।

দারোগাবাবু বললেন, কিন্তু আপনার তত্ত্বাবধানে ওরা আছে।

এখন আমরা যদি ওদের ওপর আইন চালাই আপনাকে ডিঙিয়ে, তাহলে আপনারই চাকরীর ক্ষতি হতে পারে। আপনার সম্মানে লাগতে পারে। তখন আপনিই কত কথা বলবেন।

সুকুমার তীব্র প্রতিবাদ জানাল না। মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বললে, কি জানি, আমি ঠিক বুঝছিনে আপনার কথা। আপনার এক্তিয়ারের কাজ আপনি করবেন। আমি কি বলব? ও আন্দোলন সম্পর্কে আমার কোন মতামত নেই। আপনি যা খুশি করতে পারেন। আন্দোলনে যারা নেমেছে, দায় ঝক্কিও তাদের। সেটুকু তারা মেনে নিয়েই নেমেছে নিশ্চয়ই। আমিত আন্দোলন বলতে তাই বুঝি। নাহলে তারা করুণা প্রার্থী হয়ে আপনাদের জয় করবে কি করে?

এর পর সুকুমারকে আর বলার কিছু নেই দারোগাবাবুর। তবে মনে মনে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। উদ্বাস্তু আন্দোলনকারীরা তাহলে একা—তেমন শক্তির ছত্রছায়া পায়নি।

হ্যাঁ, শুনেছেন, ডাক্তার নাকি এদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু কাছে গিয়ে হয়ত দেখবেন, সুকুমারের মতই তিনিও এড়িয়ে যাবেন। অস্বীকার করবেন আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততাকে। করবেনই। দৃঢ়চেতা বিপ্লবী হোক, যেই হোক, চাকরীর ক্ষমতার কাছে সব মনোবৃত্তি হার মানতে বাধ্য। ইংরেজ আমলের দারোগা তিনি। অনেক দেখেছেন, হয়ত কাউকে কিছুতেই বশে আনা যাচ্ছে না, অমনি চাকরী দেওয়া হ'ল একটা। অমনি রূপ পাল্টে গেল তার। একান্ত বশংবদ হয়ে উঠল সে। এইত বাস্তব সত্য। —ডাক্তার সম্পর্কেও এই ধারণা নিয়েই দারোগাবাবু তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

ডাক্তার সুকুমারের চেয়েও মৌজ করা মানুষ। দারোগাবাবুকে আপ্যায়িত করে চেয়ারে বসালেন। সিগ্রেট এগিয়ে দিলেন। দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, কি খবর বলুন। এতকাল পরে এখানে? একটা মানুষ এ্যাদ্দিন যে এখানে এসেছি, মরলাম কি বাঁচলাম তাওত দেখেন নি মশাই।

আপনার বাড়িতে কি রোগবালাইও হয়না? একটা কলও পেলাম না কখনো? এ্যাঁ—? বলুন আজ কি মনে করে?

দারোগাবাবু হেসে বললেন, আজ আমি আপনার ডাক্তারী করতে এসেছি স্যার।

ডাক্তার জিজ্ঞাসু হলেন।

দারোগাবাবু বললেন, আপনি রাজনীতি করছেন। লোক খেপাচ্ছেন।

ডাক্তার হেসে উঠলেন এবার। আপনি ওকে রাজনীতি বলেন নাকি? চলুন উঠুন।

কোথায়? দারোগাবাবু হকচকিয়ে গেলেন।

আপনি এ অঞ্চলের দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ। আপনার আগেই দেখা উচিত ছিল।

কি?

এই দেশের আর বিলের অবস্থাটা।

ও আমি দেখেছি। ওত এবার নতুন কিছু নয়। এখানকার স্বাভাবিক অবস্থা।

স্বাভাবিক অবস্থা? ডিস্‌গ্রেসফুল।

দারোগাবাবু এবার স্বরূপ ধারণ করে বললেন, আপনি রাজনীতি করছেন এখানে।

না। ডাক্তারও জবাব দিলেন, এটা রাজনীতি বলবেন না। এটা স্বাস্থ্যনীতি।

দারোগাবাবু একটু থমকে গেলেন। তারপর বললেন, ভুলটা আপনারই স্যার। কথার দাপটে স্বরূপ পাল্টায় না। কোন কিছু আন্দোলন করা রাজনীতিই।

না। ডাক্তার মাথা উঁচু করে বললেন, আপনি এখানে এসেছেন কেন দারোগাবাবু? আমি যদি বলি আপনিই এসেছেন রাজনীতি করতে? যদি বলি সুযোগভোগী স্বেচ্ছাচারীদের দালাল হয়ে এসেছেন?

দারোগাবাবু উত্তেজনায় আরক্ত হয়ে উঠলেন। গ্রামের বুকে যে পরিবেশে তিনি সম্রাটতুল্য, সেখানে ডাক্তার এমন কথা বলছেন!

তিনি কথা বলতে পারলেন না।

ডাক্তার বললেন, আমি জানি, আপনি নিজের কাজের দায়িত্বেই এখানে এসেছেন। তবু প্রশ্ন করব, আপনার পদ অনুযায়ী কাজ কি?

দারোগাবাবু নীরব।

ডাক্তার বললেন, আমি জানি কি আপনার কাজ। এ থানায় সরাসরি খুন জখমের অশান্তির সংবাদ পেলেই ছুটে যাওয়া। তার প্রতিকার করা। তাহলে সে সব কিছু ঘটবার আগেই আপনি ছুটে এসেছেন কেন?

দারোগাবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, না, কোন কিছু ঘটবার আগেই আমি বন্ধ করে দিতে চাই। অশান্তি ঘটতে দেব না আমার এলাকায়।

ডাক্তার হাসলেন। তবে? আমার বেলায় অন্যনীতি আরোপ করছেন কেন? আমার কাজে বাধা দিতে চান কেন? আমি ডাক্তার। যাতে কেউ রোগে আক্রান্ত না হয়, সবাই যাতে সুস্থ থাকে, সেই স্বাস্থ্য নীতির কাজ করা কি আমার কাজ নয়? রোগের কারণ আর তার প্রতিকারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা রাজনীতি না স্বাস্থ্যনীতি? বলুন কোন ভাগে ফেলবেন?

দারোগাবাবু ব্যাপারটা বুঝলেন এতক্ষণে। একটু অপ্রতিভও হলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, কিন্তু এটাত শিশুরাষ্ট্র। এর গড়ে উঠবার মুখে এসব হৈ-হাঙ্গামা, দেশের মানুষের মধ্যে সন্দেহ, বিভেদ সৃষ্টি কি ঠিক?

ডাক্তার বললেন, ডাক্তারী শাস্ত্র বলে, কচি হাড়ই জোড়া লাগে ভাল। বুড়োর পাকা হাড় ভাঙার বিপদ অনেক। আবার শিক্ষকরাও বলবেন, শিশুকালই গড়ে পিটে মানুষ করে তোলার পক্ষে প্রশস্ত।

এ সব কথার জবাব দেওয়া দায়। দারোগাবাবু আবার বিপন্ন হলেন। তর্ক দিয়ে তর্কের মীমাংসা হয় না। কূটতর্কে ফল নেই। বললেন, কিন্তু আপনি চাকরী করেন। জানেনত চাকুরীজীবীদের রাজনীতি করা নিষিদ্ধ।

ডাক্তার হেসে উঠলেন হো হো করে। তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা জেগে উঠল আবার।

জানি, জানি মশাই। বিলক্ষণ জানি। আমরাও এ যুগের মানুষ। কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিচারের একটু ভুল হয়ে গেছে দারোগাবাবু। চাকরী করি—তবে একটু অন্য রকম। চাকরী যাওয়া মানে ত ভাতে মারা। গণতন্ত্রের এই এক কৌশল। হাতে না মেরে ভাতে মারা। আমাদের বেলায় সেটা সম্ভব নয় কিন্তু। আমাদের ভাতের মার নেই। মানুষ যতদিন দেহধারী থাকবে, ততদিন তাদের গরজেই আমাদের ভাত কাপড় দেবে। আপনাদের হুমকিতে ভয় পাবে না। এমনকি আপনিই আদর করে কাছে ডাকবেন আমাকে। আমরা মানুষের দুঃসময়ের বন্ধু। আমাদের বিদ্যে হচ্ছে বাঁচার আর বাঁচানর। কাজেই দয়া করে চাকরীর ভয়টা আর দেখাবেন না। বরং আমিই আপনাকে অনুরোধ করছি মানুষের দুর্দশা দেখে দেশে সত্যিকার শান্তি আনতে সাহায্য করুন। স্বাধীন দেশের, জাতির, সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য আছে।

দারোগাবাবু তীব্র অপমানের জ্বালা নিয়ে উঠে এলেন ডাক্তারের কাছ থেকে। সোজা কলোনীর মাঠে এসে হাজির হলেন। দু'একজন উদ্বাস্তুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, শিশুরাষ্ট্রে কোন বিভেদ সৃষ্টি চলবে না। পাশেই পাকিস্থান রাষ্ট্র। তারা আমাদের দুবলতার সুযোগ নেবে। তেমন সর্বনাশ হতে দেব না। এ দেশ ভারতবর্ষ, আমার জন্মভূমি। অনেক সাধনায় একে স্বাধীন করা হয়েছে। দেশের হাজার হাজার সুসন্তান বন্দেমাতরম বলতে বলতে ফাঁসি কাঠে ঝুলেছে। বন্দুকের গুলীতে প্রাণ দিয়েছে। দ্বীপান্তরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছে। তাদের কণ্ঠে শেষ বারের মত উচ্চারিত মহামন্ত্র এখনও এদেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। সে ধ্বনি শ্রবণে রোমাঞ্চ লাগে ভারতের কোটি কোটি মানুষের। আসমুদ্রহিমাচল কেঁপে ওঠে।

একটু থেমে তিনি আবার আবেগের সঙ্গে আরম্ভ করলেন, না, না। সেই সব দেশপ্রেমিক শহীদের অপমান আমি সইব না। বিয়াল্লিশ সালে ব্রিটিশের শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে যেমন হল্লাকারী দুষমনদের শাসন

করে উন্নতশীর্ষ ইউনিয়ন-জ্যাকের মর্যাদা রেখেছি, তেমনি করেই আজকেও সেই অভিজ্ঞহস্তে অশোকচক্র-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করব। হল্লাকারী শান্তিভঙ্গকারী কাউকেই ক্ষমা করব না।

কলোনীর মানুষগুলো ছুটে আসতে লাগল দারোগাবাবুর এই আত্মহারা বক্তৃতা শুনতে। ভীড় বাড়তে লাগল।

দারোগাবাবু সুকুমারের কাছে গিয়েছিলেন। সুকুমার নিরাসক্তি দেখিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দারোগাবাবু চলে আসার পরই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। লৌকিক আইনের চেয়ে দৃঢ় হচ্ছে মানুষের সাহচর্যের সম্পর্ক। কলোনীর মানুষগুলোর সঙ্গে সে চাকরী নিয়ে এসেছে। অর্থের বিনিময়ে কাজ করে, সত্য। তবু এই ক'মাস মেলামেশার মধ্য দিয়ে কখন যেন আপন হয়ে গেছে সেই সদ্য চেনা মানুষগুলো। দারোগা-বাবু নিশ্চয়ই ওদের পিছনে লাগবে। ক্ষতি করবে। এই আশংকায় সুকুমার চঞ্চল হয়ে উঠল। ডাক্তার। ডাক্তারই এইসব ঝামেলার জন্যে দায়ী। এখন যদি সব ধর পাকড় করে, তাহলে কি আর কলোনী হবে?

সুকুমার ডাক্তারের কাছে ছুটল। ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলা দরকার পরিস্থিতির কথা। তারপর আলোচনা করে যা হয় অন্য একটা পথ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু ডাক্তার? ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠলেন সুকুমারকে। বিপদ কি মশাই? মৃত্যুর সম্ভাবনাটা বিপদ নয়? না বাঁচলে কলোনী করবে কে? আপনার ভয় আছে, ভালোমানুষি আছে, ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকুনগে। আমি ডেস্‌প্যারেটিজম্‌এ বিশ্বাস করি। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আপনারা দুয়ের মাঝখানে থাকার লোক। আপনাদের ওপর আমার আস্থা নেই। আপনারা জগতে ভালোর চেয়ে মন্দ করেন বেশি। জীবনটাকে ভয়-কাতর করে তোলেন। শুনতে চাইনে আপনাদের কথা।

সুকুমার আজ চরম হতাশ হল। চূড়ান্ত বিরক্তি নিয়ে ডাক্তারের

সামনে থেকে চলে এল। তার কলোনীর মানুষকে সে এবার নিজেই বলবে। আপন অধিকারের বলে। কলোনীতে এসে দেখে দারোগাবাবু আস্ফালন করছেন। অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা। আর কলোনীর মানুষগুলো শুনছে আর হাসছে, ভয় পাচ্ছে না কেউ। অনেক অভিজ্ঞতা ওদের। অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে কলোনীর মাঠে পৌঁচেছে।

সুকুমার আর তাদের কিছু বলতে সাহস করল না। ওরা ত অবোধ নয়। বরং বেশিই বোঝে অনেকে।

দারোগাবাবুর এমনতর হস্তক্ষেপের পর আন্দোলনএর আগুন জ্বলে ওঠল আরও বেশি উৎসাহে। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিল, সাত দিন সময় দেওয়া গেল। এর মধ্যে বিল থেকে পাট তুলে না নিলে, আমরা নিজেরাই তুলে দেব। ছিটিয়ে ফেলে দেব ডাঙায়।

প্রতিপক্ষও তেমনি করেই ঘোষণা জানাল। চ্যালেঞ্জ—হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হল। পাটে হাত দিলে সে আর ফিরে যাবে না।

বাস্। সারা অঞ্চল জুড়ে কুরুক্ষেত্রের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। গ্রামের মামুলী, একঘেয়ে জীবনে নতুন সাড়া পড়ে গেল। তবে কি গ্রামের মানুষ জাগছে? ঘুমন্ত প্রাণের ঘুম ভাঙছে, না নাভিশ্বাস উঠেছে গ্রাম জীবনের? কি হবে পরিণতি কে জানে। গ্রামের হাওয়া বাতাস থমথমে হয়ে উঠছে ক্রমেই। সাতদিন—সাতদিন ত ফুরিয়ে যাবে দেখতে দেখতে। সবাই প্রতীক্ষারত।

শুধু একজন। একজনের ভাল লাগেনা মোটেই এই পরিস্থিতি। তিনি লক্ষ্মণ মণ্ডল। তিনি ত আর পুরোপুরি গ্রামের মানুষ নন। গ্রামের হাওয়ায় প্রগতির নেশা আজও অপরিচিত। অথচ এই সময়েই শহরের আকাশ বাতাস নতুন নতুন ভাবনা চিন্তায় ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছে। তারমধ্যে অল্পক্ষণ থাকলেই নেশা লেগে যায়। লক্ষ্মণ মণ্ডলের মন সেই নেশাতেই ভরপুর। তাই তিনি দাদাকে বলেছিলেন এখানে ব্যবসা উঠিয়ে দিতে। গ্রামের বুকে এই মামুলী ব্যবসা করতে গিয়ে সরকারী লোকজনকে তোষণ আর দেশের লোকের গালমন্দ খাওয়া সহ্

হয় না। এখন যুগ আলাদা হয়ে গেছে। নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠছে দেশে। সে সব দিকে গেলে মান সম্মান বাড়ে। সরকারী লোকজন ভয় করে, খাতির করে। কি দরকার এ সব করায়? কিন্তু দাদা শুনতে রাজী নন কোন কথা।

তবু গুমরে মরারও একটা সীমা আছে। এক হ'ত যদি তিনি এই পরিবেশ থেকে বাইরে চলে যেতে পারতেন। শহরের ভীড়ে হারিয়ে যেতেন। তা এখন আর সম্ভব নয়। শহরে যথেচ্ছভাবে জীবনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে কঠিন রোগে পড়েছিলেন। অনেক কষ্টে সুস্থ হয়েছেন। ডাক্তারের নির্দেশে গ্রামের কূপমণ্ডুকবৃত্তি নিয়ে কিছুদিন গ্রামে থাকা দরকার। টাকা থাকলেও যথেচ্ছ জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ গ্রামে নেই। গ্রাম মানেই অভাব। অপরিপূর্ণতা-- বিলাসের, সুযোগের। এতে মানুষের জীবনকে যেমন পঙ্গু করে তেমনি বাঁচিয়েও দেয় অনেক ক্ষেত্রে। তাঁর ক্ষেত্রে অন্ততঃ শহরে গেলেই মনটা ছুক ছুক করে। তার চেয়ে গ্রাম ভাল। কিন্তু গ্রামে এলেই মনে পড়ে যায় অরুণ ঘোষের স্ত্রীকে। অরুণের যখন বিয়ে হয় তখন ওর বৌএর বয়স সাত। ছোট্ট, নলক পরা মেয়ে। তার চোখ দুটো, মুখের সপ্রতিভ ভাব দেখে তিনিই পছন্দ করেছিলেন। তিনিই বিয়ে লাগিয়েছিলেন অরুণের। তখন তাঁর মনে ছিল এ মেয়ের প্রতি প্রবীণের স্নেহ একটু অনুকম্পা। তারপর? হ্যাঁ, ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। ইতিহাসের গতি মানুষকে দিয়ে অসম্ভব সম্ভব করিয়ে নেয়। কালচক্রের অসংখ্য ঘটনার আবর্তের মধ্যে মানুষ দিশেহারা হয়। আবর্তকে জয় করার ঘোষণা হচ্ছে দম্ভ। জয়ী বলে ঘোষণাও আত্মতুষ্টির নামান্তর।

তাই তাঁর জীবনেও বিপর্যয় নামল। হতাশা। হতাশা আনল উচ্ছৃংখলতা। অন্যদিকে চাঁদের কলাবৃদ্ধির মত যৌবনে পা দিল অরুণের বৌ। তার সেই বাল্যের চোখ দুটো পূর্ণিমার চাঁদের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের সপ্রতিভতা সৃষ্টির সম্ভাবনা ঘোষণার ভঙ্গীতে স্পষ্টতর হল। স্পষ্টতমই বলা যায়।

তাকে দেখে তাঁর হতাশ, অপমানিত মনে অতৃপ্ত তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

স্নেহ হয়ে ওঠে লালসা। তবু ঠিক যেন পরিবেশ মেলেনা। যে পাওয়া নিছক অর্থের বিনিময়ে নয়, যে চাওয়া শুধু অর্থ দেখিয়ে নয়, সেখানে স্থান কাল পাত্রের সুসম সমন্বয় দরকার বৈকী। তারই জন্যে তিনি অনেক ধৈর্য, সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। শেষে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছেন। ভুলে যেতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর মনে এক আশ্চর্য ভয় আর বিস্ময় জমা হয়ে আছে। শহরে অর্থের বিনিময়ে যা করেন, তার সঙ্গে মনের যোগ থাকেনা। কিন্তু মন নিয়ে এগিয়েছিলেন বিবাহিত জীবনে। লাভ হয়েছে চরম আঘাত আর উপেক্ষা। তারপরই অরুণের বৌকে নিয়ে অনেক বাজাবার চেষ্টা করেছেন। তবু ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি মেয়ে মানুষের মন। কি চায়, কি চায় না ? ভাবতে ভাবতে শহরে চলে গেছেন বিরক্ত হয়ে।

কিন্তু আবার ডাক্তার গ্রামে পাঠালেন। আর গ্রামে এসেই দাদার তৈরী জটিলতা। ভাল লাগল না এসব। এর মধ্যে এই সব ভুলে থাকবার কথা ভাবতে গেলেই অরুণের বৌকে মনে পড়ে। অরুণটাও আচ্ছা। বৌকে এসময় বাপের বাড়ি রেখে এসেছে। আনতে বললে আনে না। বলে, শ্বশুর এখন পাঠাবে না বলচে। আগের দিন হলে জমিদার লক্ষ্মণ মণ্ডল মেয়েকে জোর করে ধরে আনত বাবার কাছ থেকে। জমিদারের কর্মচারীর বিষয় সম্পত্তিত সবই জমিদারের অধীন। এখন সে যুগ নেই। তাছাড়া তিনি ত শহরে থাকেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে কত শুনেছেন, সম্ভোগের সঙ্গে প্রেমের তফাৎ আছে খানিক। প্রেমে গৌরব বাড়ে। পৌরুষের পরিচয় মেলে। পৌরুষ চায় না কোন পুরুষ ? হাল আমলে সমাজও তাই বলছে, পৌরুষ দেখাও। বলাৎকার ক'রনা।

অরুণ নিশ্চয়ই শ্বশুরের কাছে বলতে সাহস পায়না। বেটা ভেমো।

লক্ষ্মণ মণ্ডল ঠিক করে ফেললেন, তিনিই যাবেন দুর্লভপুরে। অরুণের শ্বশুরকে গিয়ে বলবেন, মেয়ের সমর্থ বয়েস, ভরা যৌবন, জামাই ভরা জোয়ান। এখন কি মেয়েকে জামাই এর কাছ থেকে এনে নিজের কাছে রাখার সময় ? আক্কেলটা কি ? অরুণটা যে কোন কাজেই মন বসাতে পারছে না। কাজের ক্ষতি হচ্ছে। সে লজ্জায়

বলে না। মেয়েকে জামাইএর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

লক্ষ্মণ মণ্ডল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত মতই একদিন বিকেল বেলা বেরিয়ে পড়লেন দুর্লভপুরের উদ্দেশ্যে।

তখন সেই পুরো মরশুমের দিন। আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির সেই সপ্তম দিবস এগিয়ে আসছে দ্রুত। এ অঞ্চলের মানুষের মনে ভয়, বিস্ময়, কৌতূহল, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিন গুণছে। সেই পরিণতির দিন।

আন্দোলনটা আরম্ভ করেছেন ডাক্তার। তার চরম পরিণতির প্রাক্কালে তিনিও পথে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন। হঠকারিতাপ্রিয় ডাক্তার। সততার প্রতি নিদারুণ আস্থা। অন্যকে বিপন্ন করে নিজে সরে দাঁড়ানর লোক নন তিনি। সর্বোপরি তিনি ব্যর্থ জীবনের জ্বালা থেকে বাঁচতে চান। তাই বেপরোয়া পথেই নেমে পড়েছেন।

ডাক্তার আন্দোলনে নেমেছেন। গ্রামজীবনে অভিনব ব্যাপার। অভাবনীয়। গ্রামের মানুষ তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার জ্বালা তিল তিল ক'রে ভোগ করে। নেতৃত্বের অস্ত্র আয়ত্তে না থাকায় তারা নিরুপায়। উপযুক্ত নেতা পায়না যিনি সত্যিকারের পথ দেখাবেন। সত্য পথে ঝাঁপ দিতে বলবেন।

ডাক্তারকে নেতা পেয়ে তাই আন্দোলন আরও দানা বেঁধে উঠল। ডাক্তার পথে চলেন। পিছনে গ্রামবাসী। সবাই নয়। প্রথমে বাউণ্ডুলে নামে খ্যাতর দল। তারপরে যারা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে, তারা। আর আজও যারা দ্বিধান্বিত, তারা বাড়ি থেকে আড়াল আবডাল থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে চলেছেন। ডাক্তারের দলের উদ্দেশ্য তাদের ভয় ভাঙাবার। তারাও আসবে। এই আশা নিয়েই ডাক্তার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

দুর্লভপুর এসেও মোড়ের মাথায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন ডাক্তার। ঠিক নিবারণ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। তখন বিকেল বেলা। সন্ধ্যার ধূসরতায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বক্তৃতা আরম্ভ করলেন দৃঢ় প্রত্যয়িত কণ্ঠে। সে কণ্ঠস্বরে গ্রামের বাতাসটা যেন

শিউরে উঠল। সে শিহরণ নিবারণ বিশ্বাসের অন্দর মহলে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে জ্যোৎস্নাময়ীর নান্দের দশা। পবিত্র হবার নেশায় মত্ত। প্রভু যীশুর পায়ে শুধু প্রার্থনা—সব পাপ—চিন্তা দূর করে দেবার। সে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। শিউরে উঠল। সব তন্ময়তা ব্যর্থ হয়ে গেল তার। জানলার কাছে উঠে এল। কি আশ্চর্য! জ্যোৎস্নাময়ীর অবাক লাগল। ডাক্তার সেবার কথা বলছেন—ঈশ্বরীয় প্রেমের কথা—মিশন যা বলে।

জ্যোৎস্নাময়ীর মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢোকেনা। জটিল চিন্তার জট মাথায় নিয়ে জানলা থেকে নিজের আসনে ফিরে এল। হতাশায়, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। একি পরীক্ষা তার সামনে!

আর একজন। ঠিক এই সময়েই একই রকম হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ মণ্ডল। অরুণ ঘোষের শ্বশুর বাড়ি আসছিলেন। মোড়ের মাথায় পৌঁছবার আগেই ডাক্তারের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা শুনে পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, মনে জেগে উঠেছে নানা প্রশ্ন। ওখানে ডাক্তার আছেন। আছে গ্রামের জনসাধারণ। বক্তৃতা শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ঠিক এই সময় যদি তাঁকে দেখে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আগুনে ঘি পড়বে। প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠবে সবাই। জমিদার, জমিদার যাচ্ছে—। তারপর হয়ত গতিবিধি লক্ষ্য করবে। অনুসরণ করবে। আগে শান্তির সময়ে অরুণের বৌকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। আজ হট্টগোলের সুযোগে হয়ত সেই সাহসই প্রবল হয়ে উঠবে ওদের মধ্যে। নিশ্চয়ই উঠবে। ওরা ছাড়বে না। লক্ষ্মণ মণ্ডলের অপরাধী মনে এমনতর অনেক চিন্তার ঝিলিক খেলে গেল। আর তারই ফলে হতাশা, অসহায়তার বশবর্তী হয়ে পিছন ফিরলেন তিনি। অরুণের শ্বশুরের কাছে যেতে আর ঠিক মন উঠল না। কেমন যেন একটা ছম্‌ছমে ভাব মনের ভিতর জমে উঠল। সেইসঙ্গে বিরক্তি। সেই বিরক্তির জ্বালা নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল দাদার ওপর। শুধু দাদা—দাদার জন্যেই যত অশান্তি।

যত ঝামেলা। না, দাদার আর কোন মতামত যুক্তি, পরামর্শ অনুরোধ কিছুই তিনি শুনবেন না।

ঠাকুর বাড়িতে চালের দোকানে বেচাকেনা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। রামবাবু আর হাবুল কর্মকার মুখোমুখি বসে। শলা-পরামর্শ চালাতে ব্যস্ত। সামনে লণ্ঠনটা জ্বলছে।

লক্ষ্মণ মণ্ডল সেখানে এসে ঢুকলেন। রামবাবু চম্‌কে উঠলেন। এ কি অস্বাভাবিক, উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি ভাইএর! কি হয়েছে!

কিছু জিগ্যেস করার আগেই লক্ষ্মণ মণ্ডল তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করে দিলেন। দাদা, বিলে আর পাট রাখতে হবে না। তুলে ফেল। আর তুমি যদি তুলতে রাজী না হও আমিই কালকে সব পাট তুলে ফেলব। আর আজ আমি বলচি, এখানে আমি কোন ব্যবসা করব না। কিছুতেই না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি কর। আমার টাকা আমি তুলে নিয়ে শহরে চলে যাব। শিগগিরই যাব। কয়েকদিনের মধ্যেই।

ঘরখানা থমথমে হয়ে উঠল। কার মুখে কথা নেই। চরম আকস্মিকতায় স্তব্ধ পরিবেশ।

কেবল বাইরের অন্ধকার উঠোনে অরুণ ঘোষ বসেছিল। বসে বসে দুর্যোগের সম্ভাবনার কথা ভাবছিল। কি যে হবে? হয়ত মারামারি করতে গিয়ে মরতে হবে। হয়ত সব সাধ-আহ্লাদ মিটবার আগেই তারা নুলোর দশা হয়ে যাবে। বৌত সেই ভয়ই করেছে। বৌএর টানা টানা চোখ দুটো কেমন হয়ে গিয়েছিল ভয়ে—চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল। এ চাকরী ছাড়ার জন্যে কত কাকুতি মিনতি তার—

অরুণ ঘোষের চিন্তা চম্‌কে উঠল ভিতরে লক্ষ্মণ মণ্ডলের কথা শুনে। লক্ষ্মণ মণ্ডলের শেষ সাফ কথা কানে আসতেই সে লাফিয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যেও যেন তার চোখ দুটো মুক্তির আলোয় ভরে গেল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ঠাকুরের মন্দিরের দিকে মুখ করে। মাটির সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরকে প্রণাম জানাতে লাগল। হে ঠাকুর, হে দীনবন্ধু, দীননাথ দয়াল হরি, তুমি আছ, সত্যি সত্যি, ঠাকুর—।

ভাইএর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কথাই বললেন না রামবাবু। তবে সে রাত্রেই শয্যা নিলেন।

সকালবেলা খুকু একটু অবাক হল। বাবা শয্যায় কেন এখন অবধি? এমন কাজ ত তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি ত ভোর থাকতে বেরিয়ে যান। দুপুরে খেতে আসেন। আর রাতে খেয়ে দেয়ে যে একটু ঘুমান। এই ত বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক। আজ তার ব্যতিক্রম?

খুকু বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিছানার পাশে বাবার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, বাবা—

রামবাবু তাকালেন।

তোমার অসুখ করেছে?

হ্যাঁ। শরীরটা খুব ভাল লাগছে না।

খুকু বাবার মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, গা ত ঠাণ্ডাই আছে। কি অসুখ হয়েছে?

রামবাবু চম্‌কালেন। চোখ মেলে চারিদিকে তাকালেন। না, চোখের সামনে কোন গ্রাম নেই। গ্রামের লোকজন, পারিষদ কেউ নেই। শুধু তাঁরই ঘরের চারটে নিরেট দেওয়াল পাঁচিলের মত খাড়া। যেন তাঁর নিরাপত্তার প্রতীক। আর তাঁর মেয়ের হাতের স্পর্শ মাথার চুলের মধ্যে শিহরণ আনছে।

মেয়ের হাতখানা টেনে নিলেন কাছে। আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, জানিস্ খুকী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-দাদা কেউ কিছু নয়। সব শত্তুর। বিশ্বাসঘাতক। এ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

খুকী এসব উক্তির অর্থ বুঝল না। কিন্তু খুশী হল। বাবা যে-বর্হিজগতের টানে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ান, আজ তাদের ওপর বিতৃষ্ণা এসেছে। আজ বাড়ির বাইরে না গিয়ে ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। তার নাগালের মধ্যে।

খুকু খুশী হবে বৈকি।

খুকুর খুশী হবারই কথা। বাবাকে কাছে পেয়েছে। একটা আশ্রয় মিলেছে যাহোক। না হলে এক মহাশূন্যতার মধ্যে পড়ে তার

প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে জমিদার বাড়ির মেয়ে। পাড়াবেড়ান তার পারিবারিক রীতি বিরুদ্ধ। নিষিদ্ধও। জমিদার বাড়ির বৌ ঝি কারও সঙ্গে মিশবে না। হারেমে থাকবে। সে কাজ কর্ম থাকুক আর না থাকুক। এর মধ্যেই বংশ কৌলিন্য ছড়িয়ে আছে; বংশমর্যাদা। এই বাধা, এই গণ্ডীই ত কৌলিন্যের অস্তিত্ব চিহ্ন। একে উপেক্ষা করার পিছনে যত মানবিক যুক্তিই থাক, তবু সে ঐতিহ্যহন্তার পাপে পাপী হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। খুকু কলকাতায় পড়াশুনা করেছিল। তবু এ গ্রামে এসে এ বাড়ির জল হাওয়াতেই মিশে গেছে। কারণ তার আজ মনে হয়, কলকাতার শিক্ষায় ছিল তার পোষাকী সত্য। আর তার নিজের ঐতিহ্য ত তার আপন বংশধারা। তাকেই মেনে নিতে হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশধারা বলে। এ বাড়ির মধ্যে যেটুকু স্ফূর্তি হয় জীবনের তাই তার প্রাপ্য। মাঝে মাঝে দেউড়ি পেরিয়ে জীবনের স্পর্শ আসে। দমকাহাওয়ার মত আসে। চলেও যায় দমকার মতই। আশার আলো যেটুকু জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎচমকের মত অন্ধকার ছড়িয়ে যায় তার বহুগুণ। সুকুমার এসেছিল। দারোগাবাবুর শ্যালক আর তার স্ত্রী এসেছিল। সবাই চলে গেছে। সে আবার একা। নিঃসঙ্গ। অথচ সে যৌবনবতী। যৌবন চায় সঙ্গী। না, বাবা তার যৌবনসঙ্গী নয় বটে। তবু তাঁকে ঘিরে যে ব্যস্ততা গড়ে তোলা যাবে তাতে অন্তরের অতৃপ্তিকে ভরিয়ে রাখা যাবে অনেকখানি। খুকু তাই খুশী হল।

রামবাবু সেদিন আর শয্যাত্যাগ করলেন না। অসুস্থতা ঘোষণা করলেন।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুকু ক্রমে সমস্ত ঘটনাই শুনল। শুনে আরও খুশী হয়ে উঠল। মনে মনে বললে, হে ভগবান, ঠিক করেছ। প্রার্থনা করতে লাগল, আরও সর্বনাশ করে দাও, আরও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দাও এমনি ধারা। বাবাকে যেন এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারি।

রামবাবু সারাদিন ঘরে শুয়ে। বসে। খুকু বাবাকে এমন করে কাছে পায়নি কোন দিন। বাবার সেবায় সে উঠে পড়ে লেগে গেল।

আর আশ্চর্য কাণ্ড। পরিবেশ, পরিস্থিতি কি অবাককাণ্ডই না

করে। চার দেওয়াল ঘেরা ঘরে বসে রামবাবু মেয়েকে দেখতে দেখতে যেন এক নতুন আবিষ্কার করে ফেললেন।

খুকুকে নতুন করে দেখলেন। যেন এই প্রথম দেখলেন। এতবড় হয়েছে! ঠিক ওর মার মত! রামবাবু চম্‌কে উঠলেন। তাঁর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ-এর অন্তরাত্মা একযোগে যেন ডুকরে উঠল।

সন্ধ্যাবেলা মেয়েকে কাছে ডেকে হাত ধরে বলে উঠলেন, মা, আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই। তোরও একটা হিল্লে করতে পারিনি এ্যাদ্দিন। এবার একটা ভাল ছেলে দেখে জামাই করে, তার কাছে চলে যাব তোকে নিয়ে। আর এসব ভাল লাগেনা।

খুকুর কানে যেন কথাগুলো ঠিক পৌঁছতে পারছেনা। তবু ওর দেহ মন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যাক, এ গ্রামের সব সম্পদ ওদের চলে যাক। এ গ্রাম থেকে বাস উঠে যাক। যত অমঙ্গল আছে, রাতারাতি নেমে আসুক, যাতে তাড়াতাড়ি বাবাকে নিয়ে পালান যায়। না, বাবাকে আর কোন পিছুটানের মধ্যে পড়তে দেবে না সে।

শয্যাশায়ী রামবাবুকে খুকু আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরল।

রামবাবু শয্যাশায়ী। তিনি শয্যা নিয়েছেন। তাই বলে কি বন্দীপুর ইউনিয়ন শয্যা নেবে? বরং তার প্রতিক্রিয়ায় আর আনন্দে সমস্ত অঞ্চলটা নতুন করে জেগে উঠল। হাল আমলের ইতিহাসে ত এমন ঘটনা ঘটেনি। দেশের সাধারণ মানুষ আর এক বহিরাগত ডাক্তারের ভয়ে মাথা নত করলেন জমিদার রামবাবু।

তাই যখন সমস্ত অঞ্চলজুড়ে সবাই প্রত্যাসন্ন বিপদের আশংকায় অভিভূত, তখন এক সকালে জমিদারের পক্ষথেকেই বিলের পাট তোলা আরম্ভ হয়ে গেল দেখে আন্দোলনকারীরা পর্যন্ত হতচকিত হয়ে পড়েছিল। এও সম্ভব! তাহলে আন্দোলন সমাপ্ত এখানেই? সাফল্যের মধ্যেই?

বিলের জল থেকে পাট উঠছে। আশাতীত আনন্দে আন্দোলন-কারীরা আত্মহারা হয়ে উঠল, নতুন ধ্বনি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল, ডাক্তারবাবুকি—জয়।

স্বাধীন ভারত—জিন্দাবাদ।

নিশ্চয়, নিশ্চয় দেশ স্বাধীন হয়েছে। নাহলে জমিদার হেরে যেতনা কখনো। আন্দোলনকারীদের দৃঢ় বিশ্বাস। তারা গলা ফাটিয়ে ধ্বনি দিতে লাগল, স্বাধীন ভারত—জিন্দাবাদ।

ডাক্তারবাবুকি—জয়।

হ্যাঁ। ডাক্তারবাবুর জন্যেইত এত কিছু হল। তারা ডাক্তারকে ঘর থেকে টেনে বার করে আনল। কলকাতা শহরের মত ফুলের দোকান নেই, ফুলের মালা নেই। মঞ্চ তৈরী করে সভা করবার মত অর্থ শক্তিও নেই অসহায়, নিরক্ষর গ্রামবাসীর। কিন্তু তাদের আছে, হৃদয়ের উত্তাপ, আবেগ, বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতাবোধ। তাই-ই উজাড় করে দিতে লেগে গেল তারা। ডাক্তারই ত অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছেন। এ দেবতা, মাথার মণি, ভগবান পাঠিয়েছেন।

দেবতাকে কেউ হাঁটায় না। ডাক্তারকে কাঁধ থেকে নামাতে চায় না তারা কিছুতেই।

রামবাবু শয্যাশায়ী। ঘরে বন্দী চার দেওয়ালের আড়ালে।

কিন্তু হাবুল কর্মকার উত্তেজিত, অপমানবোধে আচ্ছন্ন না হয়ে পারল না। কেন, কেন রামবাবুর পিছনে চলে এ অবস্থাকে মেনে নিতে হবে? কেন তারা নিজের স্বার্থ চিন্তা করবে না? স্বার্থ চিন্তা কোন মানুষ করে না? ওই রাম মণ্ডলের পূর্বপুরুষ অজয় মণ্ডল ছিল ভূষিমালের কারবারী। তার থেকে হল নীলসায়েবের গোমস্তা। নিজের স্বার্থ ত তখনই গুছিয়ে নিল। যদি পাঁচ জনের ভালো দেখতে যেত, লোকলজ্জা নিয়ে বসে থাকত তাহলে আর এ মানী জমিদার বংশ তৈরী করে দিতে পারত না।

মানব সমাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাই ত বর্তমানে চলতে সাহায্য করে। অজয় মণ্ডলের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে হাবুল কর্মকার রহিম সেখের কাছে ছুটে গেল।

রহিমও ওই রকমই কিছু একটা ভাবছিল। কিন্তু সে এককালে লীগ নেতা ছিল। লীগ পাকিস্থানে চলে গিয়েছে। কাজেই সে

রামবাবুর সমর্থক হয়েছিল। রামবাবু নেতা। কিন্তু দেশের লোক তার বিরুদ্ধে। রামবাবুকে হারিয়ে দিচ্ছে এখন তারা। রামবাবু মরে যাচ্ছে। এখন কি করবে? কার দলে যাবে? স্বার্থক্ষুন্নতার বেদনা নিয়ে রহিম সেখ তাই ভাবছিল।

ঠিক সেই সময় হাবুল কর্মকার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি যেন বুকে অনেকখানি বল পেয়ে গেল রহিম সেখ। হাবুল কর্মকারের হাত চেপে ধরল। ক্ষোভে বলে উঠল, বল, ভাই, তুমিই বল আমার মনের কথাডা। আমার সব্ব অঙ্গ জ্বলে যাচ্চে। জ্বলতে জ্বলতে শ্বাষে ভস্ম হয়ে হিম হয়ে যাচ্চে যেন। দিনে ভাবনার কূল নেই। রাতে চোকে ঘুম নেই। শুধু ভাবনা—রামবাবু আমাদের কি করল?

হাবুল কর্মকারের মুখে হাসি নেই। ক্রুর মুখভঙ্গী করে বললে, সেই জন্যেই ত একটা ঠিক করতে এলাম। জমিদার মরতে পারে। তার ভিমরতি হতে পারে। তারা ভাইএ ভাইএ যাখুশী করতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমরা মরব কোন দুঃখে? আমাদের কি? আজ এদিগর ডাক্তারকে নিয়ে মেতে উঠেচে। ডাক্তার বলে বেড়াচ্চে এখানে আলাদা ডাক্তারখানা খুলে বসবে। তার মানে আমাদের বাস তুলতে হবে। তাই রামবাবুকে একবার বলা দরকার। তিনি না পারেন, আমরাই বাধা দেব। তিনি পথ ছেড়ে দিন।

ঠিক, ভাই ঠিক। রহিম সেখও এটাই চায়। রামবাবু ব্যবসা না করেন, কত্তা না থাকেন ত আমরাই করব সব।

নিশ্চয়। তাই বলে দেশের, গাঁয়ের-মাথার ওপর ও বারোয়ারী ছাতা তুলতে দেব না। তার দৃষ্টি ছুটতে আরম্ভ করল রামবাবুর ব্যবসার মুনাফার অলিগলি পথ ধরে। ওইগুলো নিতে হবে। সব নিতে হবে—।

রামবাবু শয্যাশায়ী। খুকুও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল বাবার মনকে একেবারে নিজের বশে নিয়ে গিয়ে ফেলতে। বাইরের কোন সংবাদই আর বাবার কানে পৌঁছে দিতে রাজী নয়। কিন্তু সরকারী চিঠি এসে হাজির। জরুরী চিঠি। সেটা না দিয়ে পারা যায় না।

আর রামবাবু সে চিঠি পড়েই উঠে বসলেন বিছানা থেকে। সরকার থেকে জানিয়েছে, আবার পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ করেছে দলে দলে। সীমান্ত পেরিয়ে সব হাঁটা পথেই আসছে। কাজেই বে-সরকারী রিলিফ কমিটির হাতে যে টাকা আছে, অফিসার গেলেই সেটা যেন দিয়ে দেওয়া হয়।

রামবাবু বিপন্নবোধ করলেন। সেদিন উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে ধার দেওয়া টাকা আদায় করে নিয়েছেন। সে সব টাকা আবার ফেরৎ দিতে হবে? টাকা ফেরৎ দিতে হবে? টাকা—টাকা—টাকা—

রামবাবু ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন। ঠাকুর বাড়ির উঠোনে এসে প্রথম দেখা হল জীবনের সঙ্গে। আরও কয়েকজন উদ্বাস্তু দাঁড়িয়ে। তাদের দর্শনমাত্র রামবাবুর সমস্ত বিপন্নতা উত্তেজনায় পরিণত হল।

জীবন ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছিল। রামবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমরা হাসছ? লজ্জা করে না? পাকিস্থানে তাড়া খেয়ে হিন্দু সব আবার পালাতে আরম্ভ করেছে। আর পালিয়ে এসে যত রোকরাক সব আমাদের ওপর। এই ত একদল এসেছে, এসে মোচলমানের সঙ্গে মিশে এখানে হিঁদুর সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে। কই সেখান থেকে যে মোচল-মানের ভয়ে পালিয়ে এলে, এখানে এসে সেই মোচলমান জাতের লোকদের তাড়িয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারছ না?

একজন উদ্বাস্তু বললে, তাহলে আপনারাই যে পিছনে লাগবেন। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

রামবাবু খিঁচে উঠলেন আবার। ওসব বাজে কথায় কাজ নেই। পারবে মোচলমানদের তাড়াতে? তাহলে আমার কাছে জমির জন্য, দুমুঠো চালের জন্যে ধন্না দিতে হবে না। সরকারী লোনের জন্যে হা পিত্যেশে বসে থাকতে হবে না। পারবে এমন মরদের বাচ্চা হতে?

আর আস্ফালন করা হল না রামবাবুর। হাবুল কর্মকার আর রহিম সেখ এসে হাজির হল। হাবুল কর্মকার বললে, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তাই রহিম ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম।

রামবাবুর ইচ্ছে করছিল রহিমকে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে

ঘরে তোলার। কিন্তু সামনে উদ্বাস্তুরা দাঁড়িয়ে। তখনও তাঁর আস্ফালনের উত্তাপ বাতাস থেকে কাটেনি। কাজেই শুধু শান্তস্বরে বললেন, এস।

তিনজনে আড়ৃত ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন। গোপন বৈঠক। এ অঞ্চলের তিন জন মাতব্বরের বৈঠক।

রহিম সেখ প্রাক্তন নেতা। সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বার্থচিন্তা বেশি। রামবাবুর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তার কৌতূহল এবং চিন্তা তীব্র।

আর হাবুল কর্মকার রামবাবুর নিত্য-সঙ্গী প্রায়। মন্ত্রণাদাতা। সে রামবাবুর সুখ-সুবিধার নাড়ীনক্ষত্র জানে। রামবাবু রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালে সে সেইস্থান দখলে সচেষ্ট হবে না কেন? অমনি করেই ত মানুষ বড় হয়। এগিয়ে চলে।

বৈঠক বসল, রহিম সেখ বললে, দাদা, আপনি এমন করবেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

হাবুল কর্মকার বললে, ওঃ, তার ফলে গাঁয়ের সব নাড়াবুনেদের কি মদ্দার্নিই হয়েচে। যে লোক আগে দেখা হলে তফাৎ দিয়ে যেত, এখন তারও ফুটফুটানি কত।

রহিম বললে, হ্যাঁ, বড্ডা জোর পেয়েচে সব। কেন্তুক এখনও সময় আছে। এখনও মাথাতুলে দাঁড়ালেই আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দাদা, আবার নেগে পড়ুন। নাহলে, আপনি সরলে আমাদেরও সরতে হবে এখান থেকে।

তা সত্যি। হাবুল কর্মকার মন্তব্য করল।

রামবাবু চিন্তিত। দ্বিধায় আচ্ছন্ন। এমন বিপদে কখন পড়েননি। এদের দুজনের কাছে মনের কথা বলতে লজ্জা নেই। ধীরে ধীরে বললেন, দেখ, নিজের জন্ম ভিটে, বিষয় সম্পত্তি কে ছাড়তে চায়? কিন্তু ঘরে যদি বিভীষণ জন্মায় তবে সোনার লঙ্কাও ছারখারে যায়।

হাবুল কর্মকার বললে, তা ঠিক। তবে বিভীষণের ভয়ে রাবণ কিন্তু পালায়নি। বীরের মতই মরেচে। নাহলে রাবণের নাম থাকত না রামায়ণে। কাজেই আপনার সরে দাঁড়ানটা ভাল হচ্ছে না।

কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ? রামবাবু বেদনার্ত স্বরে প্রশ্ন তুললেন, এখানে থাকতে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া ত থাকা যাবে না। ভাইএর টাকা ভাই নিয়ে নিল। বাধা দিতে পারতাম। কিন্তু ঘেন্না হল। কোনকালে ভাবতেও পারিনি ভাই এমন করবে। বংশের রক্ত ওর শরীরে। তবু ও অন্যরকম হয়ে গেল। এখন টাকা—টাকার দরকার। টাকা নাহলে কি দিয়ে কি করব ? টাকা কিছু পেলে আবার দেখতাম, সকলকে দেখে নিতাম।

রহিম সেখ আর হাবুল কর্মকার পরস্পরের দিকে তাকাল একবার। তারপরই হাবুল কর্মকার বলে উঠল, টাকার অভাব কি ? টাকা জোগাড় করে দেওয়া যায়।

রহিম সেখ আরও দৃঢ়স্বরে বললে, হ্যাঁ, আপনি যদি এদিকে মতি ফেরান তাহলে টাকা আমিও দিতে পারি।

রামবাবু সেই মুহূর্তে যেন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলেন। খাড়া হয়ে বসে বললেন, বেশ। টাকা দাও তোমরা তাহলে। দু'বছরের কড়ারে ধার দাও। দু'বছরের আগেই শোধ করে দেব। সুদ যা চাও তাই দেব।

হাবুল কর্মকার আর রহিম সেখ আবার পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

তারপর হাবুল কর্মকার রামবাবুকে বললেন, না, ধার, সুদ, ওসবের মধ্যে যাওয়ার দরকার কি ? ব্যবসায় টাকা ঢেলে সমান অংশীদার হয়ে কাজ করাই ত ভাল।

রহিম সেখ আর একটু উদারতা দেখিয়ে বললে, আমি তিন ভাগের একভাগ লাভ নিতে রাজী আছি, যদি বডারের ব্যবসাটা আরও জাঁকিয়ে করেন।

রামবাবু এক দুশ্চিন্তা থেকে আরেক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। তিনি জমিদার। হাবুল কর্মকার আর রহিম সেখ চিরকাল তাঁর অধীনে হুকুম খেটে এল। আজ অংশীদার হতে চায় সুযোগ পেয়ে। রামবাবু বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি।

ভাবতে বেশ কয়েক দিন লাগল রামবাবুর। অসহায় অবস্থায় ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুশ্চিন্তা নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ জনের সঙ্গে মেলা মেশা, কথা বলা প্রয়োজন।

কিন্তু খুকু হতাশ হয়ে পড়ল আবার। বাবা আবাব অন্যমনা হয়ে যাচ্ছেন। আগের মতই বাইরে ছুটতে আবম্ভ করেছেন। তাকে ভুলে যাচ্ছেন, তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন।

খুকু মনে মনে অনেক চিন্তা করল। বাবা একবার তার কাছে এসে আবার ফিরে যাবেন? না, তা সে হতে দেবে না। বাবাকে আঁকড়ে ধরবেই। একদিন সে স্থিব সিদ্ধান্তে এল, আজ রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেই কথা তুলব। তারপর জোর করে বাবাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। আব কোন ব্যবসা বাণিজ্য কিছুতেই করতে দেব না এখানে। কোন মন্ত্রণাদাতার সঙ্গে মিশতে দেব না।

সে রাতে খুকু প্রতীক্ষায় ছিল। রামবাবুর ফিরতে দেরী হল। প্রায় বারটার সময় ফিরলেন। ফিরেই বললেন, খুকু, খেতে দে।

খুকু বাবার ভাত ঘরে এনে ঢেকে রেখেছিল। ঘরে গিয়ে সেগুলো সাজাতে বসল। রামবাবু ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলেন।

হঠাৎ সে-সময় বাইরে কে ডাকল, বাবু—

রামবাবু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খুকুর কেমন যেন মনে হল। এক অজানা আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠল। সেও বাবার পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা শুনে বুঝল কলোনীর লোক এসেছে। তারা বলছে, বাবু, আপনি এলেন আর তারপরেই মাঠের ওপর লণ্ঠন হাতে স্থকুমারবাবু, ভূপালবাবু, উপেন শিকদারবাবু এসে হাজির। সব ধরা পড়েছে। বিঘে ভুঁই কাটা হয়েছিল—ঠিক সেই সময়—হুজুর—আপনি শিগ্‌গির আস্থন—।

খুকু ভাবছিল বাবাকে গিয়ে বাধা দেবে যেতে। রামবাবু তার আগেই বেরিয়ে গেলেন। খুকুর চোখে জল ভরে এল। তার বাবা, আবার—আবার হারিয়ে গিয়েছে—।

পরদিন পনেরই আগষ্ট। কলোনীতে স্বাধীনতা উৎসবের আয়োজন হয়েছে। তার ব্যবস্থাদি করে অনেক রাতেই সুকুমার ফিরেছে। তারপর খেয়ে দেয়ে সবে শুয়েছে। ঠিক সেই সময় কলোনী থেকে দুজন লোক এসে হাজির।

ডেকে তুলে বললে, হুজুর, কাল যদি দারোগা আসে, বলবেন, আমরা ও দলে ছিলাম না।

তার মানে? সুকুমার অবাক হ'ল।

ওরা বললে, ভণ্ডুল চক্রবর্তীর দল রামবাবুর কথায়, কলোনীর পাশের জমির ধানগুলো কেটে ফেলেছে।

সে কী! সুকুমার যেন আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গী করল। ওরা আর কথা বাড়াল না। চলে গেল। সুকুমারই বা দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে। ভূপালবাবুকে ডেকে তুলল। তারপর আলো হাতে নিয়ে কলোনীর দিকে ছুটল।

সত্যি। সত্যিই। ওরা পৌঁছে দেখল তখন ধান কাটা চলছে। ধানগুলো প্রায় পেকে উঠেছিল। বেচারী সামাদের কত শ্রমের, কত আশার, কত প্রয়োজনের ফসল। সুকুমারের সবচেয়ে বড় আপশোষ তার কলোনীর লোক এমন কাজ করল বলে। সে বার বার সামাদকে অভয় দিয়েছিল। কথা থাকল না। কাল স্বাধীনতা উৎসব। জাতীয় পতাকা উঠবে। তারই মধ্যে কেঁদে উঠবে একটা অসহায় পরিবার। অন্যায়ের ঘোষণা হবে স্বাধীনতা উৎসবের দিন।

চোর ধরা পড়ে গেল। হাতে নাতে ধরা পড়ল। সাক্ষী রেখে দিয়ে সুকুমার ফিরে গেল। ভূপালবাবু বাড়ির ভিতরে চলে গেছেন। সুকুমার তারপরেও বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। নিশুতি রাত।

হঠাৎ তার মধ্যে রামবাবুকে আসতে দেখে সুকুমার প্রথমে চমকে উঠল। রামবাবু নিজেই এসময় আসবেন সে আশা করেনি। সেই ঠাকুরমন্দির থেকে আসার পর থেকে ত সে শত্রু। বাক্যালাপ নেই।

রামবাবুই কি আসতেন? কলোনীর মানুষগুলো সব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, তাই তাদের দলে টানবার জন্যে উত্তেজিত করেছিলেন,

পাকিস্থানের হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার কথা বলে। উৎসাহিত করে আবার নিজের নেতৃত্ব ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ হাতের কাছে সামাদের জমি পেয়ে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এমন হবে কে জানত।

তাই নিরুপায় হয়েই নিশুতি রাতে রামবাবু সুকুমারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পাশে বেঞ্চি পাতা ছিল। সুকুমার বসতে বলল। রামবাবু তার ওপর বসলেন। তার পরই বললেন, ওরা নাকি কি সব করে বসেছে? আর আপনি নাকি ধরে ফেলেছেন? তাই এত রাতে বেটারা আমার কাছে গিয়ে হাজির। বলছে, আমরা অনুতপ্ত। ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছি। পাকিস্থানের হিন্দু ভাইয়ের ওপর যে ব্যবহার করছে, তা শুনে মাথা খাবাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই। এখন ওরা খুবই লজ্জিত। এমন কি আপনার সামনে অবধি আসতে পারছে না। তাই আমাকে আসতে হ'ল।

রামবাবু একটু থামলেন। হাসবার চেষ্টা করলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, যা হবার হয়ে গেছে। ওরা আপনার কলোনীর লোক। ও নিয়ে আপনি আর কিছু করবেন না। থানায় রিপোর্ট দেবেন না।

সুকুমার একটু বিপন্ন বোধ করল। একটু ভাবল। শেষে বললে, যার জমি যার ধান সে যখন থানায় জানাবে তখন কি বলব আমি? তাছাড়া অনেক সাক্ষী রাখা হয়েছে। তারাই ত ফাঁস করে দেবে।

সে দায়িত্ব আমার। রামবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, সাক্ষীর মুখ বন্ধ করে দেব। আর ও সামাদ বেটাত দুই ধমকের ইয়ার। ওর জন্যে ভাববেন না।

সুকুমারের মনে পড়ল সামাদের করুণ মুখখানা। রামবাবুর কথা-গুলো ভাল লাগল না। বিরক্তিকর। সুকুমারের কেমন অসহিষ্ণুতা দেখা দিল। সে বলে উঠল, না, ওসব গোপন করার পক্ষপাতী আমি নই। আমাকে থানায় জানাতেই হবে।

জানাতেই হবে? রামবাবু খানিক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সুকুমারের দিকে। তারপর এক সময়ে অনুরোধ থেকে শাসনের সুর

বেজে উঠল তাঁর কণ্ঠে, আজো আপনার সংশোধন হ'ল না? কপালে নেহাৎ দুর্ভোগ দেখছি। বিদেশ বিভূঁই জায়গা, একলা রাত বিরেত—

আর কথা শেষ হল না রামবাবুর। কথা, চীৎকার শুনে বাড়ির ভিতর থেকে ভূপালবাবু উঠে এসেছেন, কেউ দেখেনি। এবার সহসা বারান্দায় উঠে রামবাবুর সামনে দাঁড়ালেন। কি হয়েছে? ভয় দেখাচ্ছেন? অন্যায় করে আবার চোখ রাঙাচ্ছেন? এসব ত আপনিই করেছেন।

আমি? রামবাবু আঁৎকে উঠলেন অমনি। তুমি কি বলছ ভূপাল?

ঠিকই বলছি। আপনারই লোকজন বলেছে। তারাই সাক্ষী দেবে।

সাক্ষী দেবে। আরও অনেক, অনেকখানি বিপন্নবোধ করলেন রামবাবু। কেমন অসহায়ের মত ক'বার বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা—। তারপর বারান্দা থেকে নেমে পড়লেন। নিশুতি রাতের অন্ধকারের মধ্যে যেন ছুটে গিয়ে মিশিয়ে গেলেন পরক্ষণেই।

বাড়িতে খুকু ভাত নিয়ে বসে ছিল চুপচাপ। দুশ্চিন্তার পাষাণভার নিয়ে বাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। রামবাবু প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন। খুকুকে দেখেই মনের সমস্ত হাহাকার ডুকরে উঠল, সব—সব শত্তুর। দুনিয়ায় কেউ কারও নয়। সব দেখলাম। আপন ভাই—হাতে করে মানুষ করলাম—তাকে দেখলাম। জামাইকে দেখলাম। অফিসার—ভদ্দর লোক, বিদ্বান—সব দেখলাম। নেমক-হারাম, সব—সবাই—

খুকু ছুটে এসে বাবার হাত চেপে ধরল। তার বাবাকে সে এর আগে এত ক্লান্ত, এত অসহায় আর কখনো দেখেনি।

সুকুমারের চোখেও ঘুম আসেনি সারারাতের মধ্যে। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। তাও বেশিক্ষণ টিকল না শেষ পর্যন্ত। বাইরের বারান্দায় কার পায়ের শব্দ হতেই আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। পরক্ষণেই দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ হল। কে ডাকছে। তখনো ভোর হয়নি—চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে। এখন কে ডাকছে? রামবাবুর

সেই রাতের ধমকানির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বললে, কে ?

আমি। একটা মৃদু অস্পষ্ট উত্তর এল। সুকুমারের কেমন যেন মনে হল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই খুকু ভিতরে ঢুকে পড়ল।

খুকু ! এই রাতের অন্ধকারে, তার ঘরে ! সুকুমার ভেবে উঠতে পারে না। শুধু বললে, আপনি ?

খুকু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি আপনার কি করেছি ?

সুকুমার স্তব্ধ। খুকুই বললে, আমার কি অপরাধ ? কি জন্যে আমাকে এমন করে জব্দ করতে চাচ্ছেন ? বাবাকে পর্যন্ত জেলে পুরবেন, পুলিশের হাতকড়ি লাগাতে যাচ্ছেন—আর বলতে পারল না খুকু। কেঁদে ফেলল।

স্তব্ধ, আরও স্তব্ধ সুকুমার। অপ্রতিভের একশেষ। খুকু ওর ঘরে এসে কাঁদছে। কারণ স্পষ্ট। বিপন্ন বাবাকে উদ্ধারের জন্যে এসেছে সে।

এই মুহূর্তে সুকুমারও আত্মদুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। সে যুবক। তার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছে খুকু। না, যৌবন কখনো প্রত্যাখ্যান করতে, কাউকে বিমুখ করতে জানে না।

সুকুমার ভোরবেলা উঠেই কলোনীর মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। পনেরই আগষ্ট। স্বাধীনতা উৎসবের দিন। পতাকা উত্তোলনের আয়োজন হয়েছে কলোনীতে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রামবাবুই পতাকা উত্তোলন করবেন, ঠিক হয়েছিল। তারপর এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এখন কি পরিণতি হবে কে জানে। তবে সুকুমারকে এখন চেষ্টা করতেই হবে আপোষ-মীমাংসার। শান্ত পরিবেশ, সুষ্ঠু ভাবে উৎসব সম্পন্ন করবার জন্যে।

কলোনীর পাশেই সামাদের ধান খেত। সেখানে সেই কাটা ধানগুলো পড়ে আছে। ছড়িয়ে। সুকুমার কলোনীতে আসতেই উদ্বাস্তুরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ওই ধানকাটার কথা সকলের মুখেই। সুকুমারের চেষ্টা মীমাংসার, শান্তি স্থাপনের। তারই সুর ওর কথায়।

ধানকাটার খবর বন্দীপুরের বাইরেও চলে গেছে ভোরের আগেই।

খানিক পরেই সামাদ আর জাবেদা ছুটে এল। তার পিছনে দল বেঁধে আসতে আরম্ভ করল ওদের গ্রামের লোকজন। প্রতিবেশী দল।

জাবেদা ছুটে গেল। কাটা ধানগুলোর ওপর আছড়ে পড়ল। সেগুলোকে সন্তানের মত বুকে জড়িয়ে ধরে মরা-কান্নার সুরে কেঁদে উঠল। ভোরের বাতাস বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার করুণ মূর্চ্ছনায়।

সামাদ এসে সুকুমারের সামনে দাঁড়াল। ক্ষুব্ধ বেদনার্ত কণ্ঠস্বর তার।—হুজুর, দেখলেন ত? কদ্দিন বুলেলাম, আমার বড্ডা ভয় করে। আপনি সাহস দিয়ে বুললে, না, তা হবে না। কেন্তুক—

সুকুমার বিচলিত হয়ে পড়ল। তাকে যেন অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। ভোর রাতে খুকু এসেছিল তার কাছে। মনের অবস্থা পাল্টে গিয়েছিল। যাতে একটা আপোষ-মীমাংসা হয় তার ব্যবস্থা করার সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু সামাদের উক্তিতে সে সংকল্প যেন আবার বানচাল হয়ে গেল মুহূর্তে। সে বলে উঠল, সামাদ, তোমাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি, সত্যি কথা। কিন্তু চোর আমি ধরেছি। তাদের বিরুদ্ধে তুমি যে-কোন ব্যবস্থা নাও, আমি তোমার পক্ষে থাকব। সাক্ষী দেব।

সামাদ বললে, হুজুর, আমার সব্বনাশ হয়ে গিয়েচে। প্যাটের অন্নই থাকল না ত নড়াইএর কথা ভাবব কি করে? আমার মাজায় নাটি পড়েচে, এ্যাকুন মাথা তুলব ক্যামন করে?

সামাদ কেঁদে ফেলল। আর কথা বলতে পারল না।

সুকুমার খানিক নীরব থেকে, বললে, তবু ভেবে দেখ। যদি এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে থানা-কাছারী করতে চাও করতে পার। আর তা না হলে তোমরা গরীব মানুষ, অভাবী লোক, আপোষ করে ফেলতে পার। ওরাও আপোষ-মীমাংসা করতে চায়। ক্ষমা চাইতে রাজী। খেসারতও দেবে। রাজী থাকত বল তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই ভাল। ভীড় ঠেলে কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গত রাতে ধান ধরতে আসবার সময় সুকুমার ওঁকে ডাক দিয়েছিল।

উনি ঘরের দরজা খোলেননি। সঙ্গে যেতেও রাজী হননি। আজ সকালে ছুটে এসেছেন। সামাদের ধানখেতে গিয়ে জাবেদার শোকে সান্ত্বনা দিয়েছেন খানিক। তারপর জাবেদাকে সঙ্গে নিয়ে উঠে এসেছেন কলোনীর মাঠে। আপোষের কথায় ভীড় ঠেলে ভিতরে এসে মন্তব্যে মুখর হয়ে উঠলেন, আজ পুণ্য স্বাধীনতা দিবস। আজ আপোষই ভাল। একটা যা-হয় মীমাংসা হয়ে যাক।

জাবেদা বললে, আপনারা সরকারী লোক। যা ভাল বোঝ করে দাও। আমাদের কপাল ত ভেঙেচেই।

সামাদও প্রস্তাবটা মানল। ফলে উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতা নীরব হয়ে থাকল।

পরিবেশের গুণে সুকুমারও আবার আত্মস্থ হয়ে উঠল। আবার খুকুর কথা মনে হতে লাগল। সে এসেছিল আবেদন নিয়ে।

সুকুমার সামাদকে বললে, বেশ, তোমরা বস। রামবাবুকে ডাকাই। আসামীদেরও ডেকে পাঠাই।

কলোনীর মাঠে ভণ্ডুল চক্রবর্তীর দল গুটি গুটি এসে দাঁড়াল। আসামীর দল। নতমস্তক। জনসমাবেশটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু আপোষের কথা হয়েছে। কাজেই আত্মদমনের চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠল।

একটু পরেই রামবাবু এসে দাঁড়ালেন। সারা মুখেচোখে ক্লান্তি আর উদ্বেগের ছাপ।

সুকুমার অভ্যর্থনা জানাল রামবাবুকে, খুকুর বাবাকে। বললে, আসুন, এই গণ্ডগোলটার একটা আপোষ-মীমাংসা দরকার। তাই আপনাকে ডেকেছি। যা হয় করে দিন।

সুকুমারের কথা শুনে রামবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। এটা তিনি কল্পনাও করেননি। সুকুমারের আচরণে একটু স্বস্তি পেলেন। উল্লসিতও হলেন মনে মনে। একটু এগিয়ে এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ভণ্ডুল চক্রবর্তীকে আদেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে ক্ষমা চাও এই সামাদের কাছে।

আসামীরা চোরের ভঙ্গীতেই ক্ষমা চাইল। তারপরেই রামবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সামাদের কাছে গিয়ে তার হাতে চল্লিশটা টাকা তুলে দিয়ে বললেন, সামাদ, নে। ওরা বিদেশী। ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু তোরা-আমরা অনেক কালের পড়শী। কিছু মনে করিসনে।

সুন্দর। অভাবনীয় পরিস্থিতি। সুকুমারের চোখে জল এসে গেল। বেশ হয়েছে পরিণতি। এরপর শুভ স্বাধীনতা উৎসব সুন্দর হবে।

সমাবেশটা তখন যাহোক একটা শান্তির প্রলেপ লাগাচ্ছিল। সুকুমার শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভের ঘোষণা জানাল। আবেগ-গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আজ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। তুলবেন বন্দীপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামচন্দ্র মণ্ডল, আমাদের রামবাবু।

রামবাবু সুকুমারের পাশে এগিয়ে এলেন। পতাকার দড়িতে হাত দিলেন। মেয়েদের শংখ বাজল। হুলু ধ্বনি উঠল। কিছু ফুল ছড়িয়ে পড়ল পতাকা দণ্ডের চার পাশে। দড়ি খুলে, রামবাবু পতাকা তুলতে আরম্ভ করলেন। সুন্দর শুভ পরিবেশ। পতাকা ওপরে উঠতে লাগল। সুকুমার উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম—

অমনি উপস্থিত জনতার একাংশের মনের দরজা খুলে গেল যেন। দুর্লভপুরের জনকয় মুসলমান, খৃষ্টান, আর জনকয় হিন্দু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,

এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়।
চোর-বাটপাড়, মোড়লতন্ত্র—
ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক।

এমন আকস্মিকতায় সুকুমার বিহ্বল হয়ে পড়ল। আর রামবাবু তখন দড়ি টেনে ওপরে তুলছিলেন পতাকা। শেষ পর্যন্ত তুললেন। পতাকা ওপরে উঠে হাওয়া পেয়ে পত্ পত্ করে উড়তে লাগল।

কিন্তু রামবাবু আর সেখানে দাঁড়ালেন না। নীরবে, নিঃশব্দে, সভা ছেড়ে, কলোনী ছেড়ে মাঠের পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর শরীরে আবার সাবেকী রক্ত জেগে উঠেছে। মনে তারই প্রতিক্রিয়া।

এতখানি করবার সাহস পেল ওরা ? বিলের পাট তুলে নেওয়া হয়েছে বলে ? ধানকাটা অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে বলে ? আজাদী অবধি ভুয়ো বলতে সাহস পেল ?

খুকু তখন ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল। বাইরে দিনের আলোয় মুখ দেখাতে পারছিল না লজ্জায়। রাতের অন্ধকারে কি অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে। সুকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারই ঘরে। কি লজ্জা! কি করে পারল ?

রামবাবু কলোনী থেকে ফিরেই খুকুর ঘরে এলেন।

কি করছিস ? চ, দারোগাবাবুর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসবি।

এখন ? খুকু বাবার মুখের দিকে তাকাল।

হাঁা। চ, দেরী করিসনে।

খুকু তবুও খানিক তাকিয়ে থাকল বাবার মুখের দিকে। বাবার মুখে অস্থিরতার চিহ্ন লক্ষ্য করল। ধরে নিল, তাহলে সুকুমারের প্রতিজ্ঞায় ফল ধরেনি। রাতের অন্ধকারে তার দুঃসাহসিক কাজের মর্যাদা মেলেনি। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার দারোগাবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্য তার জানা। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার প্রভাবে আপন কাজ উদ্ধারের চেষ্টা। কিন্তু দারোগাবাবুর শালা আর তার বৌ এখানে নেই। শুধু দারোগাবাবুর বৌ আছে। মোটা থপথপে মহিলা। বড়-মানুষীর কথা শোনায়। দেমাকী। তার সঙ্গে মেশা যায় না। তবু খুকু উঠে দাঁড়াল। রাতের কথাটা ভেবে। সুকুমারের মিথ্যা প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে।

দারোগাবাবুর কাছে গেলেন রামবাবু। কাজ শেষ করে ফিরেও এলেন। তবু মনের জ্বালা জুড়োয় না। সব অন্যায়ের প্রতিকার নেতা মোড়লদেরই করতে হয়। দারোগাবাবুর কাছে শুধু তার সমর্থন দরকার হয়। কারণ আদালতের আইনটা দারোগাবাবুর হাতে।

কিন্তু সমাজের আইন, নেতা মোড়লের হাতে। কলোনীর মানুষগুলো না হয় সাতঘাটে জল খাওয়া। খীরিষ্টানরা না হয় রাজার

জাতের গন্ধ ভুলতে পারছে না। কিন্তু মোচলমানরা? ওই সামাদ হেলেচাষী। নাঙল বেচে খায়। ও লোক জুটিয়ে গণ্ডগোল পাকায় কোন সাহসে? তবে রহিম এ্যাদ্দিন কি করল? কিসের নেতা সে? কিসের মোড়ল?

রহিম কদিন থেকেই রামবাবুর কাছে ঘুর ঘুর করছে। রামবাবু যাতে হাবুল কর্মকারের সঙ্গে ব্যবসায় না নেমে তার সঙ্গে নামে। সে লীগনেতা ছিল। মুসলমান। রামবাবুর দলে এলে সে অনেক সাহস পাবে। অনেক শক্তি বাড়বে। মন প্রাণ খুলে ব্যবসা চালাতে পারবে। কিছু না। ব্যবসা সেই চালাবে। রামবাবু শুধু থাকবেন মাথা উঁচু করে। পাঁচ জনে দেখবে। তারজন্যে মুনাফার অদ্দেক তিনি পাবেন।

দারোগাবাবুর কাছ থেকে রামবাবু ফিরে আসবার খানিক পরেই রহিম এল ঠাকুরবাড়িতে। জিগ্যেস করল, দাদা, সকালে বলে কি হয়েচে? পতাকা তুলবার সময় বলে কারা হল্লা করেচে?

হ্যাঁ। রামবাবু মুহূর্তে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। রহিমকে বলে উঠলেন, তুমি নেতা? মোড়ল? ছাই। ভস্ম। খোদার খাসী। গলায় দড়ি জোটে না? মোড়লী করতে যাও, দল ঠিক রাখতে পার না?

রহিম কিন্তু রাগ করল না। হাত দুখানা জোড় করে বললে, দাদা, সে কি আমিও ভাবিনে? এই বিলে পাট পচান নিয়ে এত হাঙ্গামা হল। তাতে মোচনমানরাও খেপে উঠল য্যাখন, ত্যাখুন, আমার বুকটা টাটাল না? মুখটা চুণকালিতে ভরল না?

তাতে ফল কি?

ক্যানে?

প্রতিকার করতে না পারলে শুধু ভেবে কি হবে? চোখের সামনে লোকগুলো বাউণ্ডুলে বজ্জাত হয়ে যাবে আর তুমি ঠুঁটো মোড়ল হয়ে থাকবে তাতে লাভ কি?

ঠুঁটো হয়ে ছেলাম না দাদা। রহিম বোঝাতে আরম্ভ করল, আপনাকে বলতে বাধা নেই। ওদের দলে টানতে খুবই চিষ্টা করেলাম।

মোনাজাদ মৌলবীকে দৈনিক দশ ট্যাকা রোজ করে নেগিয়ে দিয়েলাম। যাতে সরিয়ে আনতে পারে। মোনাজাদ ওদের মধ্যে গিয়ে বলেল, ভাল করে ধর্ম্ম কর্ম্ম করতে। আল্লা সহায় থাকলে আর কাউকে ডরানোর নেই। মোচনমান তুমরা আল্লার নামে পাড়ায় পাড়ায় গো কোরবানি লেগিয়ে দাও। আল্লার দোয়া হবে খুব।

কিন্তু দাদা, হিঁদুকে দিয়ে দেখচেন ত। ও শালা মোচনমানও তাই। সব কাফের হয়ে গিয়েচে। ঘোর কলির হাওয়া লেগেচে গায়ে। ধর্ম্ম করতে চাই সবাই। কিন্তু নোতুন করে গো-কোরবানির কথা কেউ শুনল না। মোনাজাদ খেপে গিয়ে আমাকে বলল, ভাই সাহেব, কাফেরদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করতে হবে। এখনও মোনাজাদ মৌলবী বলে। কিন্তু আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি। কি জানি—ভাগাভাগি হয়ে পাকিস্থান হয়েচে ইসলামের দেশ। আর এ দেশ নাকি ধর্ম্ম নিরপেক্ষ। এখানে বেশি কিছু করলে যদি আপনারা পেছনে লাগেন, তাইত বেকুব হয়ে থাকি।

নইলে দাদা, হিঁদু মোচনমানের কথা নয়—যেখানে বাস করতে হবে সেখানে লোকজন যদি বশে না থাকল ত সুখ কিসের? একটু থেমে রহিম সেখ আস্ফালন করে উঠল, দাদা, শালাদের এখনো জব্দ করতে পারি। যদি আপনি দলে থাকেন। মানে নতুন করে ব্যবসা করতে হবে আপনাকে। আপনি হাবুলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করবেন বলেচেন। আমার ত কেমন লাগচে। আপনার এ্যাদ্দিনের কর্ম্মচারী। সে হবে ভাগীদার? মানে লাগবে না আপনার? তার চেয়ে আমার সঙ্গে বডারের কারবারে আসুন না। একাএকা ত করতেন। তারচেয়ে আমরা হিঁদু-মোচনমানে যদি এক সঙ্গে এক হয়ে কারবার খুলি তাতে কত সুবিধে হবে আরও। হিন্দুস্থান, পাকিস্থানের ব্যবসায় হিন্দু মোচনমান এক না হলে খুব ভাল জমে না। কাজেই দাদা, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন কারবারে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি—এ দিগরের শালা কাফেরদের যদি জব্দ করতে না পারি তাহলে মোচনমানের জন্মই নয় আমার। শালাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করে দেব। আপনি দেখবেন।

কাউকে উৎখাত করার জন্য নয়, সীমান্তের ব্যবসার কথাতেই রামবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এতকাল হরেক রকম ব্যবসা আর নানা ঝামেলার জন্যে ওদিকটায় পুরোপুরি মন দিতে পারেন নি। কিন্তু জানেন ঠিকই ও ব্যবসা করতে গেলে কি কি দরকার হয়। ওপারের অবাধ আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে হলে রহিমের মত একজন লোক দরকার। আর এপারের সিপাই শান্ত্রীদের জন্য তিনি থাকবেন। তিনি ত জানেন বডারের সিপাই শান্ত্রীরা আসে মশার মত চেহারা নিয়ে যায় হাতীর মত হয়ে। বদলি হয়ে ফিরে গিয়ে আপন দলে ঈর্ষার পাত্র হয়। কাজেই ও তিনি পারবেন ভালই। এখনত আর পুরনো ব্যবসার কোন ঝামেলা নেই। রহিম সেখের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, বেশ, তোমার সঙ্গে যোগ দিতে আমি রাজী আছি রহিম। ব্যবসা যদি চলে, এ জন্মভিটে ছেড়ে যাব না আমি। তেমন কুলাঙ্গার আমি নই।

কিন্তু হাবুল কর্মকারও ছাড়বার পাত্র নয়। রামবাবু শেষ পর্যন্ত তার হাতে লাইসেন্‌স পারিমিটগুলো তুলে দিলেন। বিনিময়ে মুনাফার একটা অংশ হাবুল কর্মকার তাঁকে দেবে।

রামবাবু আবার মাথা তুললেন।

রামবাবুর চেয়েও সক্রিয় হয়ে উঠল রহিম সেখ। এতদিনে রামবাবু তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন। হিন্দু নেতা তার পক্ষে। যে সব মুসলমান তার দলে আসতে চায়নি, এইবার তাদের দেখিয়ে দেবে। ভাল করে বুঝিয়ে দেবে মরা হাতী লাখ টাকা। খ্যামতা থাকলে মোড়লী চিরকালই করা যায়, জানিয়ে দেবে।

রহিম সেখ মোনাজাদ মৌলবীকে আবার কাজে বহাল করে নিল। নতুন কাজ দিয়ে দিল। পথ খুঁজে বার করতে হবে, কেমন করে শালাদের জব্দ করে হাতে আনা যায়।

মোনাজাদ মৌলবী মুসলিম দুনিয়ার বিশ্বাসী মানুষ। অর্থাৎ যেখানে মুসলমান আছে সেইখানেই তার স্বদেশ। ফলে হিন্দুস্থান পাকিস্থানের ভেদ মানে না সে। সীমান্তের দুপারেই তার অবাধ গতিবিধি।

মোনাজাদ একদিন ওপার থেকে এসে রহিমকে প্রস্তাব দিল, এক ঢিলে কাজ হয়ে যেতে পারে। ওপারে গরুর খুব আকাল নেমেছে। যদি রাতে কিছু গরু পার করা যায় তাহলে খুব লাভ হতে পারে। সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের বেটাদের জব্দও করা যায়। হালের গরু আর গাইবকনগুলো যদি চলে যায় তাহলে চোখে সর্ষেব ফুল দেখবে। ঠিক শায়েস্তা হবে। বেশি নয় একখানা গাঁয়ে করলেই হবে। ওপার থেকে সব তৈরী হয়েই আসবে। তার সঙ্গে দুচাব জন এপারের থাকলেই হবে। শুধু গাঁয়ের পথ ঘাটগুলো চিনিয়ে দিতে হবে। আর আমি ত থাকবই।

রহিম সেখ খুশীর ঝোঁকে হাতে কুড়ি টাকা দিয়ে বললে লাগাও।

বহিম সেখ আর মোনাজাদের ষড়যন্ত্রেব কথা বামবাবু জানতে পারলেন না আগে। অথচ তাঁর নামেই সব কাজ হয়ে গেল। সীমান্তের শান্ত্রী সেপাইরা মোনাজাদ মৌলবী আর তার দলবলকে রামবাবুর লোক বলেই ধরে নিল। আর তারা পাকিস্থান থেকে এসে একপাল গাই-বলদকে বেপরোয়া ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। অরক্ষিত গ্রাম। অতর্কিতে আক্রমণ। বাধা দিতে গিয়ে আহত হ'ল দু-একজন। তার বেশি কোন কিছুই করতে পারল না কেউ।

রহিম সেখ বেইমান নয়। পরদিন সকালেই রামবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে মোটা অংকের এক গোছা নোট তুলে দিল। দাঁত বার করে খানিক হেসে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে বললে, এইবার দেখবেন, শালারা ক্যামন ঠাণ্ডা হয়। কাঙাল না হলে মাথা নিচু হতে চায়না কারো? তাই এমনি করে পথে বসান দরকার।

বেশি নয়। মাত্র একটি গ্রামের ওপর দিয়েই ষড়যন্ত্রের ঝড় গেছে। আর সবাই আশ্চর্য—বেছে বেছে ঠিক মুসলমানদের গরুবাছুরগুলোই চুরি হয়েছে? হিন্দুদের নয়, খৃষ্টানদেরও নয়। এর মানে কি? বেলা যত বাড়তে লাগল, আলোচনাও তত জমতে লাগল গ্রামের বুকে। একটা জটলা গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু মোচনমানদের ওপর হামলা ক্যানে? তাহলে মোচমানরা এখানে টেকে কি করে?

সামাদের মনে ভয় আরও ঘন হয়ে উঠল। কদিন আগেই তার সব্বনাশ হয়ে গেল। প্যাটের অন্ন ঘরে এল না। আরত আছে হালের গরু তুটো। এই খোলামেলা বাড়িতে উঠোনে বাঁধা থাকে। সেত্বটোও যদি চলে যায় তাহলে বাঁচবে ক্যামন করে? কিসের জোরে?

জাবেদা ভয়ে কেঁদে ফেলল কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁর সামনে গিয়ে।

যেদিন ধান কাটা গেল, তার পরদিনই হরিমোহন দাঁ ওদের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। অনেক অভয়বাণী শুনিয়ে শেষে ওদের মুস্কিল আসানের জন্য জাবেদাকে পেটের অন্নের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাবেদা তাঁর বাড়িতে ঝিএর কাজ করবে।

হরিমোহন দাঁর স্ত্রী আপত্তি তুলেছিলেন। মাইনে দিয়ে ঝি রাখা? পয়সা সস্তা?

হরিমোহন দাঁ স্ত্রীকে অনেক সোহাগ করে বুঝিয়েছিলেন, এই বয়সে পোয়াতী হয়েছ আবার। আটমাসে পড়েছ। এ তুর্বল শরীরে বেশি খাটা-খাটনি না করাই ভাল। আর জাবেদার খাওয়া? ও আমাদের পাঁচজনের পাত থেকেই হয়ে যাবে। নগদ টাকাত দেব না।

জাবেদা তুঃসময়ে আশ্রয় পেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তাই আবার নতুন ভয়ের কথা শুনেই হরিমোহন দাঁর কাছে এসে কেঁদে ফেলল, বড্ড ভয় করচে। মোচনমানদের বুঝি এখানে আর থাকতে দেবে না। কি হবে?

দূর। হরিমোহন দাঁ জাবেদাকে অভয় দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। ভয় কি আমরা আছি না?

শেষ পর্যন্ত জাবেদাকে অভয় দানের পরিণতি ঘটল, পরদিন সন্ধ্যার পর।

অমাবস্যা তিথি। সন্ধ্যার পরেই নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। কলোনীর মাঠ, ডাক্তারখানা অঞ্চল নির্জনতায় স্তব্ধ। তার ভিতর দিয়ে ডাক্তার গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন। রাস্তা থেকে ডাক্তারখানার মাঠে উঠেছেন। বাসার দিকে যাবেন। হঠাৎ তাঁর

মনে হ'ল অন্ধকারে কলতলায় যেন কে দাঁড়িয়ে। যেন মানুষের ছায়া নড়ছে। হাতের টর্চের বোতাম টিপে ধরলেন। সামনেটা আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে অঞ্চলটা ভরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন লজ্জায়। স্পষ্ট দেখলেন, হরিমোহন দাঁ আর জাবেদা একাকার হয়ে দাঁড়িয়ে। ওঁর ঝুলন্ত তুলসী কাঠের মালা আর জাবেদার গলায় ঝোলান তক্তি কোলাকুলি করছে। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই চমকে উঠল। জাবেদা একটা ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিল হরিমোহন দাঁকে।

আলো নেভানর পরেই অন্ধকারের মধ্যে হরিমোহন দাঁর ফিস্‌ফিসানি জেগে উঠল, যা যা, তুই চলে যা। আট টাকা দেব। আট টাকা—

ডাক্তার থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। টর্চের আলো জ্বেলে আবার দেখলেন, জাবেদা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হরিমোহন দাঁ এবার ডাক্তারের কাছে এগিয়ে এলেন। গলায় তুলসী কাঠের মালা। ভক্তি গদগদ প্রৌঢ়। খপ করে ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন, দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি। বৌ পোঁয়াতি। খুব দুর্বল এখন। এসব শুনলে সইতে পারবে না। প্রাণে মারা যাবে। বড় মেয়েটার বিয়ে ঠিক হচ্ছে। ভেস্তে যাবে। সমথ মেয়ে ঘরে থাকবে। গরীব মানুষ বিপদে পড়ব। দোহাই। আপনি ওপরওয়ালা। ক্ষমা করুন।

কলেরার রোগী পাঁচু মারা গেছে চিকিৎসার অভাবে। তারপর থেকে ডাক্তারখানা ঘেঁটে ডাক্তার দেখেছেন, অনেক ওষুধই খোয়া গেছে। তার হদিস মেলে না। তার জন্যে একটা রিপোর্ট তিনি জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষর কাছে পাঠিয়েছেন। ডাক্তারের মনে সন্দেহ ছিল। আজ সুযোগ পেয়ে বললেন, বেশ, আমি যদি নীরব থাকি, তাহলে ডাক্তারখানার জিনিসগুলো পাওয়া যাবে?

বিপন্ন হরিমোহন দাঁ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ যাবে।

ফিরিয়ে দেবেন আপনি?

দেব। আমি দিয়ে দেব আপনার কাছে।

বেশ। ডাক্তার নিজেকে সংযত করে শান্ত ভাবে নিজের বাসার দিকে এগিয়ে চললেন।

জাবেদা তখন পথ দিয়ে ছুটছে। ছিঃ-ছিঃ। এমন লজ্জা সে জীবনে পায়নি। বড় ডাক্তারবাবু দেখে ফেলল? লজ্জার কথা। কলংক। গাঁময় রটিয়ে দেয় যদি?

উদ্বেগ পীড়িত জাবেদা বাড়িতে এসে দাঁড়াতেই সামাদ বললে, কে? জাবেদা? এইচিস, নে এখানকার ভাত এবার উঠল।

সেকী! আরও জোরে কেঁপে উঠল জাবেদার ডাঁটো শরীরটা।

সামাদ বললে, আমরা আজ সবাই গিয়েলাম উযা গেরামে। রহিম স্যাকের কাছে। ও ছাফ জবাব দিয়ে দিয়েচে। বুলল, অনেক চেষ্টা করেচি তুমাদের সাবধান করতে। মুনাজাদ মুল্লাকে দিয়ে অনেক বুঝিয়েচি কেন্তুক তুনরা আহাম্মুক, আমার কথায় মুতে দিয়েচ। এ্যাকুন যাও। যা খুশী করগা। দ্যাশ ভাগ হয়ে গিয়েচে। হিন্দুস্থান পাকিস্থান হয়েচে। পাকিস্থান মোচনমানদের জন্যে। মোচনমানদের এখানে জোর কিসের। এখানে থাকলেই অমন হবে। বুলবার কি আচে?

সব শুনে জাবেদা বললে, তাইলে?

আবার কি? মণ্ডল মাতব্বর রহিমই যাকন একথা বুলল, ত্যাকুন আর ভরসা কিসের? এদ্যাশে যদি মোচনমানের জোর না থাকে ত থাকব কুন সাহসে?

জাবেদা বললে, তাইলে কি করবা?

সামাদ বললে, কি আবার? সবাই ভয় পেয়েচে। আজ মাঝরাতেই সবাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়চে। মোচনমানের দ্যাশ পাকিস্থানেই যাব। একটু থেমে দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে সামাদ বললে, নে জাবেদা, আমরাও যাব।

অনেকক্ষণ ধরে জাবেদা কোন কথা বলতে পারল না। বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটে, তার জন্মস্থান—এসব ছেড়ে যেতে হবে? অন্ধকারের মধ্যে পালাবে? চোরএর মত করে?

খানিক আগেই সে ভাবছিল তার কলংক কথার হাত থেকে পরিত্রাণের

পথ সম্পর্কে। ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পালাবার কথাই ভাবছিল। আর এখন ঘর-ছাড়ার সত্যিকার সম্ভাবনায় বেদনার্ত হয়ে উঠল সে। মনটা গুমরে গুমরে উঠতে লাগল ?

মাঝরাতে গ্রাম জুড়ে সেই ঘর-ছাড়ার যাত্রা আরম্ভ হ'ল।

যাবার আগে সামাদ বললে, দাঁড়া, যে আচ্ছিরায় ছেড়ে যাচ্চি, তা আর কারো ভোগে লাগতে দেব না। আগুন নেগিয়ে দিয়ে যাই।

না, না। জাবেদা বাধা দিয়ে উঠল, ও কাজ করো না দাদা। নিজের হাতে এ অকল্যাণ করো না। আচ্ছিরায় নখ্‌খী। ভোগে নাগেত মানসেবই ভোগে নাগবে। নাগুক।

জাবেদা ঘরের বাবান্দায় গিয়ে ঢিপ ঢিপ করে মাথা কুটল। জিব দিয়ে ওর মাটি টেনে নিল। চোখেব জলে ভিজিয়ে দিল খানিকটা মাটি।

সামাদ ডাকল, উঠে আয়। দেরী হয়ে যাচ্চে।

মানুষের সেই ভিটে মাটি ছাড়ার আরম্ভ রাতে হলেও, রাতের মধ্যেই তার শেষ হল না। বরং সকাল হলে, একটু জানা[illegible]নি হতেই আশপাশের গ্রামেও তার ছোঁয়াচ লেগে গেল। কেউ আর কারো উপদেশ শুনতে রাজী নয়। এদিগরের মুসলমানের ভাগ্যে যা এসে গেছে, তা থেকে আর কেউ পিছিয়ে আসতে রাজী নয়।

তবু গোবিন্দলালের দল জোট বেঁধে বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার, এমন কি সবচেয়ে নিরপেক্ষ মানুষ ভূপালবাবুরও টনক নড়ে উঠল এ পরিস্থিতিতে। ঘর ছেড়ে তিনিও নেমে এলেন। সারা দিনমান ক্লান্তিহীন শ্রম। ঘরছাড়া মানুষের হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, মেয়েদের কান্নার মধ্যে ছুটে ছুটে বেড়ালেন। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। কারো গতিরোধ করা গেল না। সব চলে গেল। তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তাঁর খদ্দের ছিল এই সব গরীব চাষা-ভূষোর দল। ধারে কারবার ছিল। অনেক টাকা পাওনা ছিল। সে সব গেল। খদ্দেরও গেল। তার ওপর গেল সেই সব মানুষ, যারা বংশ বংশ ধরে চিনত এদেশের মাটি জল হাওয়াকে। এদেশের খেত খামার থেকে

অভিজ্ঞতা চলে গেল। এর জায়গায় যারা এসেছে সেই কলোনীর মানুষ —ওরা নতুন। এ মাটির অভিজ্ঞতা নেই। এর মনের খবর জানে না। জানে না কোন সোহাগে এ মাটির মন গলবে। তবে? ভাগচাষী গেল, খেতমজুর গেল, মজুর গেল। ওদিকে ব্যবসাও গেল।

খানিক পরে উপেন শিকদার এসে ভূপালবাবুর পাশে বসল। বিষণ্ণ, বিপন্ন, ভারাক্রান্ত মন। এখন তার কি দশা হবে? ট্যাক্স আদায়ের চাকরী, কমিশনের ভিত্তিতে। সে কমিশন গেল। আবার ব্যবসাটাও গেল। গরীবের গ্রামে কেউ দামী জামা কাপড় কিনতে পারত না। উপেন শিকদার আমদানী করত সস্তা দামের খুঁতো কাপড় আর সস্তা ছিটের জামা প্যান্ট। ধারে নগদে, কিস্তির কড়ারে, বেচাকেনা হ'ত। সে বিক্রীও চলে গেল।

উপেন শিকদার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, ভূপাল, গাঁ থেকে লখ্‌খী ছেড়ে গেল এবার। ঠেকাতে পারা গেল না।

সুকুমার গ্রাম থেকে ফিরে বললে, তবুত কিছু লোককে আটকেছে গোবিন্দলালের দল। আর খাটছেন ডাক্তারবাবু। অহিপদকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে দেখলাম। উষাগ্রামে দেখা হ'ল। বললেন, মশাই, আন্দোলনে নেমে কি কাজই করেছি। একলা বেশ ছিলাম। এখন আর পিছিয়ে আসাও যায় না। অথচ চোখেও দেখতে পারা যায় না।

ভূপালবাবু বললেন, তবু ওঁরা কিছুই করতে পারবেন না।

কেন?

যা হাওয়া দেখলাম। একেত ভয় পেয়ে পালাচ্ছে সব। তার ওপর দেখি আমার রাম মামা আর রহিম সেখ দুটো বন্দুক হাতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে দারোগা পুলিশ। সকলকে আটকাচ্ছে। আর বলছে, তোমরা যাবা যাও। গরু বাছুর ছাগল মুরগী এসব দেশের সম্পদ কেউ নিয়ে যেতে পারবা না। হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে। আরও ভয় পাচ্ছে ওরা। চীৎকার করছে। আরও ভীড় বাড়ছে। শেষ অবধি কেউ থাকবে না।

যাক। সবাই চলে যাক। জাবেদা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। ভালই হয়েছে। এদিকে নিশ্চিন্তি। কিন্তু ডাক্তার যে আছে?

হরিমোহন দাঁ, কম্পাউণ্ডারের মনে শুধু ওই এক চিন্তা। ডাক্তার, ডিস্‌পেন্‌সারীর জিনিষগুলো ফেরৎ চেয়েছেন। সে সব ফেরৎ দেওয়ার অর্থ নিজেকে চোর প্রতিপন্ন করা। তাও না হয় মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাহলেই কি চারিত্রিক কলংক থেকে মুক্তি পাবেন? যদিও ডাক্তার বলেছেন ও ব্যাপারে নীরব থাকবেন, তবু মানুষের মন। বিশ্বাস কি?

শুধু এই চিন্তা হরিমোহন দাঁর। এক চিন্তা। আত্মমুক্তির চিন্তা। বাঁচতেই হবে। ডাক্তারের হাত থেকে পরিত্রাণ চাই। নাহলে আজীবন চলতে হবে ওই ডাক্তারের করুণার ওপর নির্ভব করে। ওই ডাক্তারকেই ভয় করে, ওর কাছে নত হয়ে চলতে হবে। ওই ডাক্তার—শত্রু। শয়তান। পথের কাঁটা—। হ্যাঁ। তাই।

মানুষ ত বাঁচতেই চায়। বাঁচবার জন্যেই তার সমস্ত কৌশল, বিজ্ঞান, সভ্যতার আয়োজন এবং প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় কথা সমস্ত অস্তিত্বেরই মূলে ওই বাঁচাব প্রবৃত্তি, তীব্র আকাংখা কাজ করে চলেছে। বাঁচতেই হবে, যে প্রকারেই হোক নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতেই হবে।

হরিমোহন দাঁর এই প্রবৃত্তির প্রেরণা তীব্রতর হয়ে উঠল ক্রমেই। তারপর সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেললেন একদিন। ডাক্তার আজকাল গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। রাত বিরেতেও গ্রাম থেকে ফিরছেন। এইত সুযোগ। অপূর্ব সুযোগ।

কিন্তু হরিমোহন দাঁর অন্ধ প্রবৃত্তি উপায় চিন্তা করলেও অপায় চিন্তা করেনি। আর তার-ই ফলে বিপন্মুক্তির পথেই হরিমোহন দাঁর বিপন্নতার সংবাদ এসে পৌছল। শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

ডাক্তার মরেনি? তার পরিবর্তে পিওন রুইপদ মরেছে? আর অচৈতন্য ডাক্তারকে সকালবেলা মাঠ থেকে নিবারণ বিশ্বাসের বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? তাহলে? হরিমোহন দাঁ আড়ষ্ট, অসাড় হয়ে পড়লেন।

শুধু হরিমোহন দাঁ কেন? এমনতর দুর্ঘটনার সংবাদে অভবড়

অরাজকতাও স্তব্ধ হয়ে গেল গ্রামের। পক্ষে বিপক্ষের মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে গেল সহসা।

দলে দলে মানুষ দুর্লভপুরে ছুটতে আরম্ভ করল। নিবারণ বিশ্বাসের বাড়িতে। সুকুমার ছুটল, ভূপালবাবু গেলেন। ওদিকে রামবাবু, থানার দারোগাবাবু পুলিশের দল নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

শুধু হরিমোহন দাঁ, ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার অনুপস্থিত। ডাক্তার জখম, ডাক্তারখানার পিওন খুন। এ সময়ে কম্পাউণ্ডারের অনুপস্থিতি মানুষের মনে প্রশ্ন তুলবেই।

রামবাবু দুর্লভপুর আসবার আগে হরিমোহন দাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ডেকেছিলেন সঙ্গে আসবার জন্যে। বুঝিয়ে বলেছিলেন, এ সময়ে যাওয়া উচিত। না হলে লোকে কি মনে করবে।

কিন্তু হরিমোহন দাঁ কেঁদে ফেলেছেন। ঠক ঠক করে কেঁপে উঠেছেন। দেখিয়েছেন হাত পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা রামবাবু একাই চলে এসেছেন দুর্লভপুর। তিনি জানতেন কথা উঠবে কম্পাউণ্ডারের অনুপস্থিতির।

উঠলও। গোবিন্দলালই বললে, কম্পাউণ্ডারবাবু এলেন না? তাঁর ডাক্তারখানার কর্মী সব। এই অবস্থায় তাঁর সাহায্য ত খুবই দরকার।

রামবাবু বললেন, গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। গিয়ে দেখি এ খবর শুনে মুষড়ে পড়েছেন। আমাকে দেখেই কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমি ওই সব একসঙ্গে কাজ করা লোকের ও-দশা চোখে দেখতে পারব না।

একেবারে নিখুঁত যুক্তি নয়। তবু উৎকণ্ঠার মধ্যে এমন যুক্তির চুলচেরা বিচারের ইচ্ছা কারো আর মনে জাগল না। অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা ছড়িয়ে আছে। অহিপদ খুন হয়েছে। ওর লাস শহরের মর্গে পাঠাতে হবে। আর ডাক্তারের জ্ঞান ফেরাতে হবে। না হলে শহর থেকে ডাক্তার এনে দেখাতে হবে। তাঁর কথামত ব্যবস্থা করতে হবে। জরুরী। জরুরী কাজ।

রামবাবু বন্দীপুরে ফিরে আবার হরিমোহন দাঁর বাসায় গেলেন। হরিমোহন দাঁ ভয়ার্তস্বরে বললেন, কি হল? তখন ডাক্তারখানার

জিনিসগুলো ফেরৎ দিলেই হত। না হয় চাকরীতে একটা দাগ পড়ত। কিন্তু এখন? ওঁর জ্ঞান হবে। কেস উঠবে। তখন? শুধু আপনার জন্যে, রামবাবু। আপনি তখন জিনিশগুলো দিতে মানা করলেন। আর বললেন—

কি হয়েছে তাতে? রামবাবু খিঁচে উঠলেন, এত যখন ভয়—

হরিমোহন দাঁ আরও বিপন্ন বিব্রত হয়ে উঠলেন। আজ্ঞে, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসার। গরীব মানুষ। আপনি আমাকে বাঁচান।

রামবাবুর হাত চেপে ধরলেন। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। রামবাবু বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন হরিমোহন দাঁর সামনে থেকে। আসবার সময় বলে এলেন, অমন মেয়েমানুষের মত কাঁদলে মরতেই হবে।

হরিমোহন দাঁ জোর করে দু'হাত দিয়ে চোখ চেপে ধরলেন।

দারোগাবাবু? তিনিও বিব্রত হয়ে পড়লেন এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। সীমান্তের চোরাই চালান সম্পর্কে রিপোর্ট পাল্টে দেওয়া যায়। মুসলমানরা দেশ ছেড়ে পাকিস্থানে যাচ্ছে, তারও অনেক কারণ দর্শান যায়। কিন্তু একটা খুন, একটা জখম। বিশেষ করে ডাক্তার জখম। এখনও জ্ঞান হয় নি। জ্ঞান হলে কি বলবেন কে জানে। তার ওপর গোবিন্দলালের দল আছে। কাজেই রামবাবু যাই বলুন, নিজের চাকরীর দিকটা ত দেখতেই হবে? এই চাকরী, এই চেয়ারের জন্যেই ত তাঁর যত মান-মর্যাদা, মূল্য। এটা গেলে, আজকের বাজারে কি করবেন তিনি? আর চাকরী করতে এসে, চাকরীর ক্ষতি কে চায়? উন্নতি কে চায় না? নিজেকে বাঁচিয়ে তারপর অনেক কিছুই করা যেতে পারে।

কিন্তু রামবাবুও ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। গুরুত্বপূর্ণ পদ। মানী লোক। উপকারীও। তাঁকে উপেক্ষা করা ত মুস্কিল। তবু আত্মরক্ষা প্রথম কথা।

তবু রামবাবু থানায় এসে দারোগাবাবুর মুখোমুখি বসলেন।

শুনুন স্যার। এ কেস চালাতে দিলে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠবে। আর ওই ডাক্তার—সাংঘাতিক লোক। এক দিক দিয়ে ঠিক কাজই হয়েছিল। এ অঞ্চলটাকে কি জ্বালানই জ্বালাচ্ছিল। ওকে আরও সুযোগ দিলে আরও সব্বনাশ হবে।

দারোগাবাবুর চোখে ভেসে উঠল, ডাক্তারের সেই পাট-আন্দোলনের প্রাক মুহূর্তের চেহারাটা। সেই সব কথাবার্তা। হ্যাঁ, দাম্ভিক, উদ্ধত মানুষ। হাঙ্গামাও ভালবাসে।

রামবাবু বললেন, স্যার জীব হত্যা পাপ। কিন্তু সাপ মারলে ত সবাই খুশী হয়।

তবু, তবু দারোগাবাবুর পক্ষে হঠাৎ কোন কাজে লাগা সম্ভব নয়। ভাবতে হবে আরও ভাবতে হবে।

রামবাবু ভাবছিলেন, এর পর আর কি করা দরকার।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, বাইরে উঠোনে শ্রীপতিবাবু দাঁড়িয়ে। দারোগাবাবুর সম্বন্ধি। অমনি তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। জোর গলায় বলে উঠলেন, শ্রীপতিবাবু, কবে এলেন ?

দারোগাবাবু মৃদু হেসে বললেন, কাল রাতে এসেছে।

ওঃ। এতক্ষণ জানতে পারিনি ত। বলেই দ্রুত ঘর থেকে নেমে গেলেন রামবাবু। উঠোনে গিয়ে শ্রীপতিবাবুর ডান হাতখানা জড়িয়ে ধরলেন। আপনি কাল রাতে এসেছেন ? চলুন আমার বাড়ির দিকে। খুকীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন। খুকী আপনার কথা প্রায়ই বলে। আপনি কবে আসবেন জিগ্যেস করে। আমি আপনার দাদাবাবুকে জিগ্যেস করি। উনি বলেন ঠিক নেই। এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে। চলুন আমার বাড়িতে। দারোগাবাবুর সামনেই শ্রীপতিবাবুকে টানতে আরম্ভ করলেন রামবাবু।

দারোগাবাবুর ইতস্ততঃ ভাব। রামবাবুর অনেক উপকার তিনি করেছেন। আর গ্রামে চাকরী করতে গেলেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়। তাতে তাঁর আপত্তিও

নেই। কিন্তু তাই বলে যা খুশী তাই করতে ত পারেন না তিনি? ক্ষমতার বাইরে কিছু করলে শেষরক্ষা করা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে ডাক্তারের জবানবন্দী এখনো নেওয়া হয়নি। একবার জ্ঞান ফিরলে তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বলতার দরুণ ডাক্তার কথা বলতে রাজী হননি। অথচ ওই জবানবন্দীর ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।

কম্পাউণ্ডার হরিমোহন দাঁ আর রামবাবুরও ত সেখানেই ভয়। ডাক্তার কাউকে চিনতে পেরেছেন কি না কে জানে। তবে বুঝতে পেরেছেন। কারণ লাঠির প্রথম আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে নাকি কম্পাউণ্ডারের নাম, রামবাবুর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কাজেই সন্দেহের কথা। জবানবন্দীটা পেলেই তারপর কেস সাজান আরম্ভ হবে দারোগাবাবুর। তখন যা হয় একটা করা যাবে।

সকলের সেই উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে দারোগাবাবু আরেক-দিন নিজে গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তখন কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। দারোগাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে একটু হাসলেন। তারপর অবাক করে দিয়ে বললেন, কাউকে চিনতে পারিনি।

দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কাউকে সন্দেহ হয়?

না।

দারোগাবাবু প্রথমে যেন বুঝে উঠতে পারলেন না কথাটা। শব্দটার যেন কোন মানে খুঁজে পেলেন না। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, কাউকেই সন্দেহ হয় না? কোন একজনও?

ডাক্তার তেমনি উদাসীনভাবেই বললেন, না। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। কাজেই কার নাম করব?

এত সহজ, এত সরল হয়ে গেল পরিণতি? দারোগাবাবুও ব্যাপারটা বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না। ডাক্তার কেন এমন করলেন?

রামবাবুরও সেই প্রশ্ন। হরিমোহন দাঁ কেঁপে উঠলেন আবার অজানা আশংকায়, কেন, কেন ডাক্তারবাবু এমন নীরব হলেন?

সাধারণ মানুষও নীরব হল। সকলেই ত আশা করেছিল এই নিয়ে মামলাটা জমে উঠবে। কেঁচো তুলতে সাপ উঠবে। নেতা মোড়লদের

স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। শহরের লোকজন, আর সরকার, সবাই বুঝবে মানুষগুলো কিসের মধ্যে বাস করে। কি নরককুণ্ড।

কিন্তু আশা পূর্ণ হল না তাদের। ডাক্তারের মত তেজী মানুষ এমন করলেন কেন?

গোবিন্দলাল শুধু মনে মনেই ক্ষোভ নিয়ে থাকল না। সোজা ডাক্তারকে প্রশ্ন করল, ডাক্তারদা, এ আপনি কি করলেন?

কি করব? ডাক্তার বিছানায় আরাম করে শুয়ে জবাব দিলেন।

গোবিন্দলাল বললে, বুঝতে জানতে ত সবই পেরেচেন। এই চরম সুযোগ ছিল ওদের জব্দ করার। সব এবার দেখে নিতাম। কিন্তু আপনি এমন করে ভেস্তে দিলেন।

ডাক্তার কোন কথা বললেন না আর। নিঃশব্দে শুধু হাসলেন।

কিন্তু হেসে জ্যোৎস্নাময়ীর কাছে পার পাওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তার তা চাননি। ডাক্তারের এমন আচরণে জ্যোৎস্নাময়ীই সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হল। প্রতিবাদও জানাল সে তীব্রভাবেই। কারণ ডাক্তারের কাছ থেকে চলে আসার পর সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল নিজেকে প্রভু যীশুর পায়ে একান্তভাবে সমর্পণ করতে। কিন্তু প্রভু যীশু তাকে ঠেলে পাঠালেন এই বাড়ীতে। আর তারপর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ডাক্তারকে ওদেরই বাড়িতে তুলে দিলেন, ওরই ঘরে, ওরই সেবাযত্নের আশ্রয়ে।

এত আর কিছুই নয়। জ্যোৎস্নাময়ী স্পষ্ট বুঝেছে প্রভু যীশুরই নির্দেশে এমন ঘটেছে। তিনিই ডাক্তারকে তার সেবাপ্রার্থী করে পাঠিয়েছেন। তার মানেই তিনি ইঙ্গিতে জানিয়েছেন এ জীবনে ডাক্তারের সেবা করাই তার পথ। তার জীবনের চরম সত্য। তাই অনন্যমনা হয়ে সে ডাক্তারের শুশ্রূষা করে চলেছে। তার আরোগ্য কামনা করেছে। আর বর্বরদের শাস্তি চেয়েছে। শয়তানদের উপযুক্ত শাস্তি দরকার।

কিন্তু ডাক্তারের ঔদাসীন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সে। ডাক্তারের কাছে অভিযোগ তুলল, কেন শয়তানদের নাম গোপন করলেন?

ডাক্তার বললেন, নিজেব ভালর জন্যেই।

কেমন করে? খুনেদের জব্দ না কবাই ভাল?

জব্দ করে কি হবে?

কি হবে!

জব্দ কি হবে? অন্ততঃ যীশুর ভক্তদের এটা ভেবে দেখা উচিত। তিনিও ত তাঁর ঘাতকদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে শাস্তি চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনিও ওদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

প্রভু যীশুর কথায় জ্যোৎস্নাময়ী নিরুত্তর হল। কিন্তু ক্ষোভ গেল না। তার দিকে তাকিয়ে ডাক্তাব শান্তকণ্ঠে আবাব বললেন, ঘাতকরা যীশুর উপকারই করেছিল সেদিন। আর আমার আততায়ীরাও আমাদের উপকারই করেছে।

জ্যোৎস্নাময়ী আব শুনতে চায় না ওসব কথা। তবু উপকারের কথায় জিজ্ঞাসু হয়ে তাকাল। ডাক্তার শয্যাশায়ী। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জ্যোৎস্নাময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওদের জন্যেই ত আজ এখানে রয়েছি। তোমাব ঘবে। তোমাব কাছে—

জ্যোৎস্নাময়ী চমকে উঠল। তাব মনেব ওপব যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারে যে চাওয়া সে চেয়েছে, যে পাওয়া পেয়েছে, এবং পেয়ে দ্বিধাহীন হয়েছে, সেই তাকেই এমন স্পষ্ট করে আজ ঘোষণা কবে দিলেন ডাক্তার?

মনের গোপন কথা যখন প্রকাশ্যে মুখের ভাষায় ঘোষিত হয় তখন মানুষ এমনি করেই চমকে ওঠে। মন্ত্রগুপ্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যথায় মন টনটন করে ওঠে। জ্যোৎস্নাময়ীরও সেই দশা। ডাক্তারের দিকে তাকাতে পারে না।

ডাক্তার হাত বাড়িয়ে জ্যোৎস্নাময়ীর একখানা হাত টেনে নিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী ঘামতে আরম্ভ করেছে। কাঁপছেও।

জ্যোৎস্নাময়ী নার্স। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত জীবন। কিন্তু সে মেয়েমানুষ ত। মনের মানুষের বিশেষ প্রকাশের এই বিশেষ মুহূর্ত পাওয়া তার এই প্রথম।

জ্যোৎস্নাময়ী বিহ্বল। ডাক্তার বলে গেলেন, তোমাকে চেয়েছি। তোমাকে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি ওদের জন্যেই। সেই জন্যেই ওদের পিছনে লাগতে গিয়ে তোমাকে হারাতে রাজী নই। সুযোগ জীবনে একবারই আসে। গেলে আর আসে না। কাজেই পরের সর্বনাশের আশায় নিজের সর্বনাশ করতে চাই না।

হ্যাঁ। অহিপদদার জীবনটা গেছে বটে। যাক। তারজন্যে আমার ক্ষোভ নেই। তার জীবন আগেই গিয়েছিল। শুধু কংকালের মত দুঃস্বপ্ন বয়ে বয়ে তার দিনগুলো কাটছিল মাত্র। তার প্রত্যেকটা মুহূর্ত ছিল তার কাছে স্মৃতির কান্না। ভালই হয়েছে সে গেছে। আমিও আর এখানে থাকতে চাইনে। তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে যেমন করে আজ কাছে পেয়েছি, এমনি করে আজীবন কাছে রাখতে চাই। যাবে ত?

জ্যোৎস্নাময়ী থর থর করে কাঁপছিল। ডাক্তার কথা শেষ করে ওকে আরও নিবিড় করে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

সারা গ্রামের কাছে এটা অভাবনীয়ই বটে। সবাই যখন ভাবছিল এবার অত্যাচারীদের পাপ চরমে উঠেছে, তাদের সুখের আয়ুস্কাল ফুরিয়ে এসেছে, এইবার তেজস্বী মানুষ ডাক্তারের হস্তক্ষেপে সব ধরা পড়ে যাবে, শয়তানদের মুখোস খুলে যাবে, ঠিক সেই সময় ডাক্তার নিবারণ বিশ্বাসের নাতনিকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করলেন?

অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘুরে গেল গ্রামের হাওয়া। গোবিন্দলালের পক্ষেও পথে বার হওয়া দায় হয়ে উঠল। গ্রামের মানুষ এসব সইতে পারে না।

ঘরে দাদু নিবারণ বিশ্বাসকেও সামলান দায় হয়ে উঠল গোবিন্দ-লালের। ডাক্তার কলকাতায় গিয়ে দাদুকে চিঠি লিখেছেন। সে চিঠি পড়তে পড়তেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। জ্ঞান হলে বলতে আরম্ভ করেছেন, কি অনাচার। জোচ্ছনা এমন করল? এমন করে কুল মজাল? যে হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে খৃষ্টান হওয়া—সেই

হিন্দুকেই বিয়ে করা? না, না, এ কখন হতে পারে না। জোচ্ছনা তা করতেই পারে না। সে হিন্দু হয়নি। সে নিশ্চয়ই ডাক্তারকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে।

দাদু গোবিন্দলালকে জিগ্যেস করলেন, তোকে কি লিখেচে—জোচ্ছনা হিন্দু হয়েচে?

গোবিন্দলাল বললে, না। হিন্দু হয়নি।

হয়নি? নিবারণ বিশ্বাস খাড়া হয়ে বসলেন। তাহলে আমাদের কুল যায়নি? জাত যায়নি? ডাক্তার খৃষ্টান হয়েচে?

না। ডাক্তারদাও খৃষ্টান হয়নি।

তবে?

গোবিন্দলাল ডাক্তারের চিঠি থেকে খানিক পড়ে শোনাতে লাগল, "আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ। লোকাচারের ধর্ম নিয়ে তত মাথা ঘামাই না যত বিজ্ঞানকে মানি। আমরা মানুষের সংস্কৃতিকে মানি। মানি সুন্দর সৎ হওয়ার প্রবৃত্তিকে। আমরা মানি বুদ্ধ যীশু চৈতন্যকে। ওঁরা চিরকালের মানুষের অন্তরাত্মা। যে মানুষ পদে পদে অভ্যাসের গণ্ডী পেরিয়ে মহামুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে।"

একটু থেমে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে গোবিন্দলাল বললে, ডাক্তারদা আরও লিখেচেন, "আমাদের মধ্যে আসবে যে নবাগত মানবশিশু—সে-ই হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ। সে হয়ত সব কটা ধর্মকেই মানবে। নয়ত কোনটাকেই মানবে না। কিংবা যখন সাবালক হবে তখন বেছে নেবে যে-কোন একটাকে তার খুশীমত, যেমন কোন এক শিল্পী বেছে নেয় সেতার, কেউ একতারা, কেউবা ওপথেই যায় না। কোন্ অভিভাবক তার জন্যে মাথা ঘামায়? যে পথে আনন্দ, যে পথে সে মহৎ হবে, সুন্দর হবে, আনন্দময় হতে পারবে, সেইত তার পথ। সেই স্বাধীনতা, সেই অধিকারের পূজারীইত আজ আমাদের ভারতবর্ষ। আমরাও। হয়ত সমস্ত মানব সভ্যতাই—।"

নিবারণ বিশ্বাস আর সহ্য করতে পারলেন না। বাধা দিলেন। থাম গোবিন্দ। আর চেঁচাস নে। আমার কানে লাগচে।

গোবিন্দলাল থামল।

নিবারণ বিশ্বাস আজকাল খৃষ্টানদের নিয়ে এক জোট করতে চান। তিনি সহ্য করবেন কি করে এসব চিন্তা? এতকাল জ্যোৎস্নাময়ী তাঁর স্নেহধন্যা ছিল। আর গোবিন্দলাল কুলাঙ্গার। আজ গোবিন্দলালকে আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে আরম্ভ করলেন, যাক। জোচ্ছনা যাক। ও মরে গিয়েচে। ওসব পাপীর কথা আর মুখে আনিস নে। জানিস গোবিন্দ, ওদের বিশ্বাস করাই ভুল। ওরা চিরকেলে বিশ্বাসঘাতকের জাত। সেই ঈভ্‌ থেকে আরম্ভ—।

এ সবই পারিবারিক মনোভাব।

পরিবারের বাইরেও মানুষ আছে। সারা খৃষ্টান সমাজটাই ও অঞ্চলের ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। হিন্দুর ঘরে চলে যাবে তাদের সমাজের মেয়ে? হিন্দুবা তাদের ঘেন্না করে। ছোঁয় না। ওই গোবিন্দ, গোবিন্দলালই সবকিছুর জন্য দায়ী। সমাজের শত্রু।

হ্যাঁ। ওইত। ওই নিবারণ বিশ্বাসের নাতিইত যত নষ্টের মূল।

হিন্দু সমাজের উপেন শিকদারের দল আক্রোশে ফেটে পড়ল। হিন্দু সমাজের একটা ভাল ছেলে, ডাক্তার। তাকে ডাইনীর মত চুষে খেল খীরিষ্টান ছুঁড়ী। ডাক্তারকেও বলিহারি যাই। ধন্যি বাপের শিক্ষা। দেখল কি মজল? হিঁদুর ঘরে কি মেয়ের আকাল নেমেছে? আসলে ওই গোবিন্দই ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলে বোনের হিল্লে করে দিয়েচে। ওই ঝাণ্ডাওয়ালা দলই খারাপ।

হ্যাঁ। তাই। হিন্দু খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়েরই বিষদৃষ্টি গিয়ে পড়ল ওর দলের ওপর।

বেশ কিছুদিন ধরে এ অঞ্চলে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে, তার ফাটল ধরে গেল। গোবিন্দলাল স্পষ্ট, পরিষ্কার বুঝতে পারল। কিন্তু তার এত ক্ষমতা নেই যে যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারকে প্রতিহত করবে। অথচ ওকে মেনেও নেওয়া যায় না। তার দিদির কাজের জন্য সে দায়ী হবে কেন? কেন?

আর একজন। সুকুমার। তার মনেও প্রতিক্রিয়া জমে উঠল। সেইত জ্যোৎস্নাময়ীকে ডেকে এনেছিল। ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই সপ্রতিভ মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী আর উদ্যমশীল ডাক্তার মিলিত হয়েছেন। তাঁরা সংসার পেতেছেন। আর সে? সে কি করল এখানে বসে? শুধু চাকরী। জীবনের গোঁজামিল দিয়ে মানুষের মনরাখা চাকরী। আর একক নিঃসঙ্গ জীবনে দিন রাত্রি পার করে দেওয়া।

ডাক্তার। ডাক্তার। চারদিকে যখন তাঁর নামে কুৎসা চলেছে। তখন সুকুমার স্পষ্ট দেখল ডাক্তার বিজয়ী। এ গ্রামের বুকে যে পথে গেছেন সে পথেই তাঁর জয় নেমেছে। শেষ অবধি জয়ী-ই হয়ে গেলেন।

আর সে? ডাক্তারের জীবনের আলোয় সুকুমার বুঝল, তার জীবনে এত ব্যর্থতা সে এতকাল বুঝতেই পারেনি। আহা—ডাক্তার—ডাক্তার আলো।

ডাক্তার? ডাক্তার?

পলাতক ডাক্তারের কথায় না হেসে আর পারেন না রামবাবু। আরে, এত সহজে কাজ হাসিল হতে পারে অতটা ত বুঝতে পারেননি আগে! এত দুর্বল? এত কাঙাল? তাই জেনে শুনেও কারো নাম বলল না। এই তাড়াতাড়ি পালাবে বলে? একটা মেয়ে পেয়েই এই অবস্থা? তাহলে আগে জানতে পারলেত এত ভাবনা চিন্তা করতে হত না। এত ভুগান্তির ভয় থাকত না।

ডাক্তারের পালানর খবর প্রকাশ হতেই তাই রামবাবু হরিমোহন দাঁকে ধরে আনলেন ঠাকুরমন্দিরে। হেসে আনন্দের সঙ্গে দাবী জানালেন, একটা ভোজ লাগান কম্পাউণ্ডারবাবু। অনেক খেটেছি আপনার জন্যে।

আজ্ঞে, তাত বটেই। হরিমোহন দাঁও অনেক দিন পরে হাসলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তা আপনি যা বলবেন তাই হবে।

কিসের ভোজ? দারোগাবাবুর শালা শ্রীপতিবাবু এসে দাঁড়ালেন

সামনে। ঠাকুরমন্দিরের উঠোনে উঠতে উঠতে শুধু ভোজ কথাটাই তাঁর কানে গিয়েছিল।

রামবাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন, ভোজ? শত্তুর নিপাতের ভোজ। কম্পাউণ্ডারের রুজি মেরে খাবার তাল করছিল ডাক্তার। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে রোগী দেখা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আর কপালে টিকল না। খীরিষ্টান ছুঁড়ীর খপ্পরে পড়ে ভেগেছে। তাই কম্পাউণ্ডার ভোজ দেবে।

শ্রীপতিবাবু হেসে উঠলেন হো-হো করে। বেশ, বেশ, লাগান। আমরা যেন বাদ যাইনে। বলেই তিনি পুকুর পাড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওপথেই তিনি রোজ রামবাবুর অন্দর মহলে খুকুর কাছে যান।

রামবাবুই সেদিন ডেকে এনে ওঁকে খুকুর সামনে বসিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, রোজ আসবেন কিন্তু।

তাই শ্রীপতিবাবু রোজ খুকুর কাছে আসেন। নাহলে জামাইবাবুর বাসায় বসেই বা সারাদিন কি করবেন? স্ত্রী কলকাতায়। গর্ভবতী। প্রেম ঘটিত বিয়ে ওঁদের। বিয়ের আগেই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল। এখন আসন্নপ্রসবা। তাই শ্রীপতিবাবু এখানে একা চলে এসেছেন। তার পরদিনই রামবাবু বাড়িতে ধরে এনেছেন। রোজ আসতে বলেছেন। রোজ কেন? তিনি অষ্টপ্রহরের সঙ্গী হতে চান খুকুর।

কিন্তু খুকু যেন কেমন মেয়ে। কেমন যেন অহেতুক সংকোচ আর ভয় ওর মনে। সহজ হতে পারে না। আর তাঁর স্ত্রী কলকাতার মেয়ে। ব্যবহার কত সহজ ছিল ব্যবহারে। এমন কি একটু অতি প্রগতিশীলাই ছিল। তাই তাঁর চেয়ে তাঁর স্ত্রীই সমস্ত ঘটনাটি ঘটানর কাজে আগে আগে চলেছেন তখন। আজ বিয়ের পর তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে স্ত্রীর পাশে বাজনার মত বাজতে হয়। নাচতে হয় স্ত্রীর হাল চালের মুদ্রা দেখে দেখে। কিন্তু খুকুর মত মেয়েরা পুরুষের অনুগত হয় একবার বশ হলে। তাই তিনি সে সম্ভাবনার লোভ ত্যাগ করতে পারেন না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তাঁর অভ্যাস। তাই অভ্যাস মত একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর চলছেই।

তিনি অনেক করেছেন। খুকুকে স্ত্রীর চিঠি এনে শুনিয়েছেন। খুকু লজ্জায় আরক্ত হয়েছে। স্বভাবসুলভ বিনয়ে অপ্রতিবাদিনী থেকেছে। তাই দেখে শ্রীপতিবাবু উৎসাহিত হয়েছেন। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ভেবেছেন। খুকুর কথা স্ত্রীকে লিখেছেন। স্ত্রী পরবর্তী চিঠিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তীব্র ভর্ৎসনা পাঠিয়েছে লিখে।

শ্রীপতিবাবুব সাধারণ বিদ্যা বেশিদূর না গড়াক, মেয়েদের মন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অসাধারণ বলেই তাঁব ধারণা। পুরুষকে ঘিরেই মেয়েদের স্বপ্ন সাধ। কাজেই স্বামীকে জয় করা নিয়েই সতীনের ঝগড়া। অমনি একজন সুখী মেয়ের প্রণয়ীকে কেড়ে নিতে অন্য মেয়ে সব করতে পারে। বিশেষ করে যখন প্রণয়ীকে কোন মেয়ের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে সাবধান হতে নির্দেশ দেয়, আর যদি সে কথা জানতে পারে সে মেয়ে, তখন সে কিছুতেই সইতে পারে না সে আত্মঅপমান। প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে।

শ্রীপতিবাবু খুকুর সেই প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করতে স্ত্রীর সেই চিঠি এনে পড়েছেন খুকুর সামনে।

চিঠি পড়া শেষ হবার আগেই খুকু উঠে গেছে। আত্মঅপমানের জ্বালায় কেঁদে ফেলেছে। সেদিন আর শ্রীপতিবাবুব সামনে আসেনি সে। কি সম্পর্ক তার সঙ্গে শ্রীপতিবাবুর? কেন সে আসে?

লক্ষণ দেখে শ্রীপতিবাবু আরও খুশী। সারা দিনমান নিজেদের বাসায় বসে ভেবেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ের কথা। অনেক অসম্ভব কল্পনাও মনে জেগেছে। নিজের স্ত্রীর ঘোমটার ফাঁকে খুকুর মুখখানাকেও উঁকি দিতে দেখে বসেছেন। সুখস্বপ্ন। তারই সুখে পরদিন আবার বুক বেঁধে রামবাবুর বাড়িতে ছুটে এসেছেন। এসেই রামবাবুর কাছে বসে শুনলেন, ডাক্তারের পালানর কাহিনী। মনের মধ্যে আরও খুশীর ঝিলিক খেলে গেল।

খুকুর কাছে ছুটে গেলেন তখনি। এই প্রেমের কাহিনী, পলায়ন কাহিনী তরুণী মেয়ের কাছে অতি মুখরোচক হতে বাধ্য। খুকু আর দূরে সরে থাকতে পারবে না।

শ্রীপতিবাবুর ধারণাটা খানিক সত্যিই। জ্যোৎস্নাময়ীর সঙ্গে ডাক্তারের বিয়ের সংবাদটা খুকুকে অন্যমনস্ক করে তুলেছিল। এমন পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাটা যেন ভাল লাগেনা তার। মানতে পারে না। তাহলে নন্দর মা আর তাবা নুলোর বৌএর সঙ্গে তফাৎ কোথায় থাকে ?

ভাবনায় একটু আচ্ছন্ন হয়ে ছিল খুকু। সেই সময় শ্রীপতিবাবু সামনে এসে দাঁড়ানয় খুকু আপত্তি জানাল না। শ্রীপতিবাবু হাসলেন। গতদিনের জের টেনে বললেন, কি অভিমান ভাঙল।

খুকু চমকে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে এড়িয়ে যাবাব চেষ্টা করল।

শ্রীপতিবাবু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মেয়েদের এসব ভঙ্গীকে মূল্য দিতে নেই বলে তিনি জানেন। খুকুকে আবাব অন্তরঙ্গ করবার জন্যে বললেন, সব কাণ্ড শুনেছেন ? নার্স'ত কাজ গুছিয়ে নিল। এখন আপনি কি করছেন ? হিংসে হচ্ছে না ? ঝুলে পড়ুন, ঝুলে পড়ুন কারো সঙ্গে। বলেই শ্রীপতিবাবু এমন ভঙ্গী করলেন যেন তিনি নিজেকেই দিতে পারেন যদি খুকু পেতে চায়।

এর আগে শ্রীপতিবাবুকে এত কুৎসিত মনে হয়নি খুকুর। শ্রীপতিবাবু মানুষ নয়, পুরুষ নয়, যেন এক মূর্তিমান ক্লেদ।

মৃদু স্বভাবের মেয়ে খুকু তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পারল না। কাতর ভাবে বলে উঠল, আমার বড্ড ভয় করছে। একা আছি। আপনি যান।

শ্রীপতিবাবু হেসে বাঁচেন না। প্রেমের আলোচনা শুনে ভয় করছে খুকুর। তার মানেই তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হতে চলেছে। ভয় ভাঙানোর মুহূর্তকে চায় খুকু। তাঁর স্ত্রীও এমনি করে প্রথম মিলনের সময় বলেছিল, বড্ড ভয় করচে।

তিনি অভয় দিয়েছিলেন। ভয় কি ? আমি আছি।

শ্রীপতিবাবু অভিজ্ঞ মানুষ।

পরদিন বিকালবেলা তৈরী হলেন শ্রীপতিবাবু। পোষাক পরলেন। পাটকরা পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী। তার ওপর সেণ্ট ছড়ান। মাথায় সাম্পুকরা চুল। হাতে একটা গোলাপ নিয়ে শিস দিতে দিতে বাসা থেকে বার হলেন।

শ্রীপতিবাবুর আলোচনাটা খুকু ভুলতে পারেনি। শুধু মনে হয়েছে শ্রীপতিবাবু কেন একথা বলেন? তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রী কলকাতায়। আর তিনি এখানে এসে কেন এসব কথা বলেন? অথচ সে ত শ্রীপতিবাবুর সম্পর্কে কোন কিছু ভাবেন নি কোনদিন। খুকু মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করল আর মিশবে না শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে। বিশ্রী মানুষ উনি।

রামবাবু আবার বাইরের জগতে মেতেছেন। নির্জন বাড়িতে একটা বুড়ি ঝি নিয়ে খুকুকে দিন কাটাতে হয়। এই নিঃসঙ্গতা ভাবনাকে আরও পাহাড় প্রমাণ করে তোলে। তুচ্ছকেও দুর্জয় বলে মনে হয়।

সন্ধ্যার একটু আগেই খুকু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। উনুনে আঁচ দিল। সকাল সকাল রান্না সেরে নেবে।

গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে শ্রীপতিবাবু উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। সহজ স্বরে হাঁকলেন, মিস্—কোথায়?

রান্নাঘরে খুকুর কানের পর্দা দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। মনের ভারসাম্য হারিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। খুকু জবাব দিল না।

এ বাড়ির সবকিছুই শ্রীপতিবাবুর পরিচিত। রান্নাঘরের দরজায় এগিয়ে গেলেন। উঁকি দিলেন। দেখলেন খুকু মাজায় গাছকোমর করে শাড়ী জড়িয়ে পিঁড়ীর ওপর বসে আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কথা বলছেন না যে? চা করুন। খাওয়া যাক।

মা হবার অধিকার নিয়ে মেয়েরা জন্মায়। তাই মায়ের প্রবৃত্তিগুলোও তার সহজাত। পরিচর্যাপ্রিয়তা তাঁর অন্যতম প্রবৃত্তি। কেউ পরিচর্যা কামনা করলে, ওরা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

বিরূপতা সত্ত্বেও খুকু চা করল। চায়ের কাপে চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে খানিক ঘুঁটল বসে বসে।

শ্রীপতিবাবু দরজার কাছে বসে দেখতে লাগলেন। খুকুর সুডৌল হাতে সোনার চুড়িগুলো কি সুন্দর মানিয়েছে। আঙ্গুলগুলো লম্বা, আগার দিকটা সরু হয়ে গেছে। দেহটা একটু ঝুঁকে আছে। মাথা নিচু। মুখখানা কমনীয়তায় ভরা। সব মিলিয়ে খুকু ঢল ঢল লাবণ্যময়ী। ওই লাবণ্য, ওই যৌবন প্রতীক্ষা করছে একজন পুরুষের যৌবনের।

শ্রীপতিবাবু লালসা বিহ্বল হয়ে উঠছিলেন। খুকু প্লেটের ওপর চায়ের কাপ বসিয়ে নিয়ে উঠে এল। শ্রীপতিবাবুর কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে কাপ প্লেট নামিয়ে দিতেই শ্রীপতিবাবুর মনে হ'ল, এবার আবার খুকু ফিরে যাবে। দূরে সরে যাবে আবার। এত কাছে এসে আবার দূরে চলে যাবে।

শ্রীপতিবাবু আর সময়ক্ষেপ করলেন না। যে হাতে খুকু চা নামিয়ে দিয়েছিল, সেই হাতখানা তিনি খপ করে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালেন খুকুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

খুকুর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ঘিন ঘিন করে উঠল। একটা সাপ যেন গা বেয়ে উঠতে চায়। সে অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারছিল। অনুমান করছিল।

অস্বীকৃতির চরম আবেগে খুকুর দেহটা নড়ে উঠল। হাত দু'খানা আক্রমণের অমিত বল পেল যেন।

শ্রীপতিবাবু অতটা আশা করেন নি। তিনি অসতর্ক ছিলেন। নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাই বাইরে দরজার নিচে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। হুড়মুড় করে, সশব্দে। খুকুর মগজ তখন বিগড়ে গেছে। জানে না এরপর কি হবে, কি হতে পারে।

ঘটনাচক্রে সেই সময়েই রামবাবু বাড়িতে ঢুকছিলেন। শ্রীপতিবাবু ছিটকে পড়ার শব্দে চমকে ছুটে এলেন। এসে শ্রীপতিবাবুকে পড়ে থাকতে দেখে অবাক। বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি শ্রীপতিবাবুর হাত চেপে ধরলেন। টেনে তুলে বললেন, কি হয়েছিল? পড়লেন কেমন করে?

শ্রীপতিবাবু বললেন, পা পিছলে গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে খুকু তখন হাঁপাচ্ছে। ঘামছে ভয়ে, উত্তেজনায়, আক্রোশে। সে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, মিথ্যে কথা। আমি ফেলে দিয়েছি। ধাক্কা মেরে, লাথি মেরে। বদমাইস্।

আচ্ছা, হয়েছে। থাম। রামবাবু ধমক দিয়ে খুকুকে থামিয়ে দিলেন। খুকু এবার অসহায়ের মত কেঁদে ফেলল।

রামবাবু শ্রীপতিবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাটভাঙা

পোষাকে কাদা মাটি লেগে গেছে। ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, লেগেছে? কোথায়? আসুন ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বসি।

প্রৌঢ় রামবাবু। পরিণত বুদ্ধির লোক। সবই বোঝেন। বুঝেছেন। তবু শ্রীপতিবাবু দারোগাবাবুর শালা। রামবাবুর বিপদ এখনো চারদিকে ঘনীভূত। ভাই বিপন্ন করেছে। সরকারী কর্মচারীরা বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। দেশের লোক সুযোগের ফাটলে ফাটলে ফণা তুলে দাঁড়াচ্ছে। হাজার অভিযোগ খাড়া করেছে তার বিরুদ্ধে। শোষণ, অত্যাচার, লুণ্ঠন, চোরাকারবারী—। দারোগাবাবু ছাড়া পরিত্রাণের পথ নেই। একমাত্র সহায়ক দারোগাবাবু, তাঁর শালা শ্রীপতিবাবু।

রামবাবু ঠাকুরবাড়িতে বসে শ্রীপতিবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে তোয়াজ করলেন। বললেন, আজ রাতে আমার বাড়িতেই খেয়ে যাবেন। এক সঙ্গে বসে দু'জনে খাব।

রামবাবু তক্ষুণি বাড়ির ভিতর খবর পাঠালেন, একজন ভদ্রলোক খাবেন ব'লে।

খুকু রান্না-বাড়া করছিল, আর ভাবছিল বাবার ব্যবহারের কথা।

সে ছাড়বে না। আজ মুখোমুখি দাঁড়াবে। প্রশ্ন করবে, কেন বাবা তাকে ধমক দিলেন। তার বক্তব্যকে কেন থামিয়ে দিলেন? কেন আদর করে পোশাক ঝেড়ে দিলেন ওই দুর্বৃত্তটার? বাবাকে এ কাজের জবাব দিতে হবে। যোগ্য জবাব চাই। বাবা গুরুজন। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর, অথচ তিনি এমন ব্যবহার করলেন? ভাবতে ভাবতে খুকুর উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছিল। মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল সে।

তারমধ্যেই রামবাবুর সঙ্গে শ্রীপতিবাবু খেতে এলেন। রামবাবু পরমাত্মীয়ের মত তাঁকে পাশে বসিয়ে মেয়ের কাছে খাবার চাইলেন। খুকু খাবারের থালা এগিয়ে দিল। কিন্তু যেন বাবাকে প্রশ্ন করার অধিকার হারিয়ে ফেলল। হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক'বার।

রামবাবু খেতে খেতে শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে কথা বলে হাসছিলেন। খুকু ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। সেই সঙ্গে তার এতদিনের বিশ্বাস

ধারণাও সব ঘুরে গেল যেন। এতকাল সে সমাজ পরিবার আর তার সম্পর্কে যে ধারণা, যে কর্তব্যের কথা ভেবে ভেবে এসেছে, মুহূর্তে সেসব যেন পিছনে পড়ে গেল। দৃষ্টির অতীতে, অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সম্পূর্ণ বিপরীত পথ জেগে উঠল তার চিন্তার দৃষ্টিতে। নতুন পথ। নতুন ভাবনা।

রামবাবু শ্রীপতিবাবু খেয়ে উঠে গেলেন।

খুকু খেতে পারল না। খাদ্যে আর তার রুচি নেই। খিদে নেই। শুধু ভাবনা—বাঁচতে চায় না কে? মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ কে চায় না?

খুকু অস্থির হয়ে উঠল। সে কি পাগল হবে? না, না। সে বাঁচতে চায়। যে পথে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা মেলে, আশ্রয় মেলে, সে পথ গৌরবের। সেই ত পরমাত্মীয়।

নির্জন নিস্তব্ধ বাড়ির মধ্যে খুকু আর স্থির থাকতে পারল না। সংরক্ষণশীল জমিদার বাড়ির জাগ্রত যৌবনা মেয়ে অন্ধকার রাতে গ্রামের অসংস্কৃত পথে একা নেমে এল। গোপনে। আত্মরক্ষার চেষ্টায়। মর্যাদা রক্ষার আশায়।

গ্রামের নিশুতি রাত। সুসুপ্ত পরিবেশ। তার মধ্যে দিয়ে খুকু ছুটে এল সুকুমারের দরজায়। সুকুমার প্রথমে চমকে উঠল। তারপর দরজা খুলে দিতেই খুকু দমকা হাওয়ার মত ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। কাতরোক্তির মত বলে উঠল, আমাকে বাঁচান।

সুকুমার বিব্রত। অবুঝ। বললে, কি হয়েছে?

আমাকে বাঁচান। আর থাকতে পারছিনে ওখানে। বাড়িতে। আপনি আশ্রয় দিন। নয়ত নিয়ে চলুন অন্য কোথাও, আপনার যেখানে খুশী। আপনার যা খুশী, আমি তাতেই রাজী। আপনার পায়ে পড়ি। আমাকে বাঁচান। আশ্রয় দিন। আপনার পায়ে একটু ঠাঁই দিন। আমি মরে গেলাম। আমি ওখানে আর বাঁচব না।

প্রেমের স্বপ্ন অনেকেই দেখে। প্রায় প্রত্যেকেই। রাজকন্যাকে উদ্ধাব করে নিয়ে পালানর স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন যখন বাস্তবে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়? সুকুমারও বিপন্ন, আক্রান্তের মত কেঁপে কেঁপে উঠল। বাস্তব কি কঠোর। কি নির্মম। প্রথমেই সুকুমারের চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার মা, ভাই, বোন—পোষ্যবর্গ। অন্যদিকে তার চাকরী—কলোনী—কলোনীর অধিবাসীরা। তাদের লোন পাওয়া এখনও শেষ হয়নি। ওরা সবাই যেন সুকুমারের অভিভাবক। ওদের উপেক্ষা কবার মত সাবালকত্বের ছাড়পত্র আজও তার মেলেনি। সে নিজেই পরাশ্রিত। সে কি করে অন্যকে আশ্রয় দেবে? সেত এর জন্যে প্রস্তুত হয়নি। কি করে সে খুকুর এই আত্মনিবেদনকে মর্যাদা দেবে স্বীকৃতি দিয়ে?

অক্ষমতা গোপনের বর্ম হচ্ছে উপদেশ বর্ষণ। বিপন্ন সুকুমার বিপন্ন খুকুকে উপদেশ জর্জর করে তুলবার চেষ্টা করল। সূক্ষ্ম বিচার। পাপ পুণ্যেব চুল চেরা ভাগ।

এ হয না। হতে পারে না। একটু সুস্থিব হলেই তখন বুঝবেন। লজ্জা পাবেন। আমি আপনার এ সব্বনাশ করতে পারি না। পারব না। আপনি এখন বাড়িতে ফিরে যান।

খুকু প্রথমে এসেই সুকুমারকে অন্ধ আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল। সুকুমার তার সে বন্ধন শিথিল করতেই আবার পা জড়িয়ে ধরে পড়েছিল। সুকুমার ছাড়াতে পারেনি কিছুতেই। সুকুমার ইচ্ছে করলেত অনেক খুশীই কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু সে যে খুকুকে সম্মান করে, মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছে। সুকুমার বললে, আপনি বাড়িতে যান এখন। তারপর ভেবেচিন্তে দেখি।

না, না। খুকু ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাড়ি যাব না। আমি আর বাড়ি যেতে পারব না। আপনি আমাকে মারুন। মেরে ফেলুন।

সুকুমার নিচু হয়ে বসল এবার। খুকুর পিঠে হাত রেখে বললে, ছেলেমানুষি করবেন না। আমার কথা শুনুন, একা যেতে না পারেন

আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি চলুন। এখানে এত রাতে কাঁদা এমনি করে,—দু'জনের পক্ষেই—

সুকুমারের কথা আর শেষ হ'লনা। ঝুঁকি দিয়ে পিঠটা সরিয়ে নিল খুকু। পরক্ষণেই সুকুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রেম নিয়ে, যৌবন নিয়ে, হৃদয় নিয়ে আত্মনিবেদন করেও ব্যর্থতা। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা মেয়েমানুষের আর কি আছে? সেই ব্যর্থতার জ্বালার মধ্যে খুকুর মনে পড়ল। তার বাবাকে, বংশের পূর্বপুরুষদের কার্যকলাপের কিছু কিছু ঐতিহাসিক টুকরো খবর। মেয়েদের ওরা কখনো সম্মান দেয়নি। অসম্মান করেছে। সব্বনাশ করেছে। অভিশাপ কুড়িয়েছে। সেই অভিশপ্ত বংশের মেয়ে সে। সেই সব বিগত লাঞ্ছিত অপমানিত মেয়েরা তার ওপর ভর করে প্রতিশোধ নিচ্ছে আজ। উঃ। লাঞ্ছনার কি নিদারুণ জ্বালা—কী দাহ—

সুকুমারের ঘর থেকে নেমে এসে খুকু জীবন সম্পর্কে তাব শেষতম দৃষ্টিও হারিয়ে ফেলল। তার চোখের দৃষ্টি সে রাত্রির চেয়েও অন্ধকাব হয়ে উঠল। আরও গভীর, আরও নিবিড়। ঘন কাল অন্ধকার—।

খুকু আত্মহত্যা করল সেই রাতেই। ওদের বাড়ির পাশে, পুকুর পাড়ে, আমগাছের ডালে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে ঝুলে।

খুকু মারা গিয়েছে। আত্মহত্যা করে।

পরদিন সকাল বেলা সংবাদ পেয়ে রামবাবু বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর বাড়ির ভিতর ফিরলেন না। খুকু থাকত ওই বাড়িতে। সারাদিন ওই অন্দর মহলকে আলো করে থাকত।

প্রকিওরমেণ্টের রাধারমণ ঘোষ তাঁর আশ্রয়ে টেনে নিয়ে গেলেন, শোকার্ত রামবাবুকে। তারা নুলোর বৌ রাধারমণ ঘোষের বাসায় কাজ করে। কিন্তু রামবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। ভণ্ডুল চক্রবর্তী হোমযজ্ঞ করেছিল তারা নুলোর বৌকে নিয়ে। অনেক মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, করেছিল। অনেক অলৌকিকত্ব দেখিয়েছিল। আর রামবাবুর দল তাকে গুরুত্ব দিতে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার। তারা নুলোর বৌ বিভ্রান্ত হয়েছে। তার সব শ্রদ্ধাভক্তি, এমন কি অনুরাগও গিয়ে পড়েছে ভণ্ডুল চক্রবর্তীর ওপর।

ভণ্ডুল চক্রবর্তী মন্দিরের পুরোহিত। তারা নুলোর বৌ তার সম্পূর্ণ বশে চলে গিয়েছে। রাধারমণ ঘোষ চেষ্টা করেও তার মতি ফেরাতে সক্ষম হননি। ফলে রাধারমণ ঘোষ পরিকল্পনা করেছেন ভণ্ডুল চক্রবর্তীকে কিছু টাকা দিয়ে রাজী করাবেন, যাতে সে এ অঞ্চল থেকে উঠে যায়। তারপর তিনি তারা নুলোর বৌকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে ভণ্ডুল চক্রবর্তী কত বড় বিশ্বাসঘাতক। কত বড় ফাঁকি দিয়ে নিজের ছেলে বৌ নিয়ে পালিয়েছে। তারা নুলোর বৌ সেই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু তার আগে রামবাবুকে আশ্রয়ে আনার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এইবার রামবাবুর সেবায় লাগিয়ে যদি তারা নুলোর বৌকে আটক রাখা যায়। আর ভণ্ডুল চক্রবর্তীকেও জব্দ করা যায় যদি।

শোকার্ত রামবাবু কিন্তু দুদিনের বেশি সেখানে থাকতে পারলেন না। বিতৃষ্ণায় মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। রাধারমণ ঘোষ তারা নুলোর

বৌকে কাছে পেতে চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। রামবাবুই একদিন এসব সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানসিক অবস্থায় আর সহ্য করতে পারলেন না। কেমন যেন বিরক্তিকর, যেন খুকুর মুখখানা মনে পড়ে যায়, আর শ্রীপতিবাবুকে।

তিন দিনের দিন রামবাবু কলোনীতে চলে এলেন। একটু আশ্রয় চান। শান্তির আশ্রয়। যেখানে মেয়ের শোক ভুলতে পারবেন। খুকুর মৃত্যুকে ভুলতে পারবেন। খুকুর মৃত্যুর পর তাকে আরও বেশি কবে মনে পডছে। আবও কাছের মানুষ, বুকের ধন মনে হচ্ছে। তাকে ভুলতে হবে। একটু সান্ত্বনা চাই। একটু শান্তিব ছায়া।

নবীনের ঘরে এলেন রামবাবু। নিজেই প্রস্তাব করলেন, আমারত আর কোন আশ্রয় নেই। সংসারে আর কেউ নেই। তোমরা আছ। তোমাদের এখানেই দুবেলা খেতে চাই।

নবীন খুশীই হ'ল। নবীনের স্ত্রী বামবাবুব এই বিপন্নতায় ব্যথিত। দুপুব বেলা আদর যত্ন করে রামবাবুকে খাওয়াল। সামনে বসে পাখার বাতাস করল।

নবীনদেব কলোনীর মধ্যে বাস। চারদিকে টিনের চালা। ঘরের বাইরে পাঁচিলের আব্রু নেই। কলোনীর অনেকেরই নজরে পড়ল ব্যাপারটা। রামবাবুব সঙ্গে নবীনদের এই সম্পর্কের প্রতি কেউ তুষ্ট নয়। স্বার্থ, সাংঘাত, দৈন্য—আবার নতুন করে বিরূপতা ছড়িয়ে দিল কলোনীর মানুষের মনে মনে।

সেই সূত্র ধরেই বিকেলবেলা কলোনীতে বৈঠক বসল। শ্রীমন্ত আইচ আজকাল যদিও রামবাবুর দলে, তবু নবীনদের সহ্য করতে পারে না। সেই প্রথম মন্তব্য করল, রামবাবুর এই বিপদের সময় তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা উচিত নয়। এই সময়ে বৌ লেলিয়ে দিয়ে ডেকে এনে খেতে দেওয়া--

গৌরীশংকর যুবক। দৃঢ় চিত্ত। বললে, রামবাবুর কি খাওয়ার জায়গা নেই? ভূপালবাবু জামাই নেই? তাঁর চেয়ে কি নবীনরা বেশি আত্মীয়?

ওইত মজা। কটাক্ষ অমনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারপরেই আরম্ভ হয়ে গেল টিকা টিপ্পনী। তার থেকে ছড়া হ'ল ঃ

কন্যামুণ্ড গলে দিয়ে
শ্মশান বৈরাগী
এলো এলো কলোনীতে,
ভাই, থাকোরে জাগি।

হীন অর্থবহ ছড়া। নবীনদের শুনিয়ে শুনিয়েই ছড়ার প্রচার সুরু হয়ে গেল পরদিন। যে শোনে সেই হাসে। হেসে তাকায় নবীনদের ঘরের দিকে। অন্য আরেকটা পাল্টা মন্তব্য জুড়ে দেয় তার সঙ্গে।

হিঃ-হিঃ-হিঃ। দুমুঠো ভাতের জন্যে ছুটে আসে অমন একটা লোক, তাতেও কথা? এমন করে কলংকের ছোপ লাগিয়ে দেওয়া, কিন্তু তারা বারণ করবে কেমন করে? তা কি পারা যায়? কিন্তু কলংক —নবীনের বৌএর মনে অস্বস্তি দানা বেঁধে উঠল।

নবীন পুরুষ মানুষ। অতশত খুঁটিয়ে দেখার মত, ভাবার মত মন নেই তার। সে অত ভাবেও নি। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর স্ত্রী বললে, আর কত ভাল লাগে বলত? কত গাল মন্দ আর ওই কলংক কথা শুনব? যা খুশী তাই বলবে নাকি সব?

স্ত্রীর সামনে বসে, স্ত্রীর আবেগের স্পর্শে নবীনের পৌরুষ জেগে উঠল। হাতের মুঠি পাকিয়ে বললে, শালাবা হিংসেয় মরছে, বুঝলে? আর কি করে দেখা যাক। তারপরে—

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাতর হয়ে উঠল, আমার কিন্তু আর ভাল লাগে না ওসব। এ্যাদ্দিন যা হবার হয়েছে। এখন ওসব কলংক কথা শোনাও খারাপ।

কেন? নবীন স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরল।

স্ত্রী মুখে কিছু বলল না। চোখের ভাষায় আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

তাইত? নবীনএর মনে পড়ল এবার। এতদিন পরে তার স্ত্রী

সন্তানসম্ভবা হয়েছে। ওর গর্ভে এখন সন্তান আছে। ওদের অনেক দিনের আশা আকাংখার ধন।

স্ত্রী বললে, এখন ওসব গালমন্দ কলংক কথা শোনাও পাপ। ছেলের ক্ষতি হয়। অকল্যাণ হয়। রাগ করে। ওরা পেটের ভেতর থাকলে কি হয়? ভগবানের চোখ দিয়ে সব দেখতে পায়। কান দিয়ে সব শুনতে পায়।

তাহলে? নবীন অবুঝের মত স্ত্রীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

স্ত্রী বললে, এখানে আর থেকে কাজ নেই। ভালর জন্যে তো থাকা। এখানে থাকলে ভাল হবে না। অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল।

তাই চল।

এই চলে যাওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রায় গা সওয়া হয়ে উঠেছে। ওর রূপসী বৌ। রূপসী বৌ পাওয়ার জ্বালা ও বুঝেছে। ওর বৌও জেনেছে রূপসী মেয়ে হয়ে জন্মানর কি শাস্তি। আজও পালিয়ে বেড়ানর শেষ হল না। কলংক আর মানুষের চোখের বাণ-এর শেষ নেই।

নবীনের মনে ছেলের আকাংখা অনেক দিনের। সেই ছেলে আজ বৌএর পেটে। আজ বৌকে না মেনে উপায় নেই। ছেলের ভালর জন্যেই বৌএর বশে চলতে হবে এখন। আবার না হয় গিয়ে উঠবে রানাঘাট কিংবা অন্য কোন ক্যাম্পে।

সেই রাত্রেই ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেউ জানতে পারল না। জীবনও না। কলোনীতে রামবাবুর তৈরী গোপাল মন্দির মাথা উঁচু করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। ভিতরের বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম করল। তাদের গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে মঙ্গল কামনা করল। তারপর নিঃশব্দে কলোনী থেকে বেরিয়ে এল।

সকালবেলা জীবন ঘুম থেকে উঠে দেখল দাদার ঘরের শিকল আঁটা। কৌতূহলী হয়ে গিয়ে শিকল খুলল। দরজা খুলে দেখে কেউ নেই। এত সকালে কোথায় গেল ওরা দুজনেই? ঘরে ঢুকে চারদিকে

তাকাল। যেন কিছু কিছু জিনিষপত্র নেই মনে হচ্ছে! সত্যিই তাই। তাহলে চলে গেছে। কিন্তু কোথায়? কেন?

আরেকটু বেলা হতেই ঘটনাটা কলোনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। রামবাবুর কানেও গিয়ে পৌঁছল।

রামবাবু চমকে উঠলেন। এইত মাত্র দুদিন খেয়েছেন তিনি ওদের ওখানে। তারপরেই—। কলোনীতে ছুটে এলেন। নবীনদের ঘরের দরজায় উঠে দাঁড়ালেন। জীবন দেখল, তেমন কিছু সঙ্গে নিয়ে যায়নি।

রামবাবু দেখলেন, ঘরের মধ্যে নবীনের বৌএর টিনের ট্রাঙ্কটা পড়ে আছে। ওটা রামবাবুই দিয়েছিলেন। জীবন ট্রাঙ্কটা খুলল। তার মধ্যে পড়ে রয়েছে, রামবাবুর উপহার দেওয়া—শান্তিপুরী, নীলাম্বরী শাড়ীখানা, ব্লাউজটা, সায়াটা, আয়নাখানা, সোপকেস—। তার উপহার দেওয়া সব কিছুই অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে।

রামবাবু একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন খানিক। তারপর নীরবে ঘর থেকে নেমে এলেন। কলোনী ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন।

কলোনী থেকে বেরিয়ে রামবাবু সোজা চলে এলেন ভূপালবাবুর বাড়ি। হেমলতার কাছে।

খুকুর মৃত্যুর পর শোকার্ত রামবাবুকে হেমলতা আর ভূপালবাবু তাঁদের বাড়িতে আসবার জন্য ডেকেছিলেন। কিন্তু রাধারমণ ঘোষ ছাড়েননি। রামবাবুও নিরাসক্তভাবে রাধারমণ ঘোষের আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিলেন।

ভূপালবাবুরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। সেই রামবাবুকে নিজে আসতে দেখে হেমলতা খুশী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু রামবাবু খেতে আসেননি। থাকতে আসেননি। তিনি বললেন, হেম, এ গাঁয়ের বাতাস বিষিয়ে গিয়েছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। থাকতে পারছিনে। চ, দিদির বাড়ি যাই। ক'দিন থাকিগে।

দিদি অর্থে হেমলতার মা। তাঁর কাছে রাম মামা যেতে চাচ্ছে।

হেমলতার মনে পড়ল, আর একদিন মামা সুকুমারবাবুকে জব্দ

করবার জন্যে তাঁকে মার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আজ নিজের জন্যেই যেতে চাচ্চেন। হেমলতা বললে, কিন্তু মামা আমি সংসার ফেলে যাব কি করে?

অন্যদিন হলে রামবাবু ধমক দিতেন। চাপ দিতেন। কিন্তু এখন শুধু ক্লান্তস্বরে বললেন, তোর যাওয়া হবে না?

হেমলতা বললে, তুমি একাই যাওনা।

না। থাক।

রামবাবু বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ভূপালবাবু বাড়িতে এলেন। বললেন, চলে যাচ্ছেন রাম মামা?

হ্যাঁ।

হেমলতা বললে, মামা আমাকে নিয়ে মার কাছে যেতে চাচ্চে।

ভূপালবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বেশত। যাওনা।

কিন্তু তোমাদের রান্না-বান্না?

ভূপালবাবু হেসে উঠলেন। আমরা কি ঠুঁঠো? তার জন্য ভেবো না। ঘুরে রামবাবুকে বললেন, রাম মামা, কবে যাবেন আপনি?

রামবাবু বললেন, আজকে দুপুরেও ত বাস পাওয়া যাবে। একটায় বাস। এখান থেকে এগারটার সময় বার হলেই ধরা যাবে।

বেশ। তাহলে তাই যান।

হেমলতা বললেন, আজকেই?

হ্যাঁ। ভূপালবাবু ঘরে গিয়ে হেমলতাকে বোঝালেন। রাম মামার এই মানসিক অবস্থায় আর এখানে রাখা উচিত নয়। তুমি আজকেই যাও। রাম মামাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

হেমলতা তাই করলেন।

সুকুমার আর ভূপালবাবু রাঁধতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল। সুকুমারের অভ্যাস নেই কোন কালে। ভূপালবাবুর মা তীর্থে গেলে তিনি একবার একমাস রেঁধেছিলেন। সেও অনেককাল আগের কথা। তিনি সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে রাঁধতে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিনেই

বেকুব হয়ে পড়লেন। ভাত নেমেছিল। তারপর তরকারির ঝোল উনুনে চাপিয়েছিলেন। বেশ খুশবাই ছাড়ছিল। তিনি সেটা খুন্তি লাগিয়ে বেশ পাকিয়ে আনছিলেন। সুকুমার পাশে বসে স্মৃতি রোমন্থন করছিল। খুকুর মৃত্যুর পর থেকেই সুকুমারের কাজ হয়েছে স্মৃতি রোমন্থন করা। রান্নার পাশে বসে সুকুমার ভাবছিল, এখন হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হচ্ছে। প্রথম যেদিন সে এ গ্রামে এসেছিল—সবই অচেনা ছিল। অচেনা গ্রাম, অচেনা মানুষ, অচেনা পরিবেশ। তার মধ্যে রাতের বেলা খুকু খেতে দিয়েছিল, গল্প করেছিল, পরিচর্যা করেছিল—

সুকুমার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল ভূপালবাবুর কাণ্ডতে। পাতলা এ্যালুমিনিয়মের কড়াইএ চাপ দিতেই তরকারিসুদ্ধ কড়াই উল্টে নিচে পড়ে গেল।

ভরা দুপুর। আর নতুন করে রান্নার ধৈর্য্য নেই কারো। ভূপাল বাবু হায় হায় করে উঠলেন। সুকুমারের বিষণ্ণতার সমুদ্রে আর এক ফোঁটা বিষণ্ণতা বাড়ল মাত্র। আর এ গ্রামে থাকা উচিত নয়, এই ইঙ্গিতই যেন আরেকবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

খুকুর আত্মহত্যার পর থেকেই সুকুমারের মন ভেঙেছে। তখন থেকেই মনে হচ্ছে শুধু এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। এ অঞ্চলে আর থাকা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওর মৃত্যুর পরদিনই কলোনী অফিসারের কাছ থেকে চিঠি এসে হাজির। কৃষিঋণ, ব্যবসাঋণ বার হবার মুখে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই যাচ্ছি।

চিঠি পড়ে সুকুমারের মনে হয়েছে, একেই বলে কর্তব্যের ডাক। সে ত অকারণ পুলকে এখানে আসেনি। আসেনি তার নিছক খুশীর ওপর নির্ভর করে। তার বন্ধন আছে। কর্ম আছে। কাজেই সে যাবে কোথায়? পালাবে কোথায়?

অথচ এমনি করে থাকা মানেইত গুমরে মরা। সত্যিই। সে অনেকখানি শান্তি পেত যদি মুখ ফুটে চীৎকার করে সকলের সামনে

ঘোষণা করতে পারত যে সে পাপী, অপরাধী—তার ভীরুতা অক্ষমতা দুর্বলতাই খুকুর মৃত্যুর কারণ ? তা সে পারে নি। পারছে না। তাইত অনুশোচনার গ্লানি নিয়ে মনে মনে গুমরে মরছে।

তারমধ্যেই আবার রান্নার কাজে বিপত্তি নামল। খিদের সময় তরকারি উল্টে যাওয়া কি মর্মান্তিক।

সুকুমাব বলে উঠল, ভূপালবাবু, আমাদের দ্বারা এ হবে না। একজন রাঁধুনী জোগাড় করতেই হবে।

ভূপালবাবু হেসে উঠলেন, বড্ড খিদে পেয়েছে, নয় ?

সুকুমার বললে, আপনার দুঃখ হচ্ছে না ?

হলে উপায় কি ?

লোক দেখতে হবে।

কোথায় পাবেন ?

খুঁজতে হবে।

কলোনীতে মানুষের দৈন্যদশার অন্ত নেই। জীবিকার জন্য, দুমুঠো অন্নের জন্যে সবাই হাঁ করে আছে। কলোনী অফিসারের ভাত রান্না করে দেওয়া ত সৌভাগ্যের কথা।

সকলের আগেই সুযোগটা গ্রহণ করল সাধুচরণ। সুকুমারের একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল ওর ওপর। এসে বললে, হুজুর, আমার ইস্তিরিকে যদি নেন, দুটো খেয়ে বাঁচে।

বেশ।

আব ত কিছু নয়, শুধু দায় সারা কাজ পেলেই হবে। তারজন্য একটা সাধাবণ কাউকে পেলেই হ'ল সুকুমারের। দুবেলা দুমুঠো রাঁধা ভাত পেলেই হ'ল! তার অতিরিক্ত যে আনন্দ, যে সেবা প্রাপ্তির অধিকার, সেত সে হারিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু কর্তব্যের বোঝা বহন করে চলা ছাড়া আর কোন কাজ নেই।

হ্যাঁ, কর্তব্য। এতকাল ভূপালবাবুর স্ত্রী অতিথি পরিচর্যা করলেন। প্রতিদানে সেত সামান্য কিছুই দিতে পারেনি। ভূপালবাবুকে রাঁধা

ভাত খাওয়াবার জন্য একজন রাঁধুনী নিয়োগ করতে পেরে তাও কিছুটা তৃপ্তি পেল সুকুমার।

কালো কুচকুচে রঙ। দোহারা চেহারা। প্রৌঢ়া। মাথার চওড়া সিঁথীতে আর কপালে ডগডগে লাল সিঁদুর। হাতে গহনা বলতে লাল সাদা মোটা মোটা কগাছা শাঁখা। —সাধুচরণের বৌ।

ভূপালবাবু দেখে বললেন, চেহারা যা হোক, কাপড় চোপড় বড্ড ময়লা।

সুকুমার বললে, পবিষ্কার হয়ে আসবে। সাবান খরচা দিয়ে দিচ্ছি।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই সাধুচরণেব বৌ রাঁধতে এল। সাধুচরণ নিজে পৌঁছে দিয়ে গেল। সুকুমার আর ভূপালবাবুব সামনে বৌকে একগাদা উপদেশ দিল। সুকুমারদের বললে, হুজুব, চাষাভূষা লোক আমরা। আপনাদের মত উঁচু নই। ওব যদি কোন কাজে দোষ ঘটে ক্ষমা করবেন। একটু বুঝিয়ে দেবেন।

সুকুমার বললে, বোঝাবার দরকার নেই। ও যা করবে তাতেই আমাদের উপকার হবে। দুটো রাঁধা ভাত সময় মত পেলেই হ'ল। কোন রকমে বেঁচে থাকা নিয়ে কথা।

কিন্তু ভূপালবাবুর মন সুকুমারের মনের মত শূন্যতায় ভরা নয়। তাঁর স্ত্রী যাবার সময় বলে গেছেন শরীরের দিকে নজর রেখ। অনিয়ম করনা। খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হলে চিঠি লিখ, আমি চলে আসব।

সেই হেমলতার রান্নাঘরে সাধুচরণের বৌকে ঢুকিয়ে ভূপালবাবু সুস্থির হতে পারলেন না। খুঁতখুঁতানি আরও বাড়ল। হেমলতার সংসার, তার ব্যবহারের জিনিসপত্র। সেসব ব্যবহার করবে ওই মহিলা? ভূপালবাবুর প্রখর দৃষ্টি বার বার গিয়ে পড়তে লাগল ওর ওপর। ওর কাজ কর্মের প্রতিটি আচরণের ওপর।

খুঁত কাটা চোখে খুঁত ধরা না পড়ে যায়না।

সাধুচরণের বৌ কাজ করে আর কেমন যেন ধোঁকে। খানিক বিশ্রাম নেয়। চুপচাপ বসে থাকে। কেন? ওর একদিন কাজের পরেই ভূপালবাবুর প্রশ্ন জাগল। তিনি ডাক্তার। রোগী দেখা অভ্যাস।

সাধুচরণের বৌকে জিগ্যেস করলেন, তোমাব কি কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে ?

না।

তবে অমন হাঁপাও কেন ? জ্বর হয়েছে ?

হ্যাঁ। একটু সামান্য।

দেখি। ভূপালবাবু ওর হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে আরও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তোমার মুখে ওসব ঘা কিসের ? হাতে ? পায়ে ?

সাধুচরণের বৌ জড়োসড়ো হয়ে কুণ্ঠিত হবার ভঙ্গী করল। ভূপাল-বাবুর ডাক্তারী মন জিজ্ঞাসু হ'ল। কিসের ঘা ? কত দিনের ? জ্বর কত কালের ? সত্যি কথা বল। আমি ডাক্তার। সব বুঝতে পারি কিন্তু।

নিরুপায় সাধুচরণের বৌ। সংকোচে সংক্ষেপে বললে, আপনিত বুঝছেন ঠিকই।

ভূপালবাবুব মনে পড়ল হেমলতার কথা। ছিঃ-ছিঃ। তার ঘরে, তার সংসারের মধ্যে একে তিনি ঢুকিয়েছেন ?

সাধুচরণের বৌ সবে রান্না আরম্ভ করছিল। ভূপালবাবু তাড়িয়ে দিলেন। যাও। এই বোগ নিয়ে র'াধতে এসেছ ? তোমাকে পুলিশে দেওয়া দরকার।

দুপুরবেলা সুকুমার খিদে নিয়ে ফিরল। ভূপালবাবু আগে একচোট হেসে নিলেন। তারপর বললেন, ডুবেছেন মশাই ডুবেছেন। ভেবেছেন নিষ্কলংক জীবন নিয়ে দিন কাটান যাবে ? সে গুড়ে বালি।

সুকুমারের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। খুকু কি তবে কোন চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছে ? সেই রাত্রির কথা আছে তাতে ?

সুকুমার সভয়ে প্রশ্ন করল, কেন ?

আপনার ওই সাধুচরণের জন্যে। ও সাধু নয় ছাই। শালা ভণ্ড। দুশ্চরিত্র। নাহলে ওর বৌ কখন যৌন ব্যাধিতে ভোগে ? রীতিমত আক্রান্ত মশাই। সর্বাঙ্গে ঘা। ঘুস ঘুসে জ্বর। বলল, পারার ঘা। বললাম, হোল কি করে ? চুপ করে থাকল। বলবে কি করে ? স্বামীর কীর্ত্তিকে মুখে বলে কি করে ? আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ক্ষোভে ভয়ে সুকুমার মাটিতে বসে পড়ল। কি নিদারুণ দুঃসময়

এসেছে তার। একি খুকুর অভিশাপ? না তার পরাজয়ের মাশুল? এর পরেও তাকে এখানে থাকতে হবে। ওই সাধুচরণের জন্যেই। ওই সাধুচরণ এসেছে নতুন করে সংসার পাততে। নতুন করে সমাজ গড়তে। নতুন সুন্দর জনপদের সৃষ্টি করতে। সমাজ রাষ্ট্র আজ ওদেরই সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে দিচ্ছে, অর্থ, গৃহ, জীবিকার আয়োজন—।

দুপুরবেলা সাধুচরণ সুকুমারের কাছে ছুটে এল। ভূপালবাবু তখন পাশে বসে।

সাধুচরণ বললে, হুজুর ওকে রাঁধতে দেননি বলে? কি হয়েছে?

সুকুমার বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করল। ভূপালবাবু ওর স্পর্ধায় অবাক। পাকা শয়তান না হলে কেউ এত সাহসী হয় না।

সাধুচরণ বললে, গরীব মানুষ। ভাবলাম যাক একটা পেট আপনাদের আশ্রয় পেল। কিন্তু কি অপরাধ করে বসল ও।

ভূপালবাবুর রূঢ়কণ্ঠ বেজে উঠল, অপরাধ ত ওর নয়, তোমার। ন্যাকামি করছ কেন? অপরাধ কি জান না?

কি অপরাধ হুজুর?

মনকে জিগ্যেস কর। বৌর কাছে শোননি, কেন তাড়ান হয়েছে? গেরুয়া পরে বাইরে সাধুগিরি আর ভেতরে ভেতরে—

হুজুর। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সাধুচরণ ভূপালবাবুকে বললে, আমিত কিছুই বুঝছিনে। আমি কি করেছি? আমার কি অপরাধ?

এবার সুকুমার রুখে উঠল, তোমার বৌএর ওসব খারাপ রোগ হ'ল কি করে? ওসব যৌন ব্যাধি? তুমি জান না? দুশ্চরিত্র কোথাকার— বৌএর দেহে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে উনি সাধু—! সাধুগিরি—

সাধুচরণ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ধপ করে মাটিতে বসে সুকুমারের পা জড়িয়ে ধরল। হুজুর—অপরাধ নেবেন না। ওসবের কিছু জানি নে। বলছি। সব বলছি। ও আমার ইস্তিরি নয়।

স্ত্রী নয়! সুকুমার আরেক দফা বিস্ময় ও ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

সাধুচরণ বললে, হুজুর, ধুবুলিয়ায় আলাপ ওর সঙ্গে। আমি ঠাকুর

দেবতা নিয়ে থাকতাম। ও পুজো-পাব্বণে আমাকে সাহায্য করত। আমার কাছে শাস্তর-পাঁচালি শুনত। সেই থেকে ঘনিষ্ঠতা। ধুবুলিয়ায় থাকতে আর মন চাচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল কোন গ্রামে, সমাজে গিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করি। কিন্তু আমারত সংসার নেই। সন্তানাদিও নেই। অথচ সরকারী আইনে সংসারী না হলে পুনর্বসতি মিলবে না। ও রাজী হ'ল ইস্তিরি নাম নিয়ে থাকতে। তাই চলে এসেছি। কিন্তু হুজুর, ও শুধু পুনর্বসতির ইস্তিরি। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, ওর আর কিছু জানিনে। আর কোন সম্বন্ধ নেই ওর সঙ্গে।

এ আত্মঘাতী স্বীকৃতি। চরিত্রের মর্যাদা রক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাধুচরণ স্বীকারোক্তি করল। তারপরই ছুটল কলোনীর দিকে।

ওই ব্যাধি? ওকে সে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে। ও ব্যাধির উৎসপথে সে কোনদিন হাঁটেনি। তবু আজ সেই ব্যাধিই তার ঘরে বাস করছে?

কে ও? এতদিন একসঙ্গে বাস করেও ওর জীবন কাহিনীটা জানেনি সে। একবার বলেছিল বটে, ভাইএর কাছে ও থাকত। তারপর দেশে দাঙ্গা বাধলে পালাবার মুখে কে কোথায় যে গেল—আর ভাইকে সে খুঁজে পায়নি। সেদিন সাধুচরণের কাছে এই পরিচয়ই যথেষ্ট মনে হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বাসন নিয়ে জীবনটা কাটাতে পারলেই হ'ল।

সাধুচরণ কলোনীতে ফিরে নিজের ঘরে গেল। বৌকে কাছে ডাকল। সামনে বসিয়ে সোজা প্রশ্ন করল, কে তুমি? তোমার কি পরিচয় বল? সত্যি কথা বল আমার কাছে।

বৌ কথা বলল না। সামনে থেকে উঠে গেল।

তার মানে? সাধুচরণ ধরে এনে আবার বললে, আমি শুনতে চাই। তোমার জন্যে বাবুদের কাছে আমার মান নষ্ট হয়েছে। তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে? না বললে, অভিশাপ দেব। পাপে ডুবিয়ে দেব। আমি সাধু। গেরুয়া পরি, ধর্ম করি, ধ্যান করি। ধ্যানে সব জানতে পারব কিন্তু। জান না? আমি তোমাকে গল্প বলিনি—

সন্নেসীরা কেমন করে ধ্যানে সব জানতে পারে? অহোল্লা আর ইন্দ্র কেমন ধরা পড়ে গেল?

পুনর্বসতির স্ত্রী ভয় পেয়ে গেল। সত্যি। সাধুচরণ ত সন্নেসী। ওর সেবা করে, প্রসাদ খেয়ে শেষ জীবনে পুণ্যি সঞ্চয় করতেই ত সে এসেছে। সাধু মানুষের কোন ক্ষতি ত করতে আসেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। ঘরের মধ্যে বসে সাধুচরণের মুখের দিকে না তাকিয়ে ওর পুনর্বসতির স্ত্রী আত্মজীবনী বিবৃত করল। সংকোচে, দ্বিধায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। থামে। আবার দম নিয়ে বলে গেল। তার মর্মার্থ হচ্ছে:

বিয়ের কথা মনেই পড়ে না। তখন কত ছোটই ছিল। স্বামীর কথা মনে নেই। মন জাগবার আগেই সেও নাকি সগ্গে চলে গিয়েছে। শুধু দেওরকে মনে পড়ে। ওর সমথ যৌবনকে ভুলিয়ে কেড়ে নিয়েছিল। তাই নিয়ে সমাজের মাথাদের কত মাথা ব্যথা হ'ল। দেওরের বাড়ি থেকে ওকে তুলে আনল। তারপর তারা খেলল ওর সঙ্গে। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ওকে পথে বার করে দিল। একজন টেনে এনে একটা টোঙে ঢুকিয়ে দিল। সেই থেকে সেই টোঙই তার সমাজ, সংসার, জগৎ। হয়ত ওখানেই সব শেষ হয়ে যেত। ভাগ্যো দেশ ভাগ হল। তাই পথে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। আলো বাতাসের মুখ দেখতে পেরেছে। ভাগ্যের জোরে সাধুর সেবা করতে পেরেছে। ঘরের বৌ হবার সাধ ছিল। সেই সঙ্গে তাও মিটেছে। মনের মত করে একজন পুরুষকে সেবা করতে পেরেছে—যাকে ভাল লাগে। মনের সাধ মিটিয়ে সিঁদুর পরেছে। শাঁখা পরেছে।

সাধুচরণের সর্বশরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল সে, বেশ্যা, বেশ্যা—তুই বেশ্যামাগী—এখানে বুড়ো বয়সে ছেনালি করতে আসিস আমার সঙ্গে? এতখানি আস্পদ্দা? ভাল কথা বলছি, আজ রাতেই এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবি। আমার ঘরে আর থাকতে পাবিনে।

পুনর্বসতির স্ত্রী একটি প্রতিবাদও জানাল না। বসে বসে, হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

সাধুচরণ উঠে গিয়ে খানিক দূরে বসে হুঁকো টানতে আরম্ভ করল। হুঁকো টানে আর মাঝে মাঝে মহিলার দিকে তাকায়। ও কাঁদছে। ফোঁস ফোঁস করে শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

কাঁদুক। সাধুচরণ অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। তামাকের গুণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্রমেই।

সাধুচরণ তখন বেশ শান্ত হয়ে এসেছে। প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা। মনে অনেক বাস্তব সমস্যার কথা জাগছে। মহিলার থাকার, না থাকার অসুবিধার কথা। তারই মধ্যে সে এক সময়ে দেখল, মহিলা উঠল। ঘরের কোণে তার কাপড় চোপড় ছিল জড় করল। একটা পুঁটুলি বাঁধল। তারপর সেটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সাধুচরণের কেমন একটা বিরূপ ভাব জেগে উঠল মনে। বসে ছিল। উঠে দাঁড়াল সেও। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পুঁটুলিটা চেপে ধরল।

কি হচ্ছে ?

যাই।

কার হুকুমে ? পুনর্বসতির টাকা নেওয়া হয়নি ? খাওনি সে টাকা ? আমার সঙ্গে তোমার নাম লেখা আছে না ?

মহিলা ঘুরে দাঁড়াল। সাধুচরণের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মাথায় ঘোমটা। সিঁথীতে সিঁদুর। আর প্রৌঢ় চোখ দুটোতেও কী অভিমানের ছায়া—

সাধুচরণ চমকে উঠল। এ কে ? সাধুচরণ মুহূর্তে যেন তার সেই প্রথম জীবনে চলে গেল। সেই ফুলকুমারী ! তার গৃহলক্ষ্মী। ঘোমটা দেওয়া, সিঁথীতে সিঁদুর, অভিমান ভরা চোখ। ফুলকুমারী—। তার সেই দেহকে নিজের হাতে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল। তারপর বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়েছে। গেরুয়া পরেছে। সাধু সঙ্গ করে তীর্থে ঘুরেছে। ফুলকুমারীর বিয়োগ বেদনা ভুলতে চেয়েছে। পারেনি। মন টেনেছে শুধু সেই গাঙের ধার। সেই গাছপালা, সেই গাঁয়ের বাতাস। তাই সে দেশে ফিরে এসেছিল। আশ্রম করে বাস করত। ফুলকুমারী আজ থাকলে এমনিটাই হ'ত। এত বয়েসই হ'ত। সাধুচরণ

বিহ্বল হয়ে পড়ল। কি আশ্চর্য্য মিল ফুলকুমারীর সঙ্গে এর। এত দিনত সে দেখতে পায়নি!

সাধুচরণ পুনর্বসতির স্ত্রীর হাতের পুঁটুলি কেড়ে নিল। কথা বলল না। ওকে ঠেলে দরজা থেকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিল। তারপর দরজার খিল এঁটে দিয়ে ওর কাছে ফিরে এল আবার।

কলোনী অফিসার এবার কথা রাখলেন। সাতদিনের মধ্যেই লোনের টাকা নিয়ে বন্দীপুরে এলেন। স্নুকুমার বাঁচল। আবার—আবার কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারবে। মানুষের সব দুঃখবেদনা, হতাশা, নৈরাশ্য, অসহায়তার প্রতিষেধক, মহৌষধ হচ্ছে কাজ। কর্ম ব্যস্ততাই মানুষের জীবন। তার পরম বন্ধু। দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই স্নুকুমারের এই পরম উপলব্ধি। কর্মস্পৃহাই জীবনের লক্ষণ। কর্মই জীবনের অভিব্যক্তি। প্রাণের আশা আকাঙ্খার বিকাশের, স্ফূর্তির অবলম্বনই কর্ম। কর্ম।

রামবাবু নেই। প্রতিবন্ধকতা নেই। স্নুকুমার এবার খুসীমত কাজ করতে পারবে।

কিন্তু ঋণের টাকা নিয়ে কলোনীতে দাঁড়িয়ে স্নুকুমারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

রামবাবু নেই। সে কি করবে? প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল, সেদিনের রামবাবুর সঙ্গে শুভ পরিচয়ের স্মৃতি থেকে, অশুভ পরিণতি অবধি অনেক কথাই মনে হতে লাগল। এই গ্রাম, মানুষ, বিষয়-সম্পত্তি, রাজনীতি—সবকিছুর ওপরেই কত আসক্তি, কত মায়া ছিল তাঁর। বিনা যুদ্ধে এর সূচ্যগ্র অংশও ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না।

এই ঋণের টাকা পাচ্ছে উদ্বাস্তুরা। রামবাবু থাকলে স্নুকুমারকে অভিজ্ঞতার রাজ্যে বালখিল্যের আলখেল্লা পরিয়ে দিতে মেতে উঠতেন এতক্ষণ। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন নানা পরিকল্পনা। আর তাই নিয়ে স্নুকুমারের সঙ্গে বিরোধ বেধে যেত।

এখন সে সবের সম্ভাবনা নেই। রামবাবু নেই। সেইজন্যেই সুকুমার কেমন অসহায় হয়ে পড়ল যেন প্রতিপক্ষর অভাবে। শত্রু নয়, মিত্র নয়, কু নয়, সু নয়—ব্যক্তিত্ব। একটা যেন ব্যক্তিত্বের অভাব হয়ে গেছে বলে সুকুমারের মনে হ'তে লাগল।

সুকুমার কাজ চায়। কাজের মধ্যে ডুবে আত্মগোপন করতে চায়।

কিন্তু কাজের মধ্যে নেমে বিপন্ন হয়ে পড়ল। উদ্বাস্তুরা ব্যবসা করবে। চাষ করবে। তার জন্যেই ঋণ পেয়েছে তারা। সুকুমারকে তারই আয়োজন করে দিতে হবে। রামবাবু নেই, আর কেউ নেই আশে পাশে। সে একা। তাকে একাই এই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

অসম্ভব। সুকুমার তার ক্ষমতার সীমাকে এই প্রথম যেন খুঁজে পেল। এতগুলো উদ্বাস্তু মানুষের ভবিষ্যৎ পথ দেখান তার পক্ষে কত অসম্ভব।

বিশেষ করে সে বিদেশী। সে কতটুকু জানে এ অঞ্চলের? এর ভাল মন্দর খবর? এই জন্যেই ত আঞ্চলিক প্রতিনিধির প্রয়োজন হয়। বিদেশ থেকে এসে কারো পক্ষেই তেমন কারো উপকার করা যায় না যদি স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা না মেলে। এই কারণেই ইংরেজ এদেশে এতকাল রাজত্ব করে গেল। এই কারণেই তারা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল।

হাবুল কর্মকার এসে সুকুমারের সঙ্গে দেখা করল। এর আগেত অনেকবার সুকুমারের কাছে সে এসেছে। এবার ভিন্ন মানুষ যেন। গায়ে মেটে রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। পরণে মোটা খদ্দরের আধময়লা ধুতি। একটু গম্ভীর ভাব। সুকুমারকে বললে, এখন ত রামবাবু নেই। তার ব্যবসা পত্তর আমিই নিয়েচি। বোডের মেম্বর হিসাবে তার প্রেসিডেন্টের কাজ আমি চালাচ্চি এখন। তাই কলোনীতে লোন এসেচে শুনে এলাম। রামবাবুর সব কাজইত এখন আমাকে করতে হবে। আপনাদের সরকারী পরিকল্পনাটা কি?

সুকুমার বুঝল হাবুল কর্মকারই এখন নেতা। স্থানীয় মানুষের প্রতিনিধি হয়েছে। সুকুমার মুস্কিলে পড়ল নতুন নেতার প্রশ্নে।

সরকারী পরিকল্পনা তেমন জোরদার নয়। আর কিছু থাকলেও সুকুমার তা জানে না। তাকে জানান হয়নি। সে শুধু জানে টাকা দেওয়া হবে! চাষা চাষ করবে। ব্যবসায়ী ব্যবসা করবে।

শোনা কথাগুলোই সুকুমার বলল। হাবুল কর্মকার নেতার ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

স্যার, ওটা কি একটা কথা হোল? ব্যবসায়ী ব্যবসা করবে বটে। কিন্তু সে কী এই বনে জঙ্গলে? এটা ব্যবসার জায়গা? চাষী চাষ করবে। গরু কিনবে, নাঙল কিনবে, তারপর চাষ হবে—। হাবুল কর্মকার আবার হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে, থাক, যা হবার হোক। আমাদের কাজ করে যেতেই হবে। চলুন একবার কলোনীতে যাই।

অভ্যাস কারো রাতারাতি পাল্টায় না। কলোনীতে এসে হাবুল কর্মকারের গোমস্তা-মন জেগে উঠল। লোনের টাকাগুলো যদি হাতে নিয়ে নিতে পারে—। উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্য করে বললে, গরু, নাঙল কিনতে চাও কে কে?

যারা বিধবা আছে, সরকার তাদের ঢেঁকী কিনে ভানানির কাজ করতে বলেচেন।

হাবুল কর্মকার বললে, বায়নার টাকা জমা দাও সব। গরু, নাঙল, ঢেঁকী সব কিনে দেব।

টাকা—টাকা—সোণার চাঁদি গো, সোনার চাঁদি। সে কেউ হাত ছাড়া করে নাকি? শুধু অবলা বিধবাদের কাছ থেকে ঢেঁকীর বায়না-গুলো সব পেল সে।

হাবুল কর্মকার ঢেঁকী সরবরাহ না হয় করবে। কিন্তু বিধবারা চাল, চিঁড়ে করে বেচবে কোথায়? হাট কোথায়, গঞ্জ কোথায়? দূরে গিয়ে বেচে এলে পোষাতে পারবে?

শুধু বিধবাদের নয়। এ প্রশ্ন সকলেরই। প্রশ্ন নয়। সমস্যা। বাস্তব সমস্যা।

সরকার তার পরিকল্পনা মত ঋণ দিয়ে দিল। মুক্ত হয়ে গেল। সরকারী নথিপত্রে লেখা হয়ে গেল এই গৌরবময় বিবেচনার কথা।

দেশবাসী খুসী হবে। ভবিষ্যৎ মানুষেরা এ নিয়ে ইতিহাস রচনা করবে। চারণদল বন্দনা গাইবে।

কিন্তু এইসব হতভাগ্যরা কি করবে এখন? দুর্গম গ্রামাঞ্চল, ঘন জনবসতি নয়, শহরের সঙ্গে যোগাযোগের যোগ্য পথঘাট নেই। অর্থ-নৈতিক কাঠামোও নিম্ন পর্যায়ের। এখানে ব্যবসা হবে কোন পথে?

আর চাষী ত প্রকৃতিনির্ভর সমাজ। ফসলের মরশুম আসতে প্রতীক্ষার অন্ত থাকে না। সে প্রতীক্ষার দিনে কোন্ মূলধন নিয়ে কাটাবে? সব প্রতীক্ষাই কি সফলতা আনবে?

সাতশ টাকা করে প্রত্যেক পরিবার পেয়েছে। পাট পচানোর প্রতিবাদী আন্দোলনে গৌরীশংকর নেতৃত্ব নিয়েছিল। তাই আবার তাকেই ধরে বসল সবাই, বল, এই সাতশ টাকা সম্বল। এই বর্তমান। এই ভবিষ্যতের প্রাণ বাঁচানোর মূলধন। এ নিয়ে এখন কি করব বল?

সামনে পথ থাকলে, তাতে ঝাঁপ দিতে বলা যায়। কোন পথ বন্ধ করে দিতে উস্কানি দেওয়া যায়। কিন্তু নতুন নির্ভরশীল পথ খুঁজে দেওয়ার জন্যে দরকার হয় যুগের। যুগন্ধর নেতার।

গৌরীশংকর কি করবে? সে আবার ছুটতে আরম্ভ করল গোবিন্দ-লালেব কাছে। গোবিন্দলাল এক কথায় কোন কিছু বলতে পাবে না। তাদের সামনে ত শুধু কলোনী নেই। দেশেব তথা পৃথিবীব হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কলোনীর ওরা একটা অংশ মাত্র। তাবা চায় সারা দুনিয়ার মানুষের মঙ্গল। তাদেব পথ সেই পথ, যে পথে চললে সবাই লক্ষ্যে পৌছবে। একজোটে সেই পথ তৈরীর সংগ্রাম করতে হবে।

গোবিন্দলাল গৌরীশংকরকে বললে, সকলকে আমাদের দলে যোগ দিতে বলুন। সহজে বাঁচবার দিন আজ আর নেই। কলোনীর সমস্যা বলে, অমন সংকীর্ণ চিন্তা না করে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিক সবাই। ওদের অনেক সুবিধে হবে। আপনি ওদের এটা ভাল করে বুঝান। কিছু পত্র পত্রিকা নিয়ে যান। তারপর আমরা যাব, আপনি ডাকলেই। গৌরীশংকর কিছু না নিয়েই ফিরে এল।

হাবুল কর্মকার একদিন রামবাবুদের সেই মৎস্যজীবী সংঘের কয়েক-

জনকে নিয়ে এল। এরাই একদিন কলোনীর জেলেদের জাল তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

তারা এসে কলোনীর জেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আমাদের উপর রাগ করে লালঝাণ্ডা তুলে দিলেন ময়ের ওপর আপনারা। কি লাভ হয়েছে? দলের জোর হলে জয় হয় সত্যি কথা। কিন্তু তার আগেই যদি এমনি করে না খেতে পেয়ে মরে যান? কে ভোগ করবে সে জয়? তা ছাড়া ওরা আপনাদের কি সুবিধে দিতে পেরেচে? পারবে কি করে? আইন কি ওদের হাতে? আর দলে যদি সবই গরীবগুরবো লোক হয়, তা হলে ওই জিগীর তুলে বেড়ান ছাড়া এ পয়সার খেলার যুগে কি করতে পারবে? আপনারা সে সব ভালই বুঝচেন নিশ্চয়। তাই আমরা বলতে এয়েচি, ওদলে থাকলে, হাতের ওটাকা খেয়ে দেয়ে চেঁচিয়েই ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমাদের দলে আসুন। সংঘে চাঁদা দিন। সংঘে ডিপোজিটের দরুণ টাকা জমা দিন। বলেন ত, আপনাদের জন্যে নতুন বিল ইজারা নিয়ে দিচ্চি। আমাদের হাতেই সে সব। কাজের কাজ যা তাই করুন। জাল ফেলুন, মাছ ধরুন, ব্যবসা করুন। নিজে বাঁচুন আগে, সংসার বাঁচান।

ঠিক। ঠিকই বলেছে ওরা। জেলেদের দলের বুড়ো সুধাংশু হালদারের খুব মনে ধরল কথাগুলো। হাতে টাকা থাকতে থাকতে একটা ভবিষ্যৎ ঠিক করে নেওয়া ভাল। নইলে এ টাকা ফুরোলেই ত শুকিয়ে মরতে হবে। প্রাণে যদি না বাঁচি, যদি ছেলের, বৌয়ের মুখে অন্ন না জোটে ত কিসের কি?

তা সত্যি। মেয়েদের মনেও ধরল কথাগুলো। সংসার ত মেয়েদেরই। রান্নাঘর তাদের হাতে। শূন্য ভাঁড়ারের বিভীষিকা তারা জানে। খুদকুঁড়ো যদি থাকে, যদি রেঁধে স্বামী, সন্তানের সামনে এগিয়ে দিতে পারে, তখন তারপর যেপথ নিতে বল আপত্তি নেই তাদের।

তারা সবাই সুধাংশু হালদারের পন্থী। সবাই গুঞ্জন তুলল, যাতে ভবিষ্যৎ ভাল হয় তাই করগা সব। বুড়ো মানুষ, জ্ঞানবান, উনি যা বলছেন, সেই ভাল।

তরুণের দল ভয় পেয়ে দুর্লভপুর ছুটল। গোবিন্দলালদের খবর দিতে। ডেকে আনতে।

কিন্তু দেশের সরকারের প্রতিনিধি সুকুমার। সরকারী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ তারই যোগ্যতার উপর নির্ভর করছে।

কাজে নেমে সুকুমারের কান্না পেতে আরম্ভ করেছে। শুধু সে, শুধু কলোনীর মানুষ, পর্বত প্রমাণ সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করতে পারে? এর থেকে উত্তরণের জন্যে চাই দেশ কাল সমাজের প্রত্যেক মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। আলাপ আলোচনা, পরিকল্পনা।

সুকুমার আবার ভূপালবাবুকে আবেদন জানাল, এ অঞ্চলের সব মানুষকে, কলোনীর মানুষের সঙ্গে এক জায়গায় বসিয়ে একটা আলোচনা করাবার জন্যে। একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে। যাতে গ্রামের মানুষ কলোনীর মানুষ সবাই বাঁচতে পারে। এ বিপদের দিনে আত্মরক্ষা করতে পারে। একটা পথ—বাঁচার পথ চাই-ই চাই—

তখন সকালবেলা। হঠাৎ একটা মোটরের শব্দ হল। পরক্ষণেই পথের ওপর মাইকের বক্তৃতা বেজে উঠল। ভূপালবাবু আর সুকুমারের আলোচনা থেমে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এল।

পথের ওপর মোটর ভ্যান দাঁড়িয়ে। চারদিকে গ্রামের আবালবৃদ্ধের ভীড়। ভ্যানের মধ্যে ড্রাইভারের পাশে রামবাবুর ভাই লক্ষণ মণ্ডল বসে। তিনি লাউডস্পীকার মারফৎ সংবাদ পরিবেশন করে চলেছেন: কৃষ্ণনগর থেকে বন্দীপুর ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলোর ভিতর পর্যন্ত মোটর ভ্যান চালানোর হুকুম পেয়েছি। এতকাল আমাদের ক'মাইল হেঁটে গিয়ে তবে মোটর ধরতে হত শহরে যেতে হ'লে। এখন বাড়ি থেকেই সবাই উঠতে পারবে। শুধু তাই নয়, এবার ব্যবসার সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি। শহর থেকে মাল আমদানী সহজ হবে। খরচা কম হবে। এখান থেকেও মাল শহরে নিয়ে যেতে পারবে এই গাড়ীতে করে। আর যাত্রীদের ভাড়া ভবিষ্যতে আরও কমবে, যদি রাস্তাটা আরও ভাল হয়, যদি সবাই মিলে দাবী জানায় তা'হলে এই কাঁচা রাস্তা

পাকাও হতে পারে। তাহলে তখন বারমাসই এ গাড়ী চলতে পারবে। গ্রামের লোকের আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

একে মোটরভ্যান। তার ওপর মাইকে কথা হচ্ছে। বলছেন লক্ষণ মণ্ডল। গ্রামের মানুষজন ভেঙে পড়তে লাগল পথে। ছোটবাবু মটর এনেচে রে—আমাদের ছোটবাবুর গাড়ী—ছোটবাবু কি বলচে মাইকে—

ভ্যানের ড্রাইভার কৃষ্ণনগরের লোক। কনডাক্টার অরুণ ঘোষ। সে কৃষ্ণনগরে বাসা করেছে। সপরিবারে বাস করছে। শ্বশুর আপত্তি তুলেছিল। ও শোনেনি। ছোটবাবু কম উপগার করেচে? লেটেলের চাকরী থেকে গাড়ীতে ঢুকিয়ে নিয়েচে। ছোটবাবু বলচে শহবে বাসা করতে। সেটা শুনবে না সে।

অরুণ ঘোষ বন্দীপুরের জনতার মধ্যে নেমে এল। সবাই ঘিবে ধরলো ওকে,—অরুণদা— অরুণ যে—।

বন্দীপুরের সে অরুণ ঘোষ আর নেই। এখন খাঁকীর লং প্যাণ্ট আর একটা হাফ সার্ট ওর পরণে। পায়ে কাবলী জুতো।

ছোকরাদলের কেউ কেউ ওর জামায় হাত দিয়ে বললে, বেশ জামা পরেচ ত!

হ্যাঁ। অরুণ ঘোষ হেসে বললে, গাড়ীব কাজ ত। এ নাহলে মানায় না। বলে নিজেই সে একবার তার পোষাকের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল। সত্যি কত আরাম পোষাকে। আর মানুষেব ঢঙই বদলে যায়। জেল্লাই অন্যরকম।

বন্দীপুরের অসহায় মানুষগুলো অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে লাগল। কপাল যে কার কখন ফেরে। এইজন্যেই বলে বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল—।

লক্ষ্মণ মণ্ডল মোটর নিয়ে সারা ইউনিয়নটায় প্রচারে বেরিয়েছেন। হাবুল কর্মকারের গ্রামে, ঠিক তার বাড়ীর সামনে যেতেই হাবুল কর্মকাব একটা ফুলের মালা নিয়ে বেরিয়ে এল। তার পিছনে বাড়িব মেয়েরা। সে আগে থেকেই লক্ষ্মণ মণ্ডলের এই আগমন সম্ভাবনার কথা জানত।

ফলে আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। হাবুল কর্মকার এগিয়ে এসে ভ্যানটার বনেটের ওপর মালাটা পরিয়ে দিল। মেয়েরা ঘড়া ভর্তি করে আনা জল গাড়ীর চাকায় ঢালল। উলু দিয়ে উঠল। লক্ষ্মণ মণ্ডল অভিভূত হয়ে পড়লেন। গাড়ী থেকে নেমে আবেগে হাবুল কর্মকারকে জড়িয়ে ধরলেন।

ভ্যানের রুট পারমিট পাওয়ার আগেই লক্ষ্মণ মণ্ডলের বন্ধুরা বলেছিলেন, ব্যবসাতেই সুখ। কিন্তু যুগ বুঝে, অবস্থা বুঝে ব্যবসার ভোল পাল্টান দরকার। সে যে পারে সেই বুদ্ধিমান। তার অর্থও থাকে, সম্মানও থাকে। সকল সময় নজর রাখা দরকার যে অঞ্চলে ব্যবসা হবে, সেখানে কোন্ জিনিশের অভাব, তার সম্পর্কে সেখানকার মানুষের মোহ কতখানি, আর তারা সে ব্যবসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অজ্ঞ কিনা? যদি তাই হয়, আর দেখার নেই। চোখ কান বুজে নেমে পড়। মুনাফা আর ইজ্জত দুটোই উঁচুতে থাকবে।

গ্রামে এসে লক্ষ্মণ মণ্ডলের এবার সেই ধারণাই অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াল। সবাই খুশী। বলাবলি করছে, জমিদার বংশ এবার পাশ্চিত্তিব করচে। মানুষের ভালর দিকে নজর দিয়েচে এবার।

লক্ষ্মণ মণ্ডল সবচেয়ে খুশী হলেন হাবুল কর্মকারের এমন ব্যবহারে। তাই আবেগে জড়িয়ে ধরলেন।

হাবুল কর্মকারেরও আবেগ কম নয়। রামবাবুব অবর্তমানে সেই নেতৃত্ব, সুযোগ সুবিধা সব গ্রহণ করেছে। ভয় ছিল লক্ষ্মণ মণ্ডল যদি ফিরে এসে গদী দখল করে। তার পরিবর্তে ভ্যান নিয়ে ব্যবসা করতে এসেছেন। কাজেই হাবুল কর্মকার নিষ্কটক। তাই লক্ষ্মণ মণ্ডলকে জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চায় না।

লক্ষ্মণ মণ্ডল মোটর ভ্যান চালু করলেন। গ্রামের মেঠো পথ, পাড়ার ঘর বাড়ির পাশ দিয়ে দিয়ে তাঁর গাড়ী শহরে চলে যায়। শহর থেকে আবার ফিরে আসে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়। এই দুর্গম গ্রামাঞ্চলে এ ত এক রোমাঞ্চকর ঘটনা বটেই। মোটর চলে যায়

সশব্দে। আর মোড়ের মাথায় কিংবা ওই রকম বিশেষ বিশেষ জায়গায় এসে অরুণ ঘোষ হাঁকে, যাবে—যাবে—কেষ্টনগর, গুয়াড়ী– শহর বাজার —এই—চলে এস—কে যাবে—।

লক্ষ্মণ মণ্ডলের মোটর কলোনীর পাশ দিয়েও যায়। সেখানেও অরুণ ঘোষ অমনি করে হাঁকে, যাবে—যাবে - কেষ্টনগর, গুয়াড়ী, শহর বাজার—।

হাঁক শুনে আর মোটরের শব্দ শুনে কলোনীটা নড়ে ওঠে। একটা ক্ষীণ ছবি, আর তাকে ভিত্তি করে বিচিত্র রঙীন স্বপ্ন যেন বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে যায় কলোনীতে। ওই কৃষ্ণনগর ওরা এখানে আসবার পথে দেখেছে। আরও ক'বার নানা কাজে গিয়েছে ওরা ওখানে।

ওখানে কত আলো, কত ফুর্তি—এমন করে মন গুমড়ে পড়ে থাকতে হয়না। দুঃখ কষ্টকে বেশ ভুলে থাকা যায়।

কলোনীর মানুষের হাতে টাকা এসেছে। ঋণ পেয়েছে। কিন্তু তারপর তাকে কাজে লাগানর মত কাজই এখনও করে উঠতে পারেনি কেউ। কলোনীর মানুষ বেকার। কলোনীর মানুষ ছিন্নমূল হয়ে এসেছে। কলোনীর মানুষের সমাজ অসংবদ্ধ। এ পরিবেশ কতক্ষণ সহ্য হয়?

কলোনীর পাশে এসে লক্ষ্মণ মণ্ডলের ভ্যান দাঁড়ায়। অরুণ ঘোষ হাঁক দেয়। প্যাসেঞ্জার ডাকে। তার একটু পরেই কলোনীব ছোকরাতে ভ্যান ভর্তি হয়ে যায়। আবার তারা রাতে ফিরে আসে। পরিবারের লোকজন প্রশ্ন করে কোথায় গিয়েছিলি সব?

কৃষ্ণনগর।

কেন?

ব্যবসাপত্তর একটা কিছু করতে হবে ত। যাহোক করে খেতেই হবে। শহর বাজার ছাড়া কোন কিছুর হালচাল বুঝা যায়? ওখান থেকেই ত মালপত্তর আনতে হবে। পরিবারের লোকে আবার প্রশ্ন করে, কি বুঝলি?

ওরা উত্তর দেয়, সে কী একদিনের কাজ? তারপর তারা ঘরে ঢুকে থলি থেকে বার করতে থাকে, চায়ের কাপ ডিস, কাঁচের গ্লাস, সাবান,.

পাউডার, গন্ধতেল, সুদৃশ্য চিরুণী, ফিতে, আলতা—। খেতে বসে গল্প করে, কোন কোন রেষ্টুরেণ্টে কি কি পাওয়া যায়। সিনেমায় কোন বই হচ্ছে। কত ভাল নাচ গান হল্লা আছে। কি তার কাহিনী।

এর আকর্ষণ কম নয়। পরদিন সকালে মোটরের আবার শব্দ হয়। অরুণ ঘোষ আবার হাঁক দেয়। ওরা আবার ছুটে যায়। সঙ্গী বাড়তে থাকে দিন দিন। পরিবারের লোকজনকে বলে, ব্যবসা বাণিজ্যের হালচাল জানতে যাচ্ছে।

নেতা হওয়ার বিপদ অনেক। কলোনীর অবস্থা দেখে গৌরীশংকর বিপন্নবোধ করল। কলোনীর আর একজন নেতা শ্রীমন্ত আইচের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল। কি করা যায় এখন? এমনি করে টাকা ওড়ালে ত সব ফতুর হয়ে যাবে আবার।

শ্রীমন্ত আইচ বললে কি বলব?

গৌরীশংকর বললে, এত কাণ্ডর পর কলোনীটা ভেসে যাবে? একটা যা হয় ব্যবস্থা করুন।

শ্রীমন্ত আইচ একদিন সময় নিল। বললে, কালকে ভেবে বলব।

পরদিন গৌরীশংকর দেখে শ্রীমন্ত আইচের ঘরের সামনে একখানা গরুর গাড়ী লেগেছে। শ্রীমন্ত আইচ সংসারের জিনিসপত্র তুলছে।

গৌরীশংকর ছুটে গেল। কি ব্যাপার শ্রীমন্তদা?

শ্রীমন্ত আইচ হেসে বললে, ভাই কলোনীতে থেকে ব্যবসা চলবে না। উষাগ্রামের রহিম সেখ সাহায্য করছে। ঠিক বর্ডারের এপারে একটা মুদীর দোকান দেব। ওখানেই বাস করতে হবে সেজন্য। রহিম সেখ থাকবার বাড়ির বন্দোবস্তও করেছে।

গৌরীশংকর স্তব্ধ হয়ে গেল। কলোনীর অন্যান্যরা এসে বাধা দিল। কলোনী থেকে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না।

বেশ। খালি গরুর গাড়িতে শ্রীমন্ত আইচ নিজেই উঠে বসল। আমাকে ত দোকান খুলতে যেতেই হবে। গৌরীশংকর উপদেশ চেয়েছিল। তাকে বলে গেল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। অনেক কষ্টে নিজের

হিল্লে করেছি। পরের কথা বলব কি করে? তুমিও এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না ভাই। নিজের পথ দেখ।

শ্রীমন্ত আইচ গিয়ে রহিম সেখের সঙ্গে যোগ দিল? হাবুল কর্মকার খবর পেয়ে কলোনীতে ছুটে এল। রামবাবুর অবর্তমানে রহিমই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে কলোনীর একজন হিন্দুকে কেড়ে নিল? অথচ শ্রীমন্ত আইচ তার সঙ্গেও পরামর্শ করেছে কতদিন। বলেছে, এখানে কিছু করা যাবে না। থাকবেও না কেউ। হাতের টাকাগুলো ফুরোতে যা দেরী। তারপর চালের টিন বেচবে সব, জিনিশপত্তর বেচবে। শেষে সাবেক কালের সাধকে রেখে দিয়ে চলে যাবে সব। তার আগেই নিজের হিল্লে একটা করতেই হবে। আপনি যদি বলেন, আপনার সঙ্গেও একটা কিছু যা হোক ব্যবসা পত্তর খুলতে পারি।

রহিম সেখ জোগাড় করল সেই শ্রীমন্ত আইচকে।

হাবুল কর্মকার কলোনীতে এসে শ্রীমন্ত আইচের কীর্তিকলাপ চুপ করে শুনল। তারপর বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল, একটা কাজ ও ঠিকই করেচে। কলোনীর বাইরে গিয়ে দোকান খোলা। তোমরাও যদি বাঁচতে চাও, অমনি যা হয় করবার চেষ্টা কর। আর এক কাজ, হাতের ওই ক'টা টাকা পুঁজি। ওতে আরও কিছু টাকা না হলে ভাল কিছু করা যায় না। তোমাদের আরও কিছু টাকার একটা মতলব বলে দিতে পারি। এই ঘরের সব টিনের চালাগুলো বেচে দাও। তার বদলে, ওই সব গাঁয়ের মধ্যেকার উঠে যাওয়া মোচনমানদের ঘরগুলো দখল কর। হয় সেখানে উঠে গিয়ে বাস কর। না হয় চালা কেটে এনে এখানে বসিয়ে নাও। আর ওই টিনগুলো আমিই না হয় কিনে নেব। তোমাদের কেনা দামের ওপর বাণ্ডিলে পাঁচটাকা করে বেশী দেব। কণ্ট্রোলের, আবার লোনের টাকার জিনিশ বাইরে কেউ কিনতে সাহস করবে না। তাই আমিই কিনব নাহয়। তোমাদের সুদিন এলে, টিনের ঘর কেন, দালান হতে পারে। কিন্তু এখন খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।

খুবই সুযুক্তি। টাকা—টাকা—চাঁদির জুতো। ও জিনিশ যত বেশী হাতে থাকে ততই মঙ্গল।

মুসলমান পাড়ায় কিন্তু চালা ভাঙতে গিয়ে বিপদে পড়ল কলোনীর মানুষ। হাবুল কর্মকারের কথা মত ওদের ধারণা হয়েছিল বোধ হয় ওগুলো বে-ওয়ারিশ মাল হবে। কিন্তু গ্রামের হিন্দু আর খৃষ্টানরা ছুটে এল। কারা চালা ভাঙতে এয়েচে? কার হুকুমে? সরকারী পুষ্যিপুত্তুররা অত টাকা পয়সা পেয়েও সুখ পাচ্চে না? পঙ্গপালএর ঝড় নাকি? চলে যাও বলচি, সরে পড়।

কথা শুনে রাগ হয়। কিন্তু ওরা সংখ্যায় বেশি। তবু পাকিস্থানের বাঙাল বলে আত্মম্ভবিতা আছে কলোনীর মানুষের। ওরা বাঙাল। বুদ্ধি বেশি, শক্তি বেশি, সাহস বেশি। পরাজয়কে চেনেনা। তাই ফিরে আসবার সময় বললে, মিঞা হয়ে গেলেই হয় সব। হিন্দু খাঁরিষ্টান থেকে ভোল করা কেন?

গ্রামের লোক শুধু বললে, যাও বাবু যাও। সরে পড়।

কেউ কেউ ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

গোবিন্দলালের দল কিন্তু অত সহজে ছাড়ল না তাদের। কলোনীতে এসে বললে, আপনারা এ পথে নামলেন কেন? সরকার আপনাদের টাকা দিচ্ছে, সৎ নাগরিক আপনারা এমন কাজ করতে যান কেন?

উদ্বাস্তুরা প্রসঙ্গ পাল্টে বললে, সরকারী টাকায় কি হবে? না ব্যবসা, না চাষ হবে ও টাকায়। ব্যবসা জমতে, চাষের ফসল ফলতে যে সময় লাগবে—তার মধ্যে আমরা কি করব?

আমরা কি খাব? কি করে বাঁচব?

গোবিন্দলাল বললে, হ্যাঁ, এই খেতে না পাওয়ার দলে আপনারা একা নন। আপনাদের হাতে তাও কিছু টাকা আছে এখন। কিন্তু এই সব গ্রামের বহু মানুষ আছে যাদের হাতে একটা পয়সাও নেই। ঘরেও অন্ন নেই। আপনাদের চেয়েও দৈন্যদশা গাঁয়ের সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাদের কথাও ভাবতে হবে। সবাই এক জোট হয়ে দাবী জানালে সরকার নিশ্চয়ই শুনবে। শুনতে বাধ্য হবে।

কি করতে হবে? প্রশ্ন উঠল।

যতদিন চাষের কাজ না হয়, যতদিন ব্যবসাপত্তর না জমে ওঠে,

ততদিন সরকারকে খেতে দিতে হবে। বসে বসে খাওয়া নয়। কাজ করে পয়সা নেবে সবাই। বর্ষা পার হয়েছে। গাঁয়ে মোটর চলছে। এখন রাস্তা ঘাটগুলো আরও ভাল হওয়া দরকার। তার জন্যে সরকার থেকে টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত এখনই। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই দাবী তুলি।

গোবিন্দলালের দল দাবীর ধ্বনিটা শুনিয়ে দিল ঃ

টেষ্ট রিলিফ—চালু কর, চালু কব।
আমাদের দাবী—মানতে হবে, মানতে হবে।

গোবিন্দলালদের কোন কার্যকলাপ আর ধ্বনিকেই সহ্য করতে পারে না হাবুল কর্মকার। কিন্তু এই টেষ্ট রিলিফের ধ্বনিতে খুশী হয়ে উঠল। হোক, হোক, টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু হোক। প্রত্যেক বছরই টেষ্ট রিলিফের কাজ কিছু-কিছু হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে রামবাবুব মারফৎ হয়। রামবাবু ভাইএর নাম দিয়ে নিজেই সে কাজটা নিয়ে থাকেন। তারপর হাবুল কর্মকারকে তদারকী করতে দেন। হাবুল কর্মকার জানে এর কোথায় কি সুখ আর সুযোগ। হাজার হাজার টাকার কাজ। রামবাবু সব ভোগ করতেন। এবার রামবাবু নেই। এবার হাবুল কর্মকার আর রহিম সেখ আছে। হাবুল কর্মকার ঠিক করল, রহিমকে হটাতেই হবে। রাতে শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করল, রামবাবু দিদির বাড়ি গিয়েছেন। সেখানে গিয়েই ডেকে এনে কাজ গুছিয়ে নিতে হবে আজ কালের মধ্যেই।

সকালে উঠেই হাবুল কর্মকার কাজ গুছোতে ছুটছিল। কিন্তু বন্দীপুর গিয়েই শুনল, রামবাবু গাঁয়ে ফিরেছেন।

হাবুল কর্মকার উৎসাহ নিয়ে ঠাকুর মন্দিরে ছুটে গেল। গিয়ে দেখে মন্দিরের পিছনে একখানা বিরাট চকচকে, চকলেট রঙের মোটরকার দাঁড়িয়ে। হাবুল কর্মকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি ঝুঁকি দিতেই রাধারমণ ঘোষের সঙ্গে দেখা হল।

স্যার, কি ব্যাপার ?

রাধারমণ ঘোষ বললেন কলকাতার ব্যবসায়ী কে রামতারণ চৌধুরী এসেছেন। রামবাবুকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ির মধ্যে আছেন। রামবাবু বলেছেন, কারও সঙ্গে এখন দেখা করবেন না। হাবুল কর্মকার খানিক তাকিয়ে থাকল বোকার মত। বার বার তাকাল চকচকে বিরাট মোটর গাড়ীটার দিকে। চিন্তা করে দেখল। হ্যাঁ, রামতারণ চৌধুরীর নাম রামবাবুর কাছে শুনেছে। কলকাতার ব্যবসায়ী। রামবাবুর বন্ধু।

হাবুল কর্মকার আর তখন রামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সাহস করল না। ফিরে এল। কিন্তু নজর রাখতে লাগল, কখন রামবাবু বার হবেন। প্রথমেই সে নিজের কাজটা করে নেবে।

রামতারণ চৌধুরী তিনদিন থাকলেন। রামবাবুর সঙ্গে কাটালেন।

রামবাবু শোকার্ত। খুকুর মৃত্যুর পর তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। আর বাড়িতে ঢোকেননি। রামতারণ চৌধুরীর সঙ্গে আবার বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়িতে, ঘরে, বাইরে সর্বত্র খুকুর স্পর্শ ছড়িয়ে আছে। রামবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। না, না, আমি আর এখানে থাকব না। থাকতে পারব না। প্রথম দিন কাটল তাঁকে অশোকচিত্ত করতে। রামতারণ চৌধুরী অনেক করে বোঝালেন, দেখ রামচন্দ্র তুমি বড় শোক পেয়েছ। কন্যাশোক, সন্তান-শোক, চরমশোক। আমারও দুঃখ কম হচ্ছেনা। যেন এমন অবস্থা কোন মানুষের না হয়। কিন্তু আমি কামনা করলেই ত সেটা বন্ধ হয়ে যাবে না। যুগ যুগ ধরে আমার মত কত লোক এমনি অকল্যাণ থেকে মুক্তির কামনা করছে। তবু মানুষ আজো এ শোক পায়। তবে সুখের কথা আমরা ভারতবর্ষে জন্মেছি। শোক তাপ দুঃখ বেদনাকে এ মাটি লজ্জা দিয়েছে চিরকাল। যুগে যুগে ওদের পরাজিত করেছে এদেশের অধ্যাত্মচেতনা। কত শ্লোক, কত শাস্ত্র আলোচনা, কত সত্য উপলব্ধি হয়েছে এদেশে। এদেশের মানুষ বলেছেন, জগত মিথ্যা মায়া। বারবার ঘোষণা হয়েছে এদেশে, শুধু নিজের কর্ম করে যাওয়াই জীবনের

সত্য। নিষ্কাম কর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন, শোক তাপ করা মূঢ়তা। সত্যিই। বুঝলে রামচন্দ্র, গীতা আমাদের ভারতবর্ষের এক অবাক বিস্ময়। গীতা—অমৃত। আমার মনে হয় তোমার এ মনের অবস্থায় রোজ গীতা পাঠ করা উচিত। তাহলে আনন্দ পাবে।

তোমার গীতা আছে ?

গীতা ? রামবাবু খানিক চিন্তার পর বললেন, বাবা পড়তেন শেষ জীবনে। সেখানা থাকতে পারে। বাবার মৃত্যুর পর সে আলমারিতে ত আর হাত দিইনি। বন্ধই আছে।

রামতারণ চৌধুরী বললেন, এবার খুলো।

হ্যাঁ, খুলবো।

হ্যাঁ, খুলো।

বক্তৃতা দিতে দিতে রামতারণ চৌধুরী হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। গলায় একপেগ ঢেলে দিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অন্য গ্লাসটি রামবাবু তুলে নিলেন। ওঁর পুরান দিনের কথা মনে পড়ল। কলকাতায় এই রামতারণ চৌধুরীর বাড়িতে এককালে কি আড্ডাই ছিল। তখন রামবাবুর কলকাতা অন্ত প্রাণ ছিল। আর এই পেগের পর পেগ। সে সব দিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায় ?

রামতারণ চৌধুরী আরেক পেগ গলায় ঢেলে বললেন, বুঝলে, গীতা পড়ো, আনন্দ পাবে।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে রামতারণ চৌধুবী আরম্ভ করলেন ঃ

রামচন্দ্র যাই বলো, বিষয়-কর্ম একেবারে ত্যাগ করা মোটেই উচিত হয়নি। ভাই অর্বাচীন হতে পারে। তাই বলে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবে ? তুমি জমিদার, নেতা, মোড়ল। অথচ গ্রামের লোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বলে হাল ছেড়ে পিছিয়ে এলে ? এ তোমার কেমন বুদ্ধি ? হ্যাঁ, এক বলতে পার টাকার অভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওটা কি একটা কারণ হোল ? ইচ্ছে থাকলে কি না হয় ? ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব ? আমার কাছে যেতে পারতে না ?

যাইহোক, এখন আবার বলছি, গ্রামের আধিপত্য ছেড়ো না। এ বড় সাংঘাতিক সময়। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। এখন অরাজকতা চলেছে। বেশী সতর্ক থাকা দরকার। স্বাধীন হয়েছি বলে যদু মধুর দল দেশের মাথা হতে পারে না। পা যদি বলে হাতের কাজ করব, হাত যদি বলে মাথার কাজ করব, তাকি হবে? মাথা সকলের ওপরে থাকবেই। আলো বাতাস, আরাম একটু বেশী পাবে বৈকী। আর পা-কে, মাটিতে, জলে কাদায় ধুলোয় মাখামাখি হতেই হবে। এ ঈশ্বরের বিধান।

ইংরেজ এসে এদেশের মাথাদের মাথায় পা দিয়ে বসেছিল। তাইত এত স্বদেশী করে তাকে তাড়ান হোল। তোমার মাথা যদি কেউ চেপে ধরে, তুমি হাত পা ছুঁড়ে ছাড়াতে চেষ্টা করবে না? স্বদেশী করাও তেমনি জিনিস। ইংরেজের পা সরান হোল, যাতে আলো বাতাস ভাল করে লাগে। যাতে দেশের মাথা ভাল থাকে। যাতে তার বাড়বৃদ্ধি হয় ঠিক মত। কাজেই তোমরা এ্যাদ্দন দুঃখের সময় মাথা হয়ে কষ্ট ভোগ করলে। এবার দিন এসেছে। এখন তোমাদের ওপরেই ভরসা। কাজেই তুমি অমন করে থাকলে আমরা শুনব কেন? আমাদের সমাজের অনেক দাবী তোমাদের কাছে। আমি বলছি কাজে মন দাও, দেখবে শোক তাপ দূর হয়ে যাবে। তোমার ব্যবসাগুলো আবার আরম্ভ কর মন দিয়ে। টাকার ভাবনা নেই। আমি দেব। যথাসাধ্য সাহায্য করব। ব্যবসা থেকে আরম্ভ করে ক্ষমতার কোন পদই এখন হাতছাড়া করা উচিত নয়।

রামবাবুর মনে পড়তে লাগল, বাউণ্ডুলে গোবিন্দলালদের। হাবুল কর্মকার আর রহিম সেখ অংশীদার হয়ে মুনাফার ভাগ নিচ্ছে, তার ওপর কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব স্পর্দ্ধা—হ্যাঁ টাকা পেলে আবার ওদের পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া যায়। দেওয়া দরকারও।

তৃতীয় দিনের বৈঠকে রামতারণ চৌধুরী বলতে আরম্ভ করলেন:

জানোত রামচন্দ্র, স্বাধীন দেশে এবার প্রথম সাধারণ নির্বাচন হতে

চলেছে। ঠিক করেছি আমি দাঁড়াব এ অঞ্চল থেকে।

এ অঞ্চল? রামবাবু অবাক হলেন।

রামতারণ চৌধুরী বোঝালেন, আমরা ত দুর্লভপুরের লোক। ঠাকুর্দা অবধি ওখানে বাস করেছেন। তারপর ঠাকুর্দাই কলকাতায় চলে যান ব্যবসা করতে। তারপর থেকে নানাকাজের চাপে আর কেউ এ অঞ্চলে আসতে পারিনি। তবু আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে ত এখানেই। তাই ঠিক করেছি এখান থেকেই দাঁড়াব। স্বাধীন দেশে আবার নিজের লোকজনের কাছে ফিরে আসতে চাই। তাদের সেবা করতে চাই।

রামবাবু খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, কেশনগরের দাদাদের বলেছেন?

রামতারণ চৌধুরী বললেন, শুধু কৃষ্ণনগর? কলকাতার দাদাদের সঙ্গেও আলোচনা হয়ে গেছে। কারও আপত্তি নেই। তবে তোমার মতটা নেওয়ার জন্যেই ছুটে এসেছি। তোমাদের কাছে আমার বক্তব্য আছে। কেন আমি দাঁড়াতে চাই?

হ্যাঁ, ইংরেজের সঙ্গে লড়াইএ ঠিক আমরা যোগ দিইনি সত্যি। কিন্তু দেশত শুধু লড়িয়েদের নয়। আমাদেরও। কাজেই এই প্রথম নির্বাচনে দাঁড়ান দরকার আমাদের। এবারই স্বাধীন দেশের সব আইন গড়ে উঠবে। আর সেই আইনের পাকেই এদেশ ঘুরবে। এসময় সতর্ক থাকা দরকার। এখন যদি ওই সব যদু মধুরা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারা আইনের শ্রাদ্ধ করবে। দেশটাকে ত অচল করে দেবে।

এই যে বিনা রক্তপাতে দেশ স্বাধীন হোল, কারও ক্ষতি হোল না, স্বার্থহানি হোল না, যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক তেমনি থেকে গেল, পরম শান্তির মধ্যে দেশ স্বাধীন হোল, এতে আমরা জগতের বিস্ময় হয়েছি। এখন যদি ওই ওদের হাতে আইন তৈরীর ভার গিয়ে পড়ে তাহলে, এর সমস্ত গৌরব, মর্যাদা, সব নষ্ট হয়ে যাবে। এদেশ নরকে চলে যাবে।

তাই আমাদের এখন দলবদ্ধভাবে আসনগুলো দখল করতে হবে।

যদি আমরা আমাদের মনের মত করে আইনগুলোকে একবার গড়ে নিতে পারি, বাস, সে শান্তি আর কেউ সহজে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তোমাদের মতামত নিতে এসেছি। এখন বল তোমাদের সাহায্য পাব কি না—।

কৃষ্ণনগর এসে তোমার কথাই শুধু শুনলাম। সবাই বললেন, তুমি যদি সহায় থাক, তাহলে আর ভয় নেই। শুনে তাঁদের বললাম, রামচন্দ্র? সেত আমার বন্ধু।

তাঁরা অবাক হলেন। বললেন, তবে ত কথাই নেই।

রামবাবু পুলকিত হলেন। হাসছিলেন। রামতারণ চৌধুরী বললেন, কিন্তু একটা কথা।

কি?

শুনেছি এখানে মুসলমানদের ভোটই বেশী ছিল। তারা নাকি অনেকেই পাকিস্থানে চলে গেছে। আর খৃষ্টান হিন্দুদের মধ্যে নাকি ঝাণ্ডা নিয়ে মাতামাতি চলছে খুব?

রামবাবু অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বললেন, তাতে কি হয়েছে?

তবুও সন্দেহ হয় তো। কি হবে না হবে—।

রামবাবুর পুঞ্জীত আক্রোশ আর বাধা মানল না।

তিনপুরুষ ধরে আমরা চিনিনে ওদের? জানিনে ওদের দৌড়? ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা থাকত। এখন নাহয় তার বদলে কিছু রেস্ত লাগবে।

আশান্বিত রামতারণ চৌধুরী বললেন, সে দেওয়া যাবে। দু'এক টাকা থেকে ত না হয় বড়জোর পাঁচ টাকার মামলা।

যথেষ্ট। রামবাবু বললেন, ওই ওদের ভাগ্যের জোর। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে, আর মাথাপিছু একটা করে ভোট হয়েছে বলেই এ কদরটা পাবে। নইলে সাতদিন মাথাকুটেও পাঁচ টাকা উপায় করা মরদের কাম।

সামান্য একটা কাগজ ভোটের ঢপে ফেলে পাঁচ টাকা। যথেষ্ট যথেষ্ট। ওসব ঝাণ্ডাপাণ্ডা—ওরাও ছুটে আসবে লোভে। রেস্ত ছড়িয়ে যখন ডাকা হবে তু করে, কাঙালের দল ছুটে আসবে। তখন যদি

বাউণ্ডুলেরা বোঝাতে চায়, ঠ্যালা বুঝবে। ডালকুত্তোর মত সব ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। আমরা তখন শালাদের দেখাব। দেখে নেব। শালা—রাম মণ্ডল এখনো মরেনি—শালা—।

তিন দিন পরে কাজ সেরে রামতারণ চৌধুরী ফিরে গেলেন।

হাবুল কর্মকার ওত পেতেই ছিল। টেষ্ট রিলিফের কাজ শিগগিরই হতে পারে। ওটা নিতে হবে।

তিন দিন পর রামবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। হাবুল কর্মকার ছুটে যেতেই রামবাবু বললেন, এইযে হাবুল, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

হেসে গদগদ হ'ল হাবুল কর্মকার।

রামবাবু বললেন, আমি আর ভাগে কোন কারবার করতে চাইনে তোমাদের সঙ্গে। একাই আবার সব ব্যবসা আরম্ভ করব। আগের মতোই। তারচেয়েও জোর দিয়ে। এ-কথাটা তোমাদের জানিয়ে দিতেই ডাকছিলাম।

হাবুল কর্মকারএর কানে সব কথাগুলো গিয়েও যেন গেল না। রামবাবু কি বললেন। কি শোনালেন।

হাবুল কর্মকার জীবনে কখনো নেতা হবার আশাও করেনি। তবু ঘটনাচক্রে যখন সে সম্ভাবনা দেখা দিল, সে তৈরী হল, তখন রামবাবু এমন কথা শোনালেন?

রাস্তায় চলতে চলতে হাবুল কর্মকারের ইচ্ছে হতে লাগল, তার গায়ের মেটে রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবীটা টেনে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে দেয়। খাটো মোটা খদ্দরের ধুতিটার ভার যেন দুঃসহ। খুলে দিতে পারলেই মুক্তির আরাম মেলে। কিন্তু না। সে জামার বোতামের কাছটা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল, দেখে নেব। আমি দেখে নেব। আর কোন কাজে রাম মণ্ডলের একটিনি করব না। কেষ্টনগর যাব, নেতাদের সঙ্গে দেখা করব। বলব, আমিই আসল কর্মী। রাম মণ্ডল আমাকেই ভাঙ্গিয়ে খায়। আমাকে কাজ দিয়ে পরীক্ষা করা হোক। না হোলে আমি আর থাকব না আপনাদের দলে।

গ্রামে ফিরে হাবুল কর্মকার শুনল, অরুণ ঘোষ দেখা করতে এসে বসে আছে। সে লক্ষ্মণ মণ্ডলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণ মণ্ডল গাড়ী বেচে দেবে।

হাবুল কর্মকার এক নোতুন আলো দেখল যেন। বলে উঠল, ছোট কর্তা গাড়ী বেচে দিচ্ছে ?

হাবুল কর্মকার বিকেলেই কৃষ্ণনগর রওনা হয়ে গেল।

হ্যাঁ। লক্ষ্মণ মণ্ডল অনেক সাধ করেই মোটর ভ্যান কিনেছিলেন। কিন্তু বেইমান—ওই অরুণ ঘোষ। ওর জন্যেই ভ্যান বেচতে বাধ্য হলেন। ওই অরুণ ঘোষ আর বৌ—ওদের জন্যে কি না করেছেন, দাদাকে ছেড়েছেন, গাঁয়ের সম্বন্ধ ছেড়েছেন। আর ওই অরুণ—বরকন্দাজ হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হ'ত গাঁয়ের অন্ধকূপে। ওকে এনে কন্‌ডাক্‌টারী দিয়ে, শহরে বাসা করে দিয়ে, আলো বাতাসের মুখ দেখিয়ে উদ্ধার করেছেন।

কিন্তু নেমকহারাম, হারামজাদা, বেইমান। দুদিন শহরে এসেই পাখা গজাল। বদমন্তর সব শিখে নিল। আপন হ'ল ওই সব ড্রাইভার কন্‌ডাক্‌টার, চ্যাংড়ার দল। সবাইকে বাসার মধ্যে ডেকে এনে বললে, দেখ, দেখে যাও সব। আমি বাড়ি থাকিনে, উনার কাজে যাই। মেয়েছেলে একা থাকে। আর—সেই সময়—

নির্লজ্জ কোথাকার। কে ও মেয়েছেলেকে এখানে এনেছে ? কে ওকে মানুষ করেছে ? কে ও মেয়েছেলেকে ওর ঘরে এনেছিল ?

অরুণ ঘোষ লক্ষ্মণ মণ্ডলকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। যা হয় হবে। যা ভাগ্যে আছে।

আর পাঁচজন ড্রাইভার কন্‌ডাক্‌টার বলেছে, ভয় কি ভাই। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা আছি ত।

তা সত্যি। তাদের হালচাল দেখে, কথাবার্তা শুনেই ত ওর মনে অত সাহস এসেছিল। ওরা কেমন বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে মান-মর্যাদার সঙ্গে থাকে। মালিক, মালিক। তার সঙ্গে অত খাতির কিসের ?

তার গাড়ীর সঙ্গে কাজ। কাজের কথা। মাইনে নেব সেই মত খেটে দেব। তারপরে মালিকও মানুষ, আমরাও মানুষ। মাইনে দিয়ে মালিক কি মাথা বলতে সব কিনে নিয়েছে?

এই সব শুনতে শুনতেই ত অরুণ ঘোষ মাথা তুলেছে। গাঁয়ে সে একা ছিল। এখানে তার মত কত জন। তাদের দল। ইউনিয়ন। ভয় কিসে?

অরুণ ঘোষ দলবলের জোরে এমন করল?

লক্ষ্মণ মণ্ডলেব মনেও জেদ চাপল। তার দলবল নেই? মোটর ব্যবসায়ী মালিকের দল? ওরা যদি ইউনিয়ন গড়ে একজোট হতে পারে, তবে ও'রাই বা এক হবেন না কেন? অন্ততঃ তাঁর মর্যাদার জন্যেও ওই অরুণকে চাকরী দেওয়া আর কারও উচিত নয়।

লক্ষ্মণ মণ্ডল সমগোত্রীয়দের কাছে আবেদন জানালেন। তারা বিষয়টাকে অন্যচোখে দেখে বললেন, এতে আপনারই ক্ষতি হবে। সামান্য একটা চুনোপুঁটিকে জব্দ করবার জন্য নিজের দুর্নাম বাড়িয়ে লাভ কি?

লক্ষ্মণ মণ্ডল ক্ষুণ্ণ হলেন। বন্ধুদের কাছে গিয়ে প্রতিশোধের পরামর্শ চাইলেন।

বন্ধুরা হেসে উঠলেন। আরে! একটা সাধারণ, সামান্য মেয়ে-মানুষকে এত গুরুত্ব দিতে যাচ্ছেন কেন? ও বেটাত স্বামীগিরি ফলাতে গিয়ে এমনিতেই ঠকেছে। এখনো ঠিক বোঝেনি বোধ হয়, এটা কি সাংঘাতিক কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ। আপনার টাকা আছে। ভয় কি? ভাল করে ব্যবসা ফাঁদান। আরও টাকা পিটে নিন—দেখবেন—ওকি মেয়ে—শহরের লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা সুন্দরী, রুচিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে পাবেন।

বিয়ের কথায় লক্ষ্মণ মণ্ডল চমকালেন। পূর্বস্মৃতি মনে হতেই বলে উঠলেন, না না। বিয়ে-থা আমি করব না।

বেশ ত। বিয়ে না করেন, ভোগ করবেন।

রহস্য নাকি! লক্ষ্মণ মণ্ডলের মনে হ'ল। তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন, এটা সংকটের যুগ। শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি—সব ফাঁকা আওয়াজ। টাকা না থাকলে, অন্ন না জুটলে, ওসব আনন্দময় ব্রহ্মের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারদের আজ সেই অবস্থা। আমরা ত বুঝি। আমাদের কোম্পানীতে একজন কর্মচারী দরকার হলে, কাঙালী ভোজনের মত ভীড় জমে যায়। স্বামী, ভাই, বাবার জন্যে তদ্বির করতে আসে কতজন। কত ছলাকলা। এত হামেশা হচ্ছে। হবেনা কেন? আগে ত প্রাণে বাঁচা। তারপর ত চরিত্র।—

লক্ষ্মণ মণ্ডল প্রশ্ন করলেন, ভদ্রঘরের মেয়েরা আপনাদের কাছে অমনি ভাবে আসে? আপনাদের খুশীতে মত দেয়?

হ্যাঁ। তা দেয়। আমাদের খুশীতে ভিড়তে পারলে ধন্য মনে করে নিজেকে। তবে আমরাই তাড়িয়ে দিই।

কেন?

টাকার জন্যে। টাকার দাম আরও বেশি। কাঞ্চনে কামিনী মেলে। কাঞ্চনে পৃথিবী মেলে। কাঞ্চনকে বশ করতে হলে তাই সাধনা করতে হয়। আর একবার কাঞ্চনকে বশ করতে পারলে, ওর টানে মানুষ সব ভুলতে পারে।

পারে? সব ভুলতে পারে? লক্ষ্মণ মণ্ডল উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁর অতীতকে ভুলবার একান্ত প্রয়োজন। তার জন্যেই তিনি ভ্যান বিক্রীর কথা ঘোষণা করে দিলেন। আরও টাকা উপায় করতে হবে। তার জন্যে তিনি অর্থোপার্জনের আরও মহৎ বৃহৎ রাজপথ-গুলোয় চলবার চেষ্টা করবেন। করতেই হবে।

হাবুল কর্মকার এসে দেখা করল। প্রশ্ন করল, ভ্যানে কি লোকসান যাচ্ছিল?

লক্ষ্মণ মণ্ডল বললেন, না হাবুলদা। সে ভয় তোমার নেই। নিশ্চিন্তে কিনতে পার। আমার অন্য কারণ ভ্যান বিক্রীর।

ভ্যান কিনবে বলেই ত তৈরী হয়ে এসেছে হাবুল কর্মকার। আর দ্বিধা করল না। বায়নানামা করে ফেলল। এবার সে স্বতন্ত্র ব্যবসা

করবেই। নেতা হবেই। রামবাবুর পাশাপাশি বসবেই। বায়নার দলিলখানা নিয়ে বাড়ি ফিরল হাবুল কর্মকার।

আর ভয় নেই। বায়না হয়ে গিয়েছে। রুট পারমিট সমেত ভ্যান কিনছে হাবুল কর্মকার। গ্রামে গিয়ে সংবাদটা ঘোষণা করতেই, হিতৈষীর দল ওর বাড়িতে এসে জমতে লাগল। আসুক। সুখের দিনে সবাই আসে। ভালোও লাগে। বড় জোর বিড়ি খরচা হবে দুটো বেশী। হোক।

সকালবেলা। পারিষদ নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছে হাবুল কর্মকার। তারই কথা। তারই গুণগান। জ্বরের মুখে চাটনির মত লাগে। আসর তাড়াতাড়িই জমে উঠেছিল। হঠাৎ সেখানে সামাদ এসে দাঁড়াল। জাবেদার ভাই সামাদ। শীর্ণ কংকালসার চেহারা। জীর্ণ লুঙি পরণে। কাঁধের ওপর শতছিন্ন গামছা।

সামাদ পাকিস্থান থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে কোন সুযোগ সুবিধা মেলেনি। থাকতে পারেনি পালিয়ে এসেছে। তবু চেনা জানা জায়গা। এখানে একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে, এই আশা। কিন্তু এখানে এসে দেখে তার ঘরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। চালা নেই। এমনি অবস্থা সে নিজেই করে দিতে চেয়েছিল। জাবেদা করতে দেয়নি। ঘর আচ্ছিরায়। তাকে ধ্বংস করা পাপ। অনেক পুণ্যবলে আচ্ছিরায় গড়ে ওঠে।

ওরা যাবার পর সেই ঘর ভেঙে নিয়েছে হাবুল কর্মকার।

সেটা ফেরৎ পাওয়ার আশাতেই হাবুল কর্মকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সামাদ।

হাবুল কর্মকার প্রশ্ন করল, তুই আবার এখানে এলি কবেরে?

কাল।

ফিরে এলি ক্যানে আপন রাজ্য থেকে?

পারিষদ দল হেসে উঠল। মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ল, ও ভারী স্যায়না। দুধও খাবে, তামাকও খাবে।

হাবুল কর্মকার চেঁচিয়ে উঠল, ওসব দালালি চলবে না। আমরা বুঝি। এখান থেকে সরে পড় বাবা। নইলে ঠ্যালা বুঝবা।

হ্যাঁ। পারিষদ দল হেসে উঠল।

রক্ত-মাংসের মানুষ সামাদ বেরিয়ে এল। চালা চাইবার অবকাশও পেল না। রহিম স্যাক নাকি ওর নাংগল গরু দুটো নিয়েছে। তার কাছে যাবে? পাকিস্থানে যাবার আগেও ত তার কাছে একবার গিয়েছিল। তখন যদি একবার বুলত, থাক সব। তাহলে এ নাকাল হোত না। জাত জ্ঞাত না ছাই। পাকিস্থানেও ত গিয়ে দেখে এল। সবাই ত জাত জ্ঞাত—।

তার চেয়ে সেই সরকারী ডাক্তারবাবু—কলোনীর সেই অপিছার-বাবু—উনারা যা করেলেন, ভুলবার লয়। ওসব দিল্—আলাদা জাতের মানুষ।

ডাক্তারবাবু আর এ গাঁয়ে নেই। থাকতে পারে না এমন জায়গায়। এই সব বন বাদাড়ে কখনো মানুষ থাকে? কলোনীর বাবু এখনও আছে। সামাদ বন্দীপুব ছুটল।

সুকুমারও আর নেই। গতকালও ছিল। মনে অনেক আশা ছিল। স্পষ্ট বুঝছিল কলোনী আর জমবে না। মানুষগুলো হন্যে হয়ে যাবে। তবু সে চেষ্টা চালাচ্ছিল সমানে। যদি বন্দীপুর ইউনিয়নের মানুষগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা যায়, একটা আলোচনার দ্বারা সমাধানের পথ পাওয়া যায় যদি।

তার আগেই, গতকাল কৃষ্ণনগর রিলিফ অফিস থেকে চিঠি এসে গেছে বন্দীপুর কলোনীর পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয়েছে। কাজেই কলোনীতে সরকারী দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। সেই সঙ্গে সুকুমারকে জানিয়েছে, তার চাকরীর মেয়াদ এখানেই শেষ হ'ল।

অর্থাৎ সুকুমারের আর কোন কাজ নেই। বেকার। এই বন্দীপুরে সে যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল, এতদিন এখানে থেকে, দিনের

পর দিন যে কাজের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে, সে সব অর্থহীন হয়ে গেছে এক নির্দেশ-নামায়।

বন্দীপুরে থাকার আর কোন অর্থ নেই। সে অবাঞ্ছিত।

সুকুমার জীবনে এতখানি অসহায়তা আর কখনও অনুভব করেনি। চিঠি পাওয়ার পর থেকেই মনে হতে আরম্ভ করল, তখনই গোপনে, সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে যায়। এ অঞ্চলের ত্রিসীমা ছেড়ে।

কিন্তু ভূপালবাবুর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া যায়না।

ভূপালবাবু খুবই ব্যস্ত। জীবনে কখনও সমাজ সেবা করেন নি। রাজনীতিও না। আজ তাঁকে ওপথে নামতে হয়েছে। জীবনের তাগিদে, মনুষ্যত্বের তাগিদে, বিবেকের তাগিদে।

ভূপালবাবু সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরবেন। রাতে দেখা হবে। কথা হবে। বিদায় নিয়ে নেবে তখন সুকুমার। তারপর সকালে উঠেই চলে যাবে। গ্রাম ছেড়ে। এ পরিবেশ ছেড়ে। বেকার মজুবদের অসময়ে ঘরে ফেরার মত করে।

সুকুমার সকাল বেলা সেই মহাযাত্রাই করছিল তখন। ভূপালবাবুর বৈঠকখানা থেকে সুটকেস হাতে করে নামছিল। ঠিক সেই সময় সামাদ সামনে এসে দাঁড়াল।

হুজুর, ছেলাম।

সুকুমার থমকে গেল।

সামাদ! তুমি ফিরে এসেছ?

হ্যাঁ, হুজুর। বেঁচে জান লিয়ে ফিরে এয়েচি এই আল্লার দুয়া। আপনাদের আশীব্বাদে। যদি আর কটা দিন আগে আসতাম তাহলে বুনডাও আসত। কেস্তক—কপাল। সে-ই বাপের ভিটেয় আর ফিরতে পারল না।

কে? জাবেদা? জাবেদার কি হয়েছে?

কপাল হুজুর, কপাল। যম আমার জাবেদাকে লিয়ে লিল। পাকিস্থানের মাটির তলায় তাকে শুইয়ে দিয়ে, ঘুম পেড়িয়ে, পেলিয়ে এয়েচি আমরা দুজনে। আমি আর বৌডা। বাপের ভিটেয় বড্ডা

টান ছিলো জাবেদার। ওজ বুলত, পেলিয়ে আসবার কথা। কেস্তক চিকিচ্চে অভাবে তাকে আর আনতে পারা গ্যালো না গো। সে মরে গ্যালো। জাবেদা মরে গ্যালো গো। জাবেদা মরে গ্যালো।

সামাদ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সুকুমার বিহ্বল হয়ে পড়ল। কথা বলতে পারল না।

সামাদই আবার বললে, যাক সে ভালুই গিয়েচে। এ্যাকুন আমার ধড়ে প্রাণডা যদ্দিন আচে বাঁচতেই হবে। হুজুর, ত্যাশ ছেড়ে পেলিয়ে গিয়েলাম একদিন ভয় পেয়েলাম বুলে। অপরাধ হয়ে থাকে মার, কাটো, যা খুশী কর। শুধু এট্টু মাথা গুঁজবার আচ্ছিরায় করে দাও। দুমুটো অন্নের হিল্লে করে দাও। পিত্যিপুরুষের ভিটে ছেড়ে আর কুত্তাও যাব না কখুনও। হুজুর, আপনিত কলোনীর নোকদের সাহায্য কর; ট্যাকা দাও, নোন দাও। এবার আমাদের পানে একবার মুখ তুলে তাকাও।

সুকুমার আর শুনতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল সে চীৎকার করে বলে ওঠে, আমি আর সে আমি নেই। তোমাদের ওই জ্বালা আজ আমারও বুকে।

আত্মসংযম করে সুকুমার বললে, আজকাল তোমাদের সাহায্যের জন্যে, দেখাশুনার জন্যে ভূপালবাবু চেষ্টা করছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর। আর আমি—

কি বুলচ? সামাদ অবুঝের মত কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

সুকুমার বললে, আমি চলে যাচ্ছি। বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমার এখানকার কাজ ফুরিয়ে গেছে, সামাদ।

সামাদের মুখখানা অসহায়তায় আরও কেমন ম্লান হয়ে উঠল। তারপর সে টেনে টেনে স্বগতোক্তির মত বললে, বড়ো ডাক্তারবাবু গিয়েচে। আবার আপনিও গেলে!

সুকুমার পথে নেমে এল।

নন্দীপুরের এই পথ দিয়ে সে একদিন ট্রাকে চেপে এসেছিল

সেই প্রথম দিন। আজ যাবার দিনে সেই পথ দিয়ে সে হেঁটে চলল। কত পরিচয় হয়েছিল এর পরিবেশের সঙ্গে। কত বিচিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার।

সুকুমার কলোনীর পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। একদিন এখানে মাঠ ছিল। তারপর তাঁবু পড়ল, ঘর উঠল। আজ সে ঘরের চাল নেই, টিন নেই। পুরন খড়ের চালা বসেছে তার ওপর। অনেক ঘর আবার তার কাঠামোও হারিয়েছে ইতিমধ্যেই। শুধু পত্তন দেওয়া ভিটের চিহ্ন পড়ে আছে।

এই কলোনী। এই পরিণতি। এই সুকুমারের কর্মকাণ্ডের পরিচয়। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকুমার আবার চলতে আরম্ভ করল। কয়েক পা যেতেই সে দেখল কলোনী থেকে সাধুচরণ বেরিয়ে আসছে। হাতে একতারা। সঙ্গে তার সেই পুনর্বসতির বৌ। ওরা দুজনে গান গেয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় আজকাল।

কাছে এসে সাধুচরণ নমস্কার করল, হুজুর পেন্নাম।

ওর বৌ বড় করে ঘোমটা টেনে দিল।

সুকুমার বললে, সাধুচরণ, ভালই হল। যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হল।

আজ্ঞে হুজুর?

আমি চলে যাচ্ছি। দেখছনা সুটকেস? বিছানা আগে পাঠিয়েছি।

একেবারে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। আবার কি অনেকদিন ত তোমাদের সঙ্গে কাটালাম।

হ্যাঁ। সাধুচরণ একটু নীরব থেকে বললে, ছিলাম এক দেশে। এখানে নিয়ে এলেন। রেখে দিয়ে আবার চলে যাচ্ছেন। যান। এখন থেকে পথে পথে মাথুরের পালা গেয়ে বেড়াব।

সাধুচরণ আরও বলতে যাচ্ছিল। হল না।

রামতারণ চৌধুরীর বিরাট দামী মোটর কারটা আসছিল রামবাবুকে নিয়ে। রামবাবু কৃষ্ণনগরে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা বোর্ডের সভায় যোগ দিতে চলেছেন। তিনি সে সভার অন্যতম সদস্য।

গাড়ীটা পাশ দিয়ে চলে যেতেই চারদিক ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আর সাধুচরণকে দেখা যায় না। সামনে এগিয়ে যেতেও পারে না সুকুমার। ধূলো, শুধু ধূলো। আত্মরক্ষার জন্যেই সুকুমার কয়েক পা পিছিয়ে এল।

বিলের ওপারে, সামনের গ্রামে গোবিন্দলালদের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ওরা টেষ্ট রিলিফের দাবী জানাচ্ছিল। জীবিকাব দাবী, ছমুঠো অন্নের দাবী। পৈতৃক প্রাণটাকে জীইয়ে রাখার দাবী। জন্মগত অধিকারের দাবী।

এই মুহূর্তে সেটাও আর শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই রামবাবুকে আবোহী নিয়ে, রামতাবণ চৌধুবীর মোটর কারের দুর্বার গতি চাকায় ওড়ান ধূলো ওদেরও আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ধূলোর ধূম্রতায় পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন—বিহ্বল করে দিয়েছে। ওরাও নিশ্চয়ই আত্মরক্ষাব জন্যে সুকুমারের মতই কয়েক পা পিছিয়ে গেছে।

আশ্চর্য এই মুহূর্ত। সহসা সুকুমারের উপলব্ধিতে এই মুহূর্তটিকে কালচিহ্ন বলে মনে হ'ল। এই মুহূর্ত, এ যেন ক্ষুদ্র এক পরমাণুর মতই অর্থবহ, ভাব ব্যাঞ্জনাময়। এই মুহূর্তে এই গ্রাম যেন গ্রাম নয়। গ্রামের এই পরিবেশ যেন শুধু এই গ্রামের নয়। এ যেন আমাদের এই দেশ কাল সমাজে ব্যাপ্ত এক জাগ্রত অস্তিত্ব।